তফসীরে নূরুল কোরআন

আটাশ পারা

২৮

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

আটাশতম খণ্ড

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

তফসীরে নূরুল কোরআন

আটাশতম খন্ড

২৮

আটাশ পারা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

তৃতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০১০ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯, ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V); 28. Published by Al-Balag Publications
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 350.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই, যিনি দয়া করে তফসীরে নূরুল কোরআনের আটাশতম খন্ড পেশ করার তওফিক দান করেছেন। এই তওফিকের জন্যে দরবারে এলাহীতে পেশ করি অগণিত সেজদায়ে শোকরানা, কেননা এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তা দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়ায়ই হয়েছে, আর যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে, তা-ও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের দানেই হবে।

অগণিত দরুদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে করুণাময় আল্লাহ পাক "তফসীরে নূরুল কোরআন" রচনা ও প্রকাশনার তওফিক দান করেছেন।

হে আল্লাহ! দরূদ ও সালাম পেশ কর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সকল প্রাণী যত নিঃশ্বাস ফেলেছে, সেই সমস্ত নিঃশ্বাসের সংখ্যা মোতাবেক।

এ পৃথিবীতে মানুষের হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ পাক লক্ষাধিক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, যাঁরা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ-প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ লাভ করেছে সরল সঠিক পূণ্য পন্থা। আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন। এ পর্যায়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হলেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন।

যেভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবেনা, তেমনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর আর কোন আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হবেনা। তাই পবিত্র কোরআনেই রয়েছে সকল যুগের সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শেই রয়েছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সমাধানের পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আর তা বাস্তবায়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা"।

বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করার জন্যে, পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে সঠিক পথে আনয়নের লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

আর এ উদ্দেশ্যেই আবির্ভাব হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

বরকতময় সেই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর বন্দার প্রতি নাযিল করেছেন পবিত্র কোরআন (যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) যেন তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভয় প্রদর্শন করেন। আসমান যমীনের সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।

ইতিহাস সাক্ষী! হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়্যতের আমলে শুধু যে পবিত্র কোরআন সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছেন, তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নও করেছেন।

তিনি মানব জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন এবং তদানীন্তন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেছেন।

একথা সর্বজন-বিদিত যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মানব জীবনের সকল অশান্তি দূরীভূত হয়েছিল। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন ইসলামের মহান বাণী নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর এন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বের এক বিরাট অংশে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী যথানিয়মে কায়েম হয়েছিল। প্রত্যেকটি মানুষ অন্য মানুষের জন্যে উপকারী এবং কল্যাণকামী রূপে তৈরী হয়েছিল। মুসলমান মাত্রকেই তিনি কোরআনে করীমের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। এলমে হাদীস এবং এলমে তফসীরের প্রসার হয়েছিল সর্বত্র, অন্যদিকে মানব অন্তর করুণাময় আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিল। তদানীন্তন পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিল এমনি একটি পবিত্র পরিবেশ, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজেও পাওয়া যায়না।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে দান করেছিলেন বিশ্বের নেতৃত্ব, তদানীন্তন পৃথিবীর দু' পরাশক্তি রোমক সাম্রাজ্য এবং

পারশ্য সাম্রাজ্য হাজার বছর যুদ্ধরত থেকেও একে অন্যকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। অথচ পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী মুসলিম জাতির মোকাবেলায় তারা উভয়ে মাত্র এক যুগও টিকে থাকতে পারেনি। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলেই দু' পরাশক্তি মুসলমানদের হস্তে ভূলুণ্ঠিত হয়।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল মুসলিম জাতির ঈমানী শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এ ঈমানী শক্তির উৎস দুটি (১) পবিত্র কোরআন (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম জাতির দুর্গতির মূল কারণই হলো ঈমানী শক্তির এ দুটি উৎস থেকে দূরে থাকা। সমস্যা-জর্জরিত এ পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত বারে বারে মনে পড়েঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

(সূরা তোয়াহা, আয়াত-১২৪-২৬)

"আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত। কেয়ামতের আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো, সে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে কেন অন্ধ করে উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুস্মান। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ এভাবেই তোমার নিকট আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহ এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক অনুরূপ ভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে"।

এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, বর্তমান যুগে পৃথিবীতে যে অশান্তি অস্থিরতা অরাজকতা পরিলক্ষিত হয় এবং যে অভাব-অনটন প্রত্যক্ষ করা যায়, তার একমাত্র কারণ হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামের প্রতি গাফলত এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণে অনীহা। আর শুধু গাফলত এবং অনীহাই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞতা আরো পীড়াদায়ক।

এমনি অবস্থায় পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং তার বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনার্থেই অব্যাহত রয়েছে তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা।

এ মহান গ্রন্থের আটাশতম খন্ড প্রকাশনার এ শুভ মুহূর্তে অগণিত শোকর আদায় করি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এবং এ মহান গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তওফিকের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করি। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা। আমাদের প্রতি দয়া কর এবং পবিত্র কোরআনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার তওফিক দান কর। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১। সূরা মুজাদেলা প্রসঙ্গে ২
২। শানে নুযুল ২
৩। নামকরণ ২
৪। মুল বক্তব্য ৩
৫। এ সূরার আমল ৩
৬। স্বপ্নের তা'বীর ৩
৭। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৪
৮। জেহার প্রসঙ্গে ৪
৯। হযরত খাওলার (রাঃ) প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)-এর ব্যবহার ৬
১০। শানে নুযুল ১৬
১১। মজলিসে আসন গ্রহণের আদব ২৩
১২। এলমের ফজিলত ২৪
১৩। শানে নুযুল ২৮
১৪। আয়াতের মর্মকথা ৩৮
১৫। প্রকৃত মোমেন কখনও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করেনা ৪২
১৬। আয়াতের মর্মকথা ৪৪
১৭। সূরা হাশর প্রসঙ্গে ৪৭
১৮। এ সূরার শেষ তিন আয়াতের ফজিলত ৪৭
১৯। স্বপ্নের তা'বীর ৪৭
২০। নামকরণ ৪৭
২১। বনী নজীরের ঘটনা ৪৮
২২। প্রথম সমাবেশ ৫৪
২৩। হাশরের ময়দান কোথায় হবে ৫৪
২৪। শানে নুযুল ৫৮
২৫। জন কল্যাণের উদ্দেশ্যে ফা'ই বিতরণ করা হবে ৬৫
২৬। মোহাজেরগনের ফজিলত ৬৭
২৭। শানে নুযুল ৬৮
২৮। আন্‌সারগণের ফজিলত ৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯। আত্মত্যাগের অপূর্ব নিদর্শন	৭০
৩০। লোভ ও কৃপণতা বর্জনীয়	৭২
৩১। পূর্বকালের মুসলমানদের সমালোচনা বর্জনীয়	৭৬
৩২। ফা'ই-এর উপর হক্ব রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের	৭৭
৩৩। ফা'ই-এর বন্টনে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নীতি	৭৮
৩৪। ফা'ই বিতরণে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নীতি	৭৯
৩৫। ফা'ই ও গনিমতের মধ্যে পার্থক্য	৮০
৩৬। ইহুদী গোত্র বণী কিন্‌কার বিশ্বাসঘাতকতা	৮৫
৩৭। শয়তানের প্রতারণার একটি দৃষ্টান্ত	৮৭
৩৮। পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম	৯৭
৩৯। জড় পদার্থের উপর কোরআনে করীমের প্রভাব	৯৮
৪০। আয়াতের মর্মকথা	৯৯
৪১। সূরা মুমতাহেনা প্রসঙ্গে	১০৫
৪২। নামকরণ, স্বপ্নের তাবীর	১০৫
৪৩। শানে নুযুল	১০৫
৪৪। হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআর (রাঃ) চিঠি	১০৭
৪৫। কাফের মুশরেকদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ	১০৯
৪৬। শানে নুযুল	১২০
৪৭। আয়াতের মর্মকথা	১২০
৪৮। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা	১২১
৪৯। একটি সু-সংবাদ	১২১
৫০। ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতা	১২৩
৫১। শানে নুযুল	১২৫
৫২। মানবিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট নমুনা	১৩১
৫৩। সূরা সফ্ প্রসঙ্গে	১৩৭
৫৪। নামকরণ	১৩৮
৫৫। এ সূরার আমল	১৩৮
৫৬। স্বপ্নের তা'বীর	১৩৮
৫৭। নাম মোবারকের ব্যাখ্যা	১৪৫
৫৮। ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার	১৫০

বিষয় পৃষ্ঠা

৫৯। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা..১৫৬
৬০। সূরা জুমআ প্রসঙ্গে.. ১৫৯
৬১। নামকরণ, এ সূরায়ে ফজিলত, এ সূরার আমল, স্বপ্নের তা'বীর..... ১৫৯-৬০
৬২। মূল বক্তব্য.. ১৬০
৬৩। আয়াত সমূহ শুনিয়ে দেয়া.. ১৬২
৬৪। আত্ম-শুদ্ধি লাভের ব্যবস্থা করা১৬৩
৬৫। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত নেই.. ১৬৫
৬৬। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের শুভ-পরিণতি.....১৬৫
৬৭। সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা.. ১৬৮
৬৮। জুমআর দিনের ফজিলত.. ১৭৬
৬৯। নামকরণের কারণ..১৭৬
৭০। মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রথম জুমআ.. ১৭৭
৭১। মদীনা মোনাওয়্যারায় শুভাগমনের নয়নাভিরাম দৃশ্য.. ১৭৯
৭২। জুমআ সম্পর্কে আরও জ্ঞাতব্য..১৮৩
৭৩। জুমআর নামাযের জন্যে তাগিদ..১৮৪
৭৪। দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময়.. ১৮৭
৭৫। জুমআর দিনের বিশেষ আমল..১৮৯
৭৬। একটি সতর্কবাণী..১৯০
৭৭। শানে নুযুল..১৯২
৭৮। রিযকের জন্যে ব্যাকুল হওয়া অনুচিত.. ১৯৪
৭৯। সূরা মুনাফেকুন প্রসঙ্গে.. ১৯৫
৮০। নামকরণ, স্বপ্নের তাবীর, এ সূরার আমল.. ১৯৫-৯৬
৮১। শানে নুযুল.. ১৯৬
৮২। শানে নুযুল.. ২১১
৮৩। মোমেনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী..২১৯
৮৪। সূরা তাগাবুন প্রসঙ্গে..২২৩
৮৫। এ সূরার আমল.. ২২৩
৮৬। স্বপ্নের তা'বীর..২২৩
৮৭। মূল বক্তব্য..২২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

৮৮। মানব-সৃষ্টির ধারাবাহিকতা............ ২২৫
৮৯। ঈমানই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ............ ২৩১
৯০। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা কর্তব্য............ ২৩৬
৯১। মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য............ ২৩৭
৯২। তকদীরের ব্যাপারে সন্দেহ নিরসন............ ২৩৮
৯৩। শানে নুযুল............ ২৪২
৯৪। আয়াতের মর্মকথা............ ২৪৩
৯৫। আল্লাহ্ পাকের পথের অন্তরায়............ ২৪৩
৯৬। শানে নুযুল............ ২৪৪
৯৭। সূরা তালাক প্রসঙ্গে............ ২৪৭
৯৮। নামকরণ............ ২৪৮
৯৯। এ সূরার ফজিলত............ ২৪৮
১০০। স্বপ্নের তা'বীর............ ২৪৮
১০১। মূল বক্তব্য............ ২৪৮
১০২। শানে নুযুল............ ২৫০
১০৩। জরুরী জ্ঞাতব্য............ ২৫১
১০৪। বিপদমুক্তির দোয়া............ ২৫৪
১০৫। সবর ও পরহেযগারীর সুফল............ ২৫৫
১০৬। বিশেষ জ্ঞাতব্য............ ২৫৫
১০৭। সূরা তাহরীম প্রসঙ্গে............ ২৭২
১০৮। এ সূরার আমল, স্বপ্নের তা'বীর, পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক............ ২৭২
১০৯। মুল বক্তব্য, শানে নুযুল............ ২৭২-৭৩
১১০। দোযখের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা কর............ ২৮৮
১১১। শিশুদেরকে নামাযের আদেশ দাও............ ২৮৯
১১২। প্রকৃত তওবা............ ২৯২
১১৩। আল্লাহ পাকের দান অপরিসীম............ ২৯৪
১১৪। উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য............ ২৯৬
১১৫। তাৎপর্যবহ দোয়া............ ৩০১

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ
হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর
অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা
২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান
৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন
৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী
৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন
৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)
৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম
৮। সাহাবা-চরিত
৯। হাজীদের সাথী
১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবদান
১১। এনায়েতুল কোরআন
১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন
১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
১৪। ইসলামী মাহফিলের তাৎপর্য
১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)
১৬। শরহে বয়যাবী
১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা
১৮। মুসলমানের কর্তব্য
১৯। দুই ঈদ
২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)
২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে
২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)
২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তফসীরে নূরুল কোরআন

আটাশতম খন্ড আটাশ পারা

সূরা মুজাদেলা

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ

تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ

اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَ

اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ② وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ

يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ

تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ③

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক শ্রবণ করেছেন সে স্ত্রীলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে (হে রসূল!) আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে অভিযোগ করছিল, আল্লাহ্ পাক তোমাদের দু'জনের কথাবার্তা শ্রবণ করছিলেন, আল্লাহ্ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু দেখেন।

(২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের পত্নীদেরকে মা বলে বসে, তাতে তাদের পত্নীরা তাদের সত্যিকার মা হয়ে যায় না, তাদের মা শুধু তারাই, যারা তাদেরকে

প্রসব করেছে, আর নিঃসন্দেহে তারা একটি অসঙ্গত মিথ্যা উক্তি করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয় এবং অতীব ক্ষমাশীল।

(৩) আর যারা তাদের স্ত্রীদেরকে মা বলে বসবার পর নিজেদের সে কথার সংশোধন করতে চায়, তাদের কর্তব্য হলো একটি গোলাম বা বাঁদী আজাদ করা, একে অন্যকে স্পর্শ করার পূর্বে। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হলো, আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

সূরা মুজাদেলা প্রসঙ্গে

সূরা মুজাদেলা মদীনায় অবতীর্ণ। ৩ রুকু এবং ২২ আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ৪৭৩টি বাক্য এবং ১,৯৯২টি অক্ষর রয়েছে।

শানে নুযুল

জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার ইচ্ছা করতো তখন বলতো, তুমি আমার প্রতি আমার মাতার পৃষ্ঠের ন্যায়।

খাওলা বিনতে সা'লাবা নামক স্ত্রীলোকটির স্বামী ছিলেন আওস এবনে সামেত। আওস তাঁর স্ত্রী খাওলাকে একথাই বলেছিলেন। তখন খাওলা কাঁদতে কাঁদতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হন এবং তাঁর স্বামী কর্তৃক উচ্চারিত বাক্যটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শুনিয়ে দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেলে। তখন খাওলা বার বার একথা বলতে লাগলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে আমাকে তালাক দেয়নি, সে আমার অর্থ-সম্পদ খরচ করে ফেলেছে, আমার যৌবন অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার সন্তানগুলো আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, এখন আমি কি করবো? এরপর খাওলা আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার দুঃখের কথা তোমার কাছে পেশ করছি, তুমিই আমার দুঃখ কষ্ট দূর করতে পার, তখন আলোচ্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক শ্রবণ করেছেন সে স্ত্রীলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে (হে রসূল!) আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল'।

নামকরণ

সূরার প্রারম্ভেই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা মুজাদেলা'।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান স্থান পেয়েছে। নিজের স্ত্রীকে মায়ের পৃষ্ঠের ন্যায় বলাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'জেহার' বলা হয়। জেহার যারা করে তাদের কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। জেহারের কাফ্ফারার বিধান ঘোষণা করা হয়েছে এ সূরায়। এতদ্ব্যতীত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে হাযির হওয়ার আদব কায়দাও বর্ণিত হয়েছে এ সূরায়। ইহুদীদের অন্যায় আচরণের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এ সূরায় ঈমানের ভিত্তির উল্লেখ রয়েছে আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হবে মানুষের সাথে সম্পর্ক। যার সাথে সম্পর্ক হলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন, তার সাথেই সম্পর্ক রাখতে হবে। আর যার সাথে সম্পূর্ক রাখলে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন, সে সম্পর্ক থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। এটিই ঈমানের দাবী, যে এ দাবী পূরণ করেনা সে কার্যতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনা।

বোখারী শরীফে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ কত পবিত্র সত্তার অধিকারী সেই আল্লাহ পাক, যিনি সমগ্র বিশ্বের কথা শ্রবণ করেন। ঐ স্ত্রীলোকটি যখন এ ঝগড়া নিয়ে এসেছিল, সে আমার কক্ষেই বসেছিল এবং একথা বলছিল। তখন আমি আমার ঘরের এক কোণে বসেছিলাম কিন্তু আমি তার সব কথা শুনতে পারিনি, অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সপ্ত আসমানের উপরে বসে তার কথা শ্রবণ করছিলেন, সে যখন বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করি, তখন অল্পক্ষণের মধ্যে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আলোচ্য আয়াত সমূহ নিয়ে হাযির হলেন।[১]

এ সূরার আমল

এ সূরা কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট পাঠ করলে সে নিদ্রিত হয়। যদি কেউ এ সূরা লিপিবদ্ধ করে খাদ্য দ্রব্যে রাখে, তবে খাদ্য-দ্রব্য নিরাপদ থাকে। কারো জ্বর হলে আছরের নামাযের পর এ সূরা তিন বার পাঠ করে দম করলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হয়।

স্বপ্নের তাবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরা মুজাদেলা স্বপ্নে পাঠ করছে দেখে, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা আলেম হয় তবে তার শত্রু পরাজিত হয়। আর যদি সে ব্যক্তি আলেম না হয় তবে দুশমনের বিজয়ী হওয়ার আশংকা থাকে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩২৪

তফসীরুল কোরআন

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক শ্রবণ করেছেন সে স্ত্রীলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে (হে রসূল!) বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহ পাকের দরবারে অভিযোগ করছিল, আল্লাহ পাক তোমাদের দু'জনের কথাবার্তা শ্রবণ করছিলেন, আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু দেখেন'।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে, আর এ সূরায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এমন হেদায়েত নামা প্রেরণ করেন, যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের কষ্ট দূর করা হয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক শ্রবণ করেছেন সে স্ত্রীলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে (হে রসূল!) আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিলো'।

মূলতঃ প্রাক-ইসলামী যুগে যদি কোন মানুষ তার স্ত্রীকে মা বলে বসতো, তবে স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যেত এবং তাদের উভয়ের মিলনের পথ চিররুদ্ধ হয়ে যেত।

জেহার প্রসঙ্গে

ইসলামের ইতিহাসে এটি ছিল এ ধরনের প্রথম ঘটনা। আওস এবনে সামেত নামক সাহাবীর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)-কে আওস (রাঃ) ঘটনাক্রমে একথা বলে বসেন, তুমি আমার প্রতি এমনই, যেমন আমার জন্যে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ।

স্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় "জেহার" বলা হয়, 'জেহার' শব্দটি ظَهْرٌ থেকে নিষ্পন্ন, ظهر শব্দটির অর্থ হলো পৃষ্ঠদেশ, আর শরীয়তের পরিভাষায় 'জেহার' বলা হয় কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্যে এভাবে হারাম যেভাবে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ। জাহেলিয়াতের যুগে এটিই স্ত্রীর জন্যে তালাকের হুকুম মনে করা হতো, আর তাকে স্থায়ী হুকুম মনে করা হতো কিন্তু ইসলামী শরীয়ত একথাটিকে স্ত্রীর স্থায়ী ভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

মনে করেনা; বরং এর জন্যে নির্দিষ্ট কাফ্ফারা আদায় করা হলে স্ত্রী পূর্বের ন্যায়ই হালাল হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের تجادلك শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, অর্থাৎ যখন আওস এবনে সামেত (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে উপরোক্ত কথাটি বললেন এবং একথাও বললেন যে, তুমি এখন আমার জন্যে হারাম হয়ে গেছ, তখন হযরত খাওলা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! এটি তালাক নয়, এরপর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন, তখন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক ধৌত করছিলেন। খাওলা (রাঃ) এসে বললেন, আমার স্বামী আওস এবনে সামেত (রাঃ) তখন আমাকে বিয়ে করেছিল যখন আমার যৌবন ছিল, যখন আমার নিকট অর্থ-সম্পদ ছিল এবং যখন আমার আত্মীয়-স্বজন ছিল, আর যখন আমার অর্থ-সম্পদ সে নিঃশেষ করে ফেলেছে, আমার যৌবনও গত হয়েছে এবং আমার আত্মীয়-স্বজনও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আমি নিজে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছি, এমন অবস্থায় আমার স্বামী আমার সাথে জেহার করেছে, কিন্তু জেহার করার পর সে লজ্জিতও হয়েছে, এখন এমন কোন পন্থা নেই কি যে, আমরা পুনরায় একত্রিত হতে পারি, কেননা যদি আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, যদি শিশু সন্তানগুলো আমার সাথে থাকে তবে তারা জঠর-জ্বালায় মারা যাবে, আর যদি তার কাছে রেখে যাই তবু ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি তার জন্যে হারাম হয়ে গেছ। কিন্তু হযরত খাওলা (রাঃ) বার বার তাঁর কথা বলছিলেন এবং একথাও বলছিলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার প্রতি কোরবান, আমার বিষয়টি একটু চিন্তা করে দেখুন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি তোমার কথা শেষ কর এবং একথা এখানেই বন্ধ কর, তুমি দেখছনা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের দিকে (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন ওহী নাযিল হতো তখন মনে হতো তিনি তন্দ্রাহত হচ্ছেন), তখন আলোচ্য আয়াত সমূহ নাযিল হলো। যখন ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা শেষ হলো তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাওলাকে (রাঃ) বললেন, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে আস, হযরত আওস (রাঃ) হাযির হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনালেন। এভাবে আল্লাহ পাক দুঃখিনী খাওলা বিনতে সা'লাবার (রাঃ) ফরিয়াদ শ্রবণ করলেন।[২]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৪৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩২৪

তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ۞

'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের পত্নীদেরকে মা বলে বসে, তাতে তাদের পত্নীরা তাদের সত্যিকার মা হয়ে যায় না, তাদের মা শুধু তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে, আর নিঃসন্দেহে তারা একটি অসঙ্গত মিথ্যা উক্তি করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয় এবং অতীব ক্ষমাশীল'।

হযরত খাওলা (রাঃ)-এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)-এর ব্যবহার

হযরত আবু ইয়াজিদ (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁর খেলাফতের আমলে কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে কোথাও গমন করছিলেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন মহিলা তাঁকে ডাক দিয়ে থামিয়ে দিলেন, হরত ওমর (রাঃ) আহ্বানকারী ঐ মহিলার নিকট হাযির হয়ে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কথা মনযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। এরপর ঐ মহিলা যা চাইলেন তাঁকে তা দেয়া হলো, তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। জনৈক ব্যক্তি তখন বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি একজন বৃদ্ধার কথায় থেমে গেলেন এবং আপনার জন্যে এত লোক অপেক্ষা করতে বাধ্য হলো! তখন আমীরুল মোমেনীন বললেনঃ তুমি কি তাঁকে চেন? মহিলা কে? ইনি সেই মহিয়সী নারী খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ), যাঁর অভিযোগ আল্লাহ পাক সাত আসমানের উপর থেকে শ্রবণ করেছেন, যদি আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা নয়; সারারাত তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তবে আমি তাঁর খেদমতে সর্বক্ষণ হাযির থাকতাম, তবে শুধু এটুকু যে নামাযের সময় নামায আদায় করতাম। এরপর তাঁর কথা শ্রবণ করতাম।[১]

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শুনেন, সব কিছু দেখেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই'।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৮, পৃষ্ঠা-২-৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৩

অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের ন্যায় বললে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না, তবে এমন উক্তি নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা, মা সে, যে কাউকে প্রসব করে, কাজেই স্ত্রী কখনো মা হতে পারেনা।

আর 'জেহার' করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় না তথা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনা, তবে শরীয়ত মোতাবেক কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত একে অন্যের মেলামেশা হারাম হয়ে যায়। যথারীতি কাফ্ফারা আদায় করা হলে তখন একে অন্যের জন্যে হালাল হয়ে যায়।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয় এবং অতীব ক্ষমাশীল, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করেন, আর এ মার্জনা তওবা করার পূর্বেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

"আর আল্লাহ পাক শেরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করতেও পারেন"।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

'আর যারা তাদের স্ত্রীকে মা বলে বসবার পর নিজেদের সে কথার সংশোধন করতে চায়, তাদের কর্তব্য হলো একটি গোলাম বা বাঁদী আজাদ করা-একে অন্যকে স্পর্শ করার পূর্বে। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হলো, আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন'।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ হযরত সালমান এবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হযরত সালমা এবনে সখর (রাঃ) বলেন, আমি পূর্ণ রমজান মাসের জন্যে আমার স্ত্রীর সাথে জেহার করি, রমজানের দিনগুলো এভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু এক রাতে আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেল। জেহারের উপর আমি কায়েম থাকতে পারিনি, সকালে আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে বললাম, তোমরা আমার সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে চল, আর তাঁর নিকট আমার পক্ষে সুপারিশ কর। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা এমন কাজ করবোনা, কেননা হয়তো তিনি এমন কথা বলবেন, যা সমগ্র গোত্রের লোকদের জন্যে লজ্জার কারণ হতে পারে, বরং তুমি নিজে যাও এবং নিজের জন্যে যা পছন্দ কর তাই বল। অবশেষে আমি একা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

দরবারে হাযির হলাম এবং নিজের ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি কি এমনটি করেছো? আমি আরজ করলাম, জ্বী-হ্যা, তাই করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় একথাটি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আরজ করলাম জ্বী-হ্যা আমি তাই করেছি, এখন যা আল্লাহ পাকের হুকুম হয়, তা আপনি আমার উপর জারী করুন, আমি দৃঢ়সংকল্প বদ্ধ থাকবো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তুমি একটি গোলামের গর্দান আজাদ কর, আমি নিজের গর্দানের উপর হাত রেখে আরজ করলাম, শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি এ গর্দান ব্যতীত কোন গোলাম বাঁদীর গর্দানের মালিক নই, তখন তিনি এরশাদ করলেন, তাহলে তুমি দু' মাস রোযা রাখ। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! রমজানেই তো আমার দ্বারা এ ঘটনা ঘটেছে। তাহলে সদকা দিয়ে দাও, ষাটজন মিসকিনকে পেট ভরে খাবার দাও, আমি আরজ করলাম, শপথ সে আল্লাহ পাকের, আমি তো এই রাত অভুক্ত অবস্থায় অতিবাহিত করেছি। আর আগামী রাতের জন্যেও আমার নিকট কোন খাবার নেই। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ বনী জোরায়েক গোত্রের যাকাতের তহশীলদারের নিকট যাও, তাকে বল; সে যেন তোমাকে ঐ গোত্রের যাকাত থেকে এক ওয়াসাক (ষাট সা') দিয়ে দেয়, (এক সা' প্রায় চার সেরের সম পরিমাণ) তা থেকে তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাবার দাও, আর যা অবশিষ্ট থাকে, তা তোমার পরিবারবর্গের জন্যে নিয়ে আস। এরপর তিনি তাঁর গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের নিকট ভাল ব্যবহার পাইনি, কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বরকত এবং মধুর ব্যবহার লাভ করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের যাকাত গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, অতএব তোমরা এখন তোমাদের যাকাত আমাকে দাও। এ ঘটনা হযরত ইমাম আহমদ (রঃ) এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন।[১]

এই হাদীস দ্বারা আল্লামা জওযী (রঃ) দু'টি কথা প্রমাণ করেছেনঃ

এক. যদি জেহার নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে করা হয়, তবে তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই হবে, সব সময়ের জন্যে হবেনা।

দুই. জেহারকারী কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবেনা, যদি তা করে তবে গুনাহগার হবে এবং কাফ্ফারা আদায় করা তার একান্ত কর্তব্য হবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩২৮-২৯

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার শর্ত যুক্ত জেহার করে, এরপর তালাকে বায়েন দিয়ে দেয়, এমন অবস্থায় তালাক হয়ে যাবে।

যদি কোন স্ত্রীলোককে একই মজলিসে বা একাধিক মজলিশে একাধিকবার জেহার করা হয়, তবে প্রত্যেক বারের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। তবে সে ব্যক্তি যদি একথা বলে, আমার নিয়ত ছিল একবার জেহার করা কিন্তু কথাটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার জন্যে আমি একাধিক বার বলেছি, এমন অবস্থায় একবার কাফ্‌ফারা আদায়ই যথেষ্ট হবে।

হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, জেহার জাহেলিয়া যুগের তালাক ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক এর জন্যে কাফ্‌ফারা আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে জেহারকারী স্বামীর জন্যে স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে।

ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

আর এ কাফফারার বিধান এজন্যে করা হয়েছে, যেন মানুষ এর দ্বারা শিক্ষা লাভ করতে পারে। এমন ভুল যেন আর না হয়, আর এজন্যেই কাফ্‌ফারার বিধান দান করা হয়েছে, আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন। এজন্যে মানুষের কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাককে ভয় করা।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ وَ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوْا اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ٦

তরজমা

(৪) কিন্তু যার গোলাম আজাদ করার সামর্থ্য না থাকে, তাকে অনবরত দু'মাস রোজা রাখতে হবে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। যদি সে তাতেও অক্ষম হয়,

তবে ষাটজন অভাবগ্রস্ত লোককে খাবার দান করবে। এ বিধান এজন্যে যে, যেন তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আন, আর এসব হলো আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখা এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৫) নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তাদেরকে অপমানিত করা হবে, যেমন অপমানিত করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে, আমি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি, এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি।

(৬) যেদিন আল্লাহ পাক সকলকে উত্থিত করবেন, তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন, আল্লাহ পাক তাদের কর্মের হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা ভুলে গেছে। সব কিছুই আল্লাহ পাকের সম্মুখে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছে, "স্ত্রীকে মায়ের পৃষ্ঠের ন্যায়" বলা হলে তথা জেহার করা হলে এর কাফ্‌ফারা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য, জেহারের কাফ্‌ফারা হলো একটি গোলাম বা বাঁদী আজাদ করা, কিন্তু যদি কেউ গোলাম বা বাঁদী আজাদ করতে না পারে তবে তার বিকল্প পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا

যদি কেউ গোলাম না পায়, তবে পরস্পর মেলামেশার পূর্বে অনবরত দু' মাস রোজা রাখবে। এটি হলো জেহারের কাফ্‌ফারা আদায়ের দ্বিতীয় পন্থা।

গোলাম বাঁদী না পাওয়ার একটি কারণ হলো গোলাম বাঁদী ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকা, অথবা ক্রয়ের জন্যে গোলাম বাঁদী দুস্প্রাপ্য হওয়া, অথবা গোলাম বাঁদী দুস্প্রাপ্য নয় কিন্তু দুমূল্য, তাদের যে মূল্য আদায় করতে হয়, জেহারকারী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে অথবা অভাব অনটনের কারণে তা আদায়ে অক্ষম হয়, এসব পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, গোলাম আজাদ না করা এবং এ স্থলে অনবরত দু'মাস রোজা রাখা বৈধ হবে। অবশ্য ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, জেহারকারী ঋণগ্রস্ত হলেও গোলাম আজাদ করাই হবে কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতে مُتَتَابِعَيْن শব্দটি দ্বারা এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, জেহারের কাফ্‌ফারায় দু'মাস অনবরত রোজা রাখতে হবে, মাঝখানে বিরতি দিলে চলবেনা, কোন ওজরের কারণে অথবা ওজর ব্যতীতই যদি দু' একদিন

বাদ পড়ে যায়, তবে আবার নতুন করে দু' মাসের হিসাব শুরু করতে হবে। এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, অনবরত দু' মাসের মধ্যে রমজানের মাস অথবা যে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম সে পাঁচ দিন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেনা, কেননা মাহে রমজানের রোজা পালন করা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে, তাই রমজানের মাস জেহারের কাফ্‌ফারা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারেনা।

এমনিভাবে দু' ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন রোজা রাখা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এ দিনগুলোও কাফ্‌ফারার রোজার জন্যে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

'যদি জেহারকারী ব্যক্তি রোজা রাখতেও অপারগ হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে খাবার দান করবে'।

অর্থাৎ যদি জেহারকারী ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা রুগ্ন হওয়ার দরুণ দু' মাস অনবরত রোজা রাখতেও অক্ষম হয়, তবে ষাটজন মিসকীন বা অভাবগ্রস্ত লোককে জেহারের কাফ্‌ফারা হিসেবে খাবার দান করতে হবে।

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

জেহারের কাফফারার এ বিধান এজন্যে, যেন তোমরা জাহেলিয়াতের যুগের কুপ্রথা এবং কুসংস্কার পরিহার কর, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের لِتُؤْمِنُوا শব্দটিতে ঈমানের যে কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো, শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা তথা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

এসব হলো আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখা, যারা জেহারের ন্যায় অন্যায় কাজ করে তাদের জন্যে এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখা অলংঘনীয়, আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

'আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

যারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত না থাকে এবং আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা কাফের, আর কাফেরদের শাস্তি অবধারিত।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, তার অবশ্য কর্তব্য হলো ঈমানের দাবী মোতাবেক শরীয়তের যাবতীয় বিধান মেনে চলা তথা পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের প্রবর্তিত বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা কাফের, আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারাও তেমনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহারের কাফ্ফারার আদেশ প্রদানের পাশাপাশি একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এসব হলো আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমা, মোমেন মাত্রের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলা, কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে, তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তাদের অপমান, লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি অবধারিত, কেননা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস শুধু কাফেররাই দেখাতে পারে। আর কাফেরদের শাস্তি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অবশ্যই হবে, আর এটি নতুন কোন কথা নয়, ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যে বা যারা যেখানে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, সেখানেই তারা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে। ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ গয়রহ এ চিরাচরিত নিয়মেই কোপগ্রস্ত হয়েছে। অতএব, আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তারাও রেহাই পাবেনা যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে এবং তাঁর সাথে শত্রুতা রাখে, তাঁর প্রদত্ত বিধানকে অমান্য করে।

وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ

[১] তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৬২

'আর নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি'।

অতএব, সত্য অসত্য এখন সুস্পষ্ট, দেদীপ্যমান, এতে কোন আড়ষ্টতা নেই, আমার আয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যারা এখনো তা অমান্য করবে, তারাই কাফের।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

'আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি'।

এ শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

'যেদিন আল্লাহ পাক সকলকে উত্থিত করবেন, তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সেদিন অবহিত করবেন, আল্লাহ পাক তাদের কর্মের হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা ভুলে গেছে, সব কিছুই আল্লাহ পাকের সম্মুখে রয়েছে'।

কোন কোন দুর্বল চিত্ত লোক মনে করে যে, যারা কাফের, মুশরেক, বেদ্বীন, তারা দুনিয়াতে সর্ব বিষয়ে উন্নতি করে চলেছে, তাদের উন্নতিকে ব্যাহত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছেনা, অথচ তারা কাফের, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, অবাধ্য লোকদের শাস্তি যে দুনিয়াতেই হবে তা নয়; শাস্তির জন্যে সময় নির্ধারিত রয়েছে তা হলো কেয়ামতের দিন, সেদিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেককে তার জীবনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন, প্রত্যেককে তার কীর্তিকলাপের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দেয়া হবে, যা মানুষ ভুলে যায় কিন্তু আল্লাহ পাক সবই সংরক্ষণ করে রেখেছেন, সব কিছুই রয়েছে আল্লাহ পাকের নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ীই প্রতিদান দেয়া হবে। ঈমানদার ও নেককারদের শুভ পরিণতি যেমন সুনিশ্চিত, কাফেরদের শাস্তিও তেমনি অবধারিত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ
نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى
مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ
يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

তরজমা

(৭) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ্ পাক সবই জানেন, তিনজনের পরামর্শ হলে সেখানে তিনি হন চতুর্থ, পাঁচজনের পরামর্শ ক্ষেত্রে তিনি হন ষষ্ঠ, এর চেয়ে কম হোক বা বেশী, যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তিনি রয়েছেন তাদের সঙ্গে। এরপর তিনি তাদেরকে কেয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সব কিছুই জানেন।

(৮) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা এরপর ঐ নিষিদ্ধ কাজটিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে তারা গোপন পরামর্শে লিপ্ত হয়, আর যখন তারা আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়, তখন তারা এমন শব্দ দ্বারা আপনাকে সালাম দেয়, যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আপনাকে সালাম দান করেননি, আর তারা নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এ উক্তির জন্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন শাস্তি প্রদান করেন না? তাদের জন্যে দোযখই যথেষ্ট, তাতে তারা প্রবেশ করবে, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব অবাধ্য লোকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, যারা আখেরাতকে ভুলে

থাকে, আর এ আয়াতে রয়েছে মহান আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ, এ পর্যায়ে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক আসমান যমীনের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, মানুষ যত গোপনেই কোন কাজ করুক না কেন এবং যত গোপন পরামর্শই করুক না কেন, সবই আল্লাহ পাক দেখেন এবং শোনেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

(হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আসমান যমীনের সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, মানুষের জীবনের কোন ঘটনা, কোন রহস্য, কোন গোপন পরামর্শ আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই, তিনজন মানুষ যখন একত্রিত হয়ে গোপন পরামর্শ করে, তারা মনে করে আমরা তিনজন ব্যতীত আর কেউ এ সম্পর্কে জানেনা, তখন তাদের তিনজনের মধ্যে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা হন চতুর্থ, আর যদি তারা পাঁচজন হয়, তখন আল্লাহ পাক হন তাদের মাঝে ষষ্ঠ, গোপন পরামর্শকারীদের সংখ্যা বেশী হোক কিংবা কম- সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গেই থাকেন। তাদের সব কিছু তাঁর জ্ঞানেই রয়েছে এবং কেউ কোন দিন কোন কথা বা কোন কার্যবিবরণী আল্লাহ পাকের নিকট থেকে গোপন রাখতে পারেনা। তিনি কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন।

মদীনা মোনাওয়্যারায় মুনাফেক এবং ইহুদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো, গোপন পরামর্শে লিপ্ত হতো কীভাবে মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করা যায়, আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত, তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবগত করাবেন এবং তোমাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হলে দু'টি মতের মধ্যে একটি মতকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যে তৃতীয় ব্যক্তির মতের প্রয়োজন হয়, তাই পরামর্শের ক্ষেত্রে তিনজন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এছাড়া আল্লাহ পাক বেজোড় সংখ্যাকে পছন্দ করেন, তাই আলোচ্য আয়াতে তিন অথবা পাঁচ-এ দু'টি বেজোড় সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের লক্ষ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন, কিন্তু খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পুত্রের ব্যাপারে এ শর্তারোপ করেছিলেন যে, তিনি খলীফা হতে পারবেন না।[১]

اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَانُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ

'(হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি? যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা এরপর ঐ নিষিদ্ধ কাজটিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে তারা গোপন পরামর্শে লিপ্ত হয়'।

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম মোকাতেল এবনে হাব্বানের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ইহুদীদের মধ্যে যখন শান্তি চুক্তি কার্যকর ছিল, তখন কোন সাহাবী ইহুদীদের এলাকা অতিক্রম করতে দেখলে ইহুদীরা পরস্পর পরামর্শ করতো, তখন ঐ সাহাবীর এ ধারণা হতো যে, এ ইহুদীরা আমাকে হত্যা করার অথবা কোন প্রকার কষ্ট দেয়ার চক্রান্ত করছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তবে তাঁর বিবরণে একথাটুকু বাড়তি রয়েছেঃ মুসলমানগণ যখন ইহুদীদেরকে গোপন পরামর্শে লিপ্ত দেখতেন, তখন মুসলমানগণ বলতেন, মনে হয় আমাদের কোন সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে, অথবা আমাদের কোন সৈন্যবাহিনী পরাজয় বরণ করেছে। এ খবর পেয়েই তারা গোপন পরামর্শ করছে, এভাবে মুসলমানগণ ব্যথিত এবং চিন্তিত হতেন। এ ধরনের ঘটনা যখন প্রায়শঃ ঘটতে শুরু করলো, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পেলেন, তাই তিনি ইহুদীদেরকে এমনি গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তারা এ নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বিরত হলোনা, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-২৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা- ৩৫১
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৯

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, চক্রান্তকারী ইহুদীরা দুশমনদের বিরুদ্ধে গোপন পরামর্শের মাধ্যমে একই সঙ্গে তিনটি অপরাধ করতোঃ

(১) আইন বিরোধী কর্মে লিপ্ত হওয়া,

(২) মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করা এবং তাদের কষ্ট দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া,

(৩) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হওয়া।

মদীনা মোনাওয়্যারার এ ইহুদীরা শুধু যে এসব অন্যায়ে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তাদের অপরাধের ফিরিস্তি ছিল আরো দীর্ঘ, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا جَاۤءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ

'আর (হে রসূল!) তারা যখন আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়, তখন তারা এমন শব্দ দ্বারা আপনাকে সালাম দেয়, যা দ্বারা আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম প্রদান করেননি'।

ইহুদী ও মুনাফেকরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে বসেও পরস্পর কানাঘুষা করতো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপ করতো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু' বলতেন, অর্থাৎ হে নবী! আপনার প্রতি সালাম কিন্তু মুনাফেক ও ইহুদীরা বলতো, আসসামু আলাইকা (অর্থাৎ আপনার মরণ (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক) তবে কথাটি এমনভাবে উচ্চারণ করতো যে, সকলে তা বুঝতে সক্ষম হতোনা। এভাবে ইহুদীরা মুসলমানগণকে বিশেষতঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা করতো। শুধু তাই নয়; তারা নিজেদের মধ্যে একথা বলাবলি করতোঃ

وَيَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ

'যদি তিনি সত্যিই নবী হন, তবে আমাদের এসব উক্তি এবং আচরণের কারণে আমাদের উপর আল্লাহ্ পাকের আযাব কেন আপতিত হয়না'?

তাদের এসব কথার শাস্তির ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী বাক্যাংশেঃ

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

'তাদের শাস্তি হিসেবে দোযখই যথেষ্ট, তাতে তারা প্রবেশ করবে, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান'।

বর্ণিত আছে যে, ইহুদী ও মুনাফেকরা যখন উল্লেখিত উক্তি করতো, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু বলতেনঃ ওয়াআলাইকা (অর্থাৎ তুমি আমার ব্যাপারে যা কামনা করছো, তোমার প্রতিও তাই হোক)।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার ইহুদীদের উল্লেখিত উক্তির জবাবে বলেছিলেনঃ ওয়াআলাইকাস্যাম, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করেননি। ইমাম বোখারী (রঃ) সংকলিত হাদীসে রয়েছে, একবার কিছু ইহুদী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় এবং তারা তাঁকে "আসসামু আলাইকুম" বলে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জবাবে "ওয়াআলাইকুম" বলেন, কিন্তু উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) তা সইতে পারেননি, তাই তিনি বললেন, আসসামু আলাইকুম ওয়া লা'অনাকুমুল্লাহ, ওয়াগাজাবুল্লাহে আলাইকুম, (তোমাদের প্রতি ধ্বংস, আল্লাহ্‌র লা'নত এবং গজব হোক) তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন কর, শক্ত কথা এবং মন্দ কথা থেকে বিরত থাক।

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন, আপনি কি শুনেননি, তারা কি বলেছে? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি যা বলেছি তা কি তুমি শোননি? আমি তাদের কথা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার বদদোয়া কবুল হবে, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বদদোয়া কবুল হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইহুদী যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তাদের কিছু লোক "আসসামু আলাইকুম" বলে, তোমরাও প্রতি উত্তরে 'ওয়ালাইকা' বল।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আহলে কেতাবরা তোমাদেরকে সালাম দেয়, তোমরাও 'ওয়ালাইকুম' বল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ
فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩﴾ اِنَّمَا النَّجْوٰى
مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ
لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

তরজমা

(৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন গোপন পরামর্শ কর, তখন সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা সম্পর্কে না হয়, বরং তোমরা পরামর্শ কর কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন সম্পর্কে, আর আল্লাহ্ পাককে ভয় কর যার নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত হতে হবে।

(১০) গোপন পরামর্শ হয় শয়তানের কাজ, এর দ্বারা শয়তান মোমেনদের মনঃক্ষুন্ন করতে চায়, তবে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান মোমেনদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবেনা, আর মোমেনদের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখা।

(১১) হে মোমেনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় তোমরা সরে বসে মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে স্থান প্রশস্ত করবেন, আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় উঠে যাও, তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে এলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাদের মর্যাদা উন্নত করবেন। আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী ও মুনাফেকদের ইসলাম বিরোধী কুপরামর্শের উল্লেখ ছিল, এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

হে মোমেনগণ! মোনাফেকদের ন্যায় তোমরা পাপাচার, সীমালংঘন এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ সম্পর্কে পরস্পর পরামর্শ করোনা, মুসলমানদের ব্যাপারে এমন পরামর্শ অনাকাংখিত, কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শে এজন্যে লিপ্ত হতো যেন মুসলমানগণ আতংকিত হয়, কিন্তু মুসলমানগণের পরামর্শ হবে সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, কল্যাণকর কাজে এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর মহান আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরস্পর পরামর্শ করা অন্যায় নয়; অন্যায় হয় যখন মন্দ উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। পক্ষান্তরে, সৎ উদ্দেশ্যে কল্যাণকর কাজে পরামর্শ নিন্দিত নয়; বরং অভিনন্দিত। এ পর্যায়ে মানদন্ড হলো তাকওয়া পরহেজগারী, এজন্যে পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۞

'তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত ঈমানের ফলশ্রুতি হলো মানব মনে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হওয়া, আর এ ভয়ই মানুষকে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বিশেষতঃ মানুষ যখন এ সত্য উপলব্ধি করে যে, অবশেষে তাকে চিরতরে এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং যে কোন মুহূর্তে তার এ জীবনের অবসান ঘটতে পারে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে, এ সত্য উপলব্ধির ফলশ্রুতি হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর দরবারে তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মোনাফেকদেরকে, কেননা তারা শুধু মুখে ইসলামের দাবীদার ছিল, তাদের অন্তরে ঈমান ছিলনা।

আতা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা সে সব মোমেনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা তাদের ধারণা মোতাবেক ঈমান এনেছিল।

فَلَا تَتَنَاجَوْا

অর্থাৎ তোমরা ইহুদী ও মুনাফেকদের ন্যায় কুপরামর্শে লিপ্ত হয়োনা; বরং তোমাদের প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালনে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে পরামর্শ কর।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক'।

কোন কাজ করা বা না করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো আল্লাহ পাকের ভয়, যে কাজে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট সে কাজ করা মোমেনের কর্তব্য, মুনাফেকরা পরস্পর পরামর্শ করতো আর তা মুসলমানগণের মনোকষ্টের কারণ হতো, তাই এমন পরামর্শ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমরা কোথাও তিনজন হও তখন একজনকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দু'জন গোপন পরামর্শ করতে যেওনা, কেননা এ কার্যক্রম তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হয়, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি অনুমতি দেয়, তবে তাতে ক্ষতি নেই।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমরা তিনজন একসঙ্গে থাক, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জন পরামর্শ করোনা, কেননা এভাবে তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে।

বোখারী, মুসলিম, তিরমিজী, এবনে মাজায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ মর্মের হাদীস সংকলিত হয়েছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, ইসলাম এমন কোন আচরণের অনুমতি দেয় না, যা কোন মুসলমানের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে, এজন্যে অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়, আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আল্লাহ পাককে কষ্ট দেয়।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

'বস্তুতঃ এমন গোপন পরামর্শ শুধু শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়, এর দ্বারা শয়তান মোমেনদেরকে মনঃক্ষুন্ন করতে চায়, তবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান মোমেনদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবেনা'।

ইহুদীরা শয়তানের প্ররোচনাতেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন পরামর্শে লিপ্ত হয়, হে মোমেনগণ! তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত শয়তান তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, অতএব দুশমনদের কুপরামর্শে তোমরা বিচলিত হয়োনা, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি ব্যতীত কিছুই হয়না, তাই মুসলমানদের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখা, আশা শুধু তাঁরই নিকট এবং ভরসা শুধু তাঁরই প্রতি, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

'আর মোমেনদের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখা'।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا

'হে মোমেনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা (সরে বসে) মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও'।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) মোকাতেল এবনে হাব্বানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মোহাজের ও আনসারদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন। একদিন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। তাঁদের আগমনের পূর্বে মজলিসে অন্য অনেক লোক উপবিষ্ট ছিলেন, তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁরা সালাম দিলেন, তিনি সালামের জবাব দিলেন। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামকে সালাম দিলেন, তাঁরা জবাবও দিলেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন মুসলমানগণ তাঁদের বসার জন্যে স্থান করে দেবেন, কিন্তু কেউ এ কাজটি করেননি। বিষয়টি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অত্যন্ত অপছন্দ হয়। তাই তিনি তাঁর পাশের জনের নাম ধরে ডেকে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে যাও। এভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে কয়েকজন সাহাবা ছিলেন তাঁদের বসার ব্যবস্থা করলেন এবং অন্যদেরকে উঠিয়ে দিলেন। যাদের উঠতে হয়েছে তাদের মনে কষ্ট হয়। কষ্টের এ ভাব তাদের চেহারাতেই ভেসে ওঠে, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا

'যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা (সরে বসে) মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দাও, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে (জান্নাতে) স্থান প্রশস্ত করবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেও'।

এবনে আবি হাতেমের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত জুমআর দিন নাযিল হয়েছে। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম জুমআর দিন এসেছিলেন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত সাবেত এবনে কায়েস এবনে সাম্মাছ (রাঃ) সম্পর্কে। সূরা হুজুরাতে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এবনে জরীর কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতেন। আর ঐ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে অনেক লোক আসা যাওয়া করতেন। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে কেননা, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে বসবার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করতো। সকলেই আশা করতো, তাঁর বাণী শ্রবণ করতে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে।

يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি মুসলমানদের জন্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে জান্নাতে স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তোমাদের রিয্ক প্রশস্ত করে দেবেন, অথবা এর অর্থ হলো, তোমাদের মনের কপাট খুলে দেবেন, অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে দেবেন।

মজলিসে আসন গ্রহণের আদব

আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে মজলিসে আসন গ্রহণের আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে হে মোমেনগণ! কোন মজলিসে আসন গ্রহণ করতে হলে অন্যের বসবার জন্যে স্থান রেখে দিও। এটি মজলিসের আদব, যদি তোমাদেরকে সরে বসে অন্যদের স্থান করে দিতে বলা হয়, তবে তাতেও দ্বিধাবোধ করোনা, এমনকি যদি অবস্থা এমন হয় যে, তোমাদেরকে উঠে গিয়ে অন্যদেরকে স্থান

করে দিতে বলা হয়, তবু কিছু মনে করোনা; বরং বিনা দ্বিধায় উঠে গিয়ে অন্যের বসবার স্থান করে দাও, এটিই ভদ্রতা এবং মজলিসের আদব।

ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্য করা যায়, যারা মজলিসে আগে থেকে উপস্থিত থাকে, তারা আসন পেতে জেঁকে বসে, ফলে যারা পরে আসে, তারা স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ একটু ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এদিক সেদিক সরে বসলে আগন্তুকদের স্থান হতে পারে।

এছাড়া আগে যারা এসেছে, তাদের কথা হয়তো শেষ হয়েছে, তারপরও বসে থাকায় পরবর্তীতে যারা এসেছে তাদের জন্যে স্থানাভাব দেখা দেয়, এমন অবস্থায় প্রথমোক্তদের উঠে যাওয়াই উচিত, কিন্তু যদি তারা বসেই থাকেন এবং শেষোক্তদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তবে তা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ভদ্রতার পরিপন্থী। মজলিসের উদ্যোক্তাগণ যদি এমন অবস্থায় কাউকে উঠে যেতে বলেন তবে মনঃক্ষুন্ন হওয়ার কোন যুক্তি নেই। অহংকার পরিহার করাই শ্রেয়। এসব ক্ষেত্রে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হওয়া উচিত নয়; বরং বিনয় প্রকাশ পাওয়া কর্তব্য, যারা বিনয়ী, যারা অন্যের সেবার স্থান করে দেয়, আল্লাহ পাক তাদের জন্যে জান্নাতে স্থান প্রশস্ত করে দেবেন, এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা।

আল্লামা বগভী হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন জুমআর দিন তার কোন মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে না দেয়; বরং বলবে আমাকেও একটু স্থান দাও।

তফসীরকার আবুল আলীয়া, কুরতবী এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এ আদেশ হলো জেহাদের সময় দুশমনের মোকাবেলা করার জন্যে স্থান গ্রহণের ব্যাপারে, কেননা যাঁরা প্রথম থেকে রণাঙ্গনে যুদ্ধরত হতেন, তাঁরা শাহাদাত বরণের অনেক বেশী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে থাকতেন, নবাগতরা স্থান পেতেন না, তাই এ আদেশ হয়েছে।

وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا

'আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেও'।

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামা এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক নামাযের জন্যে উঠতে গাফলত করতো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। শানে নুযুলের এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, নামাযের জন্যে যখন আযান হবে তখন উঠে দাঁড়াও।

মুজাহেদ (রঃ) এবং অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ মর্ম বর্ণনা করেছেন, যখন তোমাদেরকে নামায অথবা জেহাদ অথবা অন্য কোন নেক কাজের জন্যে ডাকা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়াও, গাফলত করোনা।

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে এলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের মর্যাদা উন্নত করবেন'।

এলমের ফজিলত

এ আয়াতে বিশেষতঃ উম্মতের ওলামায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর ওলামায়ে কেরাম বলতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আলেমে বা আমল। কেননা, আলেমের এলম ও আমল উভয়টিরই অনুসরণ করা হয়। আলেমকে তার নেক আমলের সওয়াবতো দেয়াই হয় এবং যারা তার কথার উপর নেক আমল করে এজন্যেও তাদেরকে সওয়াব দেয়া হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অনুসরণকারীদের সওয়াব কেটে আলেমদেরকে দেয়া হয়, বরং অনুসারীদেরকে পূর্ণ সওয়াব দেয়া হয়, আর আলেমদেরকেও সওয়াব দেয়া হয়।

মুসলিম শরীফে হযরত জরীর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল পন্থা প্রবর্তন করে এবং তার উপর লোকেরা আমল করে তবে সে ব্যক্তিকে ঐ আমলের জন্যে সওয়াব দেয়া হবে। সাথে সাথে যারা তার প্রবর্তিত পন্থায় নেক আমল করবে, তাদের পক্ষ থেকেও তাকে সওয়াব দেয়া হবে এবং তাদের সওয়াবে কোন রকম কমও করা হবেনা।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আবেদের উপর আলেমের ফজিলত এমনি, যেমন চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ফজিলত রয়েছে অন্যান্য নক্ষত্রের উপর। ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম উত্তরাধিকার স্বরূপ ধন-দৌলত রেখে যাননা, তাঁরা শুধু এলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। যে ব্যক্তি এ উত্তরাধিকার গ্রহণ করে সে বড় খোশ নসীব। ইমাম আহমদ (রঃ) এ হাদীস কাসীর এবনে কায়েসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আবেদের উপর আলেমের ফজিলত এমন, যেমন তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারীর ফজিলত সর্বনিম্ন মর্তবার ব্যক্তির উপর। (তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মসজিদে দু'টি স্থানে মাহফিল হচ্ছিল, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ স্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ উভয় মজলিইসেই ভাল, কিন্তু একটি থেকে আরেকটি উত্তম, এরা তো আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছে, আর এদিকেই তারা

আকৃষ্ট, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে দান করবেন, আর যদি ইচ্ছা না করেন, তবে দান করবেন না। আর এরা (অন্য মজলিসের লোকেরা) এলমে দ্বীন শিখছে এবং অন্যকে শেখাচ্ছে, এজন্যে প্রথম মজলিসের চেয়ে এ মজলিসের লোকদের মর্তবা উচ্চে, আর আমাকে শিক্ষক রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ মজলিসে আসন গ্রহণ করলেন।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, হে লোক সকল! এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন কর, এতে এলম হাসিল করার প্রতি রয়েছে অনুপ্রেরণা, আল্লাহ পাক এরশাদ করছেনঃ 'যে মোমেন দ্বীন ইসলামের এলম রাখেনা, তার চেয়ে মোমেন আলেমের মর্তবা অনেক উচ্চে'।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সে মর্যাদা দান করতেন।

তৃতীয়তঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের জন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে উঠে যাওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা-যে সঠিক ছিল, এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐ নির্দেশ মোতাবেক উঠে যায়, তাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সওয়াব প্রদান করা হবে।

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ.............. دَرَجٰتٍ

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে মোমেনদের মধ্যে যারা আলেম, তাদের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এতে দু'টি কথা রয়েছেঃ

(এক) এ উচ্চ মর্যাদা হলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে তাঁর নৈকট্য-ধন্য করতেন।

(দুই) তাদের এ উচ্চ মর্যাদা হলো তাঁদের সওয়াবের ব্যাপারে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মর্তবার ক্ষেত্রে অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে আখেরাতে অধিকতর সওয়াব এবং বিশেষ মর্যাদা দান করবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আলেমদের উচ্চ মর্তবার যে ঘোষণা রয়েছে তার কারণ এই, আলেমদের এলম দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তাদের অনুসরণ করে অন্যরা নেক আমল করে, কিন্তু যে মোমেন আলেম নয়, তার দ্বারা এমন কাজ অকল্পনীয়।

এতদ্ব্যতীত আলেম জানেন কীভাবে আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কাজ থেকে এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং আত্ম-জিজ্ঞাসা থেকে আত্মোন্নতির পথ শুধু আলেমগণেরই জানা, কীভাবে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে বিনয় প্রকাশ করতে হয় এবং কীভাবে দরবারে এলাহীতে তওবা এস্তেগফার করতে হয় আর তওবার সময়, পন্থা সম্পর্কেও কেবল মাত্র আলেমগণই অবগত। কাজেই আলেমগণ অধিকতর সওয়াব লাভ করতে পারেন, অবশ্য একথাও সত্য যে, সব কিছু জানা সত্ত্বেও তারা যদি গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তিও অধিকতর হওয়ার আশংকা রয়েছে।[১]

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে তাদের জন্যে রয়েছে এতে সুসংবাদ, কেননা আল্লাহ্ পাক তাদের নেক আমলের সওয়াব দান করবেন, পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্ পাকের হুকুম অমান্য করে, তাদের জন্যে রয়েছে এতে সতর্কবাণী, কেননা তাদের অবাধ্যতার কারণে তিনি তাদের শাস্তি বিধানও করতে পারেন।[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৭০
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৫৮

তরজমা

(১২) হে মোমেনগণ! যখন তোমরা রসূলের সাথে পরামর্শ করতে চাও, তখন এ পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা আদায় করবে, এটিই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার জন্যে উত্তম উপায়, আর যদি তোমাদের সদকা প্রদানের সামর্থ না থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৩) তোমরা কি পরামর্শের পূর্বে সদকা প্রদানে ভয় পেয়েছ? যখন তোমরা সদকা প্রদান করতে পারলেনা তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করলেন। অতএব, তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন কর আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মুনাফেকরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে নিজেদেরকে তাঁর একান্ত আপন এবং অতি অন্তরঙ্গ বলে প্রকাশ করার অসৎ উদ্দেশ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরামর্শ করতো। তাঁর কানে কানে কথা বলার চেষ্টা করতো। তারা যে তাঁর অত্যন্ত ঘণিষ্ঠ, একথা প্রকাশ করতেই তারা এমন তৎপরতা দেখাতো, এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনেক কাজের ক্ষতি হতো, অনেক লোক তাঁর দরবার থেকে মাহরুম হতো। তাই আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করার পূর্বে আল্লাহর রাহে দান সদকা করার আদেশ দেয়া হলো, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَـٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'হে মোমেনগণ! যখন তোমরা রসূলের সাথে পরামর্শ করতে চাও, তখন এ পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা আদায় করবে, এটিই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার জন্যে উত্তম উপায়, আর যদি তোমাদের সদকা প্রদানের সামর্থ না থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

এবনে আবি হাতেমের সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন অনেক লোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ থেকে বিরত হয়, মুনাফেকরা তাদের

মজ্জাগত কৃপণতার কারণে দান খয়রাত করার ভয়ে দূরে সরে পড়ে, ফলে এ বিধানের ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। আর মুসলমানগণ এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কানে কানে কথা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় নয়, তাই তাঁরাও তাতে বিরত থাকেন।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا

'আর যদি তোমাদের সদকা প্রদানের সামর্থ না থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

অর্থাৎ যারা গরীব মিসকীন, সদকা প্রদানে অক্ষম, অপারগ, তাদের ব্যাপারে সদকা আদায়ে কড়াকড়ি নেই, এর দ্বারা দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের উপকার হয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয়, অতীব দয়াবান।

সর্বোপরি যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মুনাফেকদের অপপ্রয়াস বন্ধ হলো; এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুনাফেকরা আর পূর্বের ন্যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি এসে কথা বলতে প্রয়াসী হয়নি।

আল্লামা বগভী (রঃ) মোকাতেল এবনে হাব্বানের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সম্পদশালী লোকদের ব্যাপারে, তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতেন। এর পরিণতিতে গরীব দুঃখী সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটে বসার সুযোগই পেতেন না, এ অবস্থা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ছিল অত্যন্ত অপছন্দনীয়, তাই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলার পূর্বে দান খয়রাত করার হুকুম যখন নাযিল হলো তখন হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি, একমাত্র হযরত আলীই (রাঃ) এক দিনার আল্লাহ পাকের রাহে দান করে কিছু কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়েছিলেন। এরপর আলোচ্য আয়াতের এ হুকুম মনসুখ হয় এবং সাধারণ ভাবে কথা বলার অনুমতি হয়। এজন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে এমনি একটি আয়াত আছে, যার উপর আমার পূর্বে কেউ আমল করেনি এবং পরেও কেউ আমল করতে পারবেনা, আর তা হলো আলোচ্য আয়াত।

তফসীরে মাদারেকে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যখন আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতাম, তখন এক

দেরহাম খয়রাত করে দিতাম। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট দশটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি জবাব দিয়েছেন,

(১) আহাদ (অঙ্গীকার) কি? আর তা কিভাবে পুরো করা হবে?

তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা মেনে নেয়া এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়া হলো আহাদ।

(২) আমি বলেছি ফ্যাসাদের তাৎপর্য কি? তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা, তাঁর সাথে শেরক করা।

(৩) আমি জিজ্ঞাসা করেছি হক্ব কি? তিনি.এরশাদ করেছেন ইসলাম, কোরআন এবং বেলায়েত।

(৪) আমি জিজ্ঞাসা করেছি "হিলা" কি?

তিনি এরশাদ করেছেন, হিলা পরিত্যাগ করা অর্থাৎ যাবতীয় উপকরণ বিনষ্ট করা।

(৫) আমি জিজ্ঞাসা করেছি, আমার কর্তব্য কি?

তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

(৬) আমি আরজ করেছি, আল্লাহ পাকের দরবারে কীভাবে দোয়া করবো?

তিনি এরশাদ করলেন, পূর্ণ এখলাস, একীন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দোয়া করবে।

(৭) আমি আরজ করেছি, আল্লাহ পাকের নিকট কি চাইব?

তিনি এরশাদ করেছেন, দোযখ থেকে এবং দুনিয়ার বালা-মসিবত থেকে পানাহ চাইবে।

আমি আরজ করেছি, আমার নাজাতের জন্যে কি করবো?

তিনি এরশাদ করেছেন, হালাল রুজি খাও এবং সত্য কথা বল।

(৯) আমি আরজ করেছি খুশী কি?

তিনি এরশাদ করেছেন জান্নাত।

(১০) আমি আরজ করেছি শান্তি, আরাম নিশ্চিন্ত মন কি?

তিনি এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের সঙ্গে মোলাকাত। আল্লাহ পাকের দীদার হাসিল করা। যখন এ প্রশ্ন গুলো আমি করলাম এবং জবাব পেয়ে গেলাম, তখন এ হুকুম মনসুখকারী আয়াত নাযিল হলো।

ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ

আল্লাহর রাহে দান করা তোমাদের জন্যে অর্থ-সম্পদের মায়া মহব্বত থেকে উত্তম, কেননা দান সদকা করা অর্থ-সম্পদের মায়া মহব্বত থেকে উত্তম।

وَاَطْهَرُ

আর তোমাদের গুনাহর অপবিত্রতা দূরীভূতকারী।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا

যদি তোমরা দারিদ্র্যের কারণে অর্থ-সম্পদ দান করতে অপারগ হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

অর্থাৎ যারা দারিদ্র-পীড়িত, যারা সদকা প্রদানে অক্ষম, অপারগ, তাদের জন্যে সদকা প্রদানের বিধান শিথিল করা হয়, এভাবে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করা সহজ হয়েছে, আর এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল মুনাফেক এবং ঈমানদারদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। মুনাফেকরা এ বিধান প্রবর্তনের পর সরে পড়ে। এরপর এ বিধান তুলে নেয়া হয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ط فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

(তোমরা কি পরামর্শের পূর্বে সদকা প্রদানে ভয় পেয়েছ? যখন তোমরা সদকা প্রদান করতে পারলে না, তখন আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করলেন।)

অর্থাৎ সদকা প্রদানের আদেশ রহিত করলেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

'অতএব, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় করতে থাক, আর আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের আদেশ পালনে তৎপর থাক'।

তফসীরকারগণ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন (আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন) এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের আদেশ পালন না করার কারণে তিনি তোমাদের প্রতি কোন আযাব নাযিল করেননি।

অথবা এর অর্থ হলো এ আদেশ তোমাদের জন্যে কঠিন হওয়ায় তা রহিত করেছেন এবং দান সদকা না করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দান করেছেন।

মোকাতেল এবনে হাব্বান (রঃ) বলেছেনঃ এ হুকুম দশ রাত পর্যন্ত কার্যকর ছিল, আর কালবী (রঃ) বলেছেন, এক দিনের কিছুক্ষণ এ হুকুম কার্যকর ছিল।

فَاَقِيْمُوا

অর্থাৎ দান সদকা করার যে আদেশ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল তা যখন রহিত হলো, তখন তোমরা নামায কায়েমে আত্মনিয়োগ কর, যাকাত আদায়ে গাফলত করোনা এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুসলমানগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশেষ পরামর্শের সময় সদকা আদায় করে নিতেন। কিন্তু যাকাত আদায়ের আদেশের মাধ্যমে সদকা করার ঐ বিধান রহিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অনেক প্রশ্ন করতো, যা কখনো কখনো তাঁর কষ্টের কারণ হতো, তাই আল্লাহ পাক সদকা প্রদানের বিধান প্রবর্তন করলেন। অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করার পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেল, তাই আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি দয়া করে ঐ সদকা প্রদানের প্রথা বাতিল করলেন। তফসীরকার একরামা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মোকাতেল (রঃ) একথাই বলেছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কয়েক ঘন্টা এ আদেশ কার্যকর ছিল, শুধু আমিই এর উপর আমল করতে পেরেছি, এরপর তা মনসুখ হয়ে যায়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৬০-৬১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-১৪

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا
منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴿١٤﴾ أعد الله لهم عذابا
شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴿١٥﴾ اتخذوا أيمانهم جنة
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ﴿١٦﴾ لن تغني عنهم
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحب النار
هم فيها خلدون ﴿١٧﴾ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له
كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم
الكذبون ﴿١٨﴾ استحوذ عليهم الشيطن فأنسىهم ذكر الله
أولئك حزب الشيطن ألا إن حزب الشيطن هم الخسرون ﴿١٩﴾
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ﴿٢٠﴾

তরজমা :

(১৪) (হে রসূল!) আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব পড়েছে। তারা (মুনাফেকরা) হে মোমেনগণ!) তোমাদের দলভুক্ত নয়, আর তাদের দলভুক্তও নয়, অথচ তারা জেনে শুনে মিথ্যা কথায় শপথ করে বসে।

(১৫) আল্লাহ পাক তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠিন শাস্তি, নিশ্চয় তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ।

(১৬) তারা তাদের মিথ্যা শপথগুলোকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে, এরপর তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(১৭) আল্লাহ পাকের শাস্তির মোকাবেলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন উপকারেই আসবেনা। তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে।

(১৮) সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ পাক তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, তখন তারা তোমাদের সম্মুখে যেমন শপথ করতো, তেমনি আল্লাহ পাকের

সম্মুখেও শপথ করবে। তারা এমন ধারণা করবে যে, আমরা ভাল অবস্থায় রয়েছি, সাবধান! নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী।

(১৯) মূলতঃ শয়তান তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে, পরিণামে তাদেরকে বিস্মৃত করে দিয়েছে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল, সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই সর্বস্বান্ত হবে।

(২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা হবে সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুনাফেক এবং ইহুদীদের আলোচনা ছিল, যারা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাযির হয়ে তাঁকে এবং মুসলমানগণকে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতো।

আর এ আয়াতে মুসলমানগণকে এমন মুনাফেক এবং কোপগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখার তাগিদ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো যারা প্রকৃত মুসলমান তারা যেন ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে কোন প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

'(হে রসূল!) আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের উপর আল্লাহ্ পাকের গজব পড়েছে'।

শানে নুযুল

ইমাম আহমদ (রঃ), তেবরানী, বাজ্যার এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন হুজরা শরীফে অথবা তার ছায়ায় অবস্থান করছিলেন, এমন সময় তিনি এরশাদ করলেন, একজন কঠোর অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তি এখনই তোমাদের নিকট আসবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যার অন্তর জালেমের অন্তরের ন্যায় হবে, অর্থাৎ সে শয়তান হবে, যখন সে আসবে, তোমরা তার সঙ্গে কোন কথা বলবেনা, একটু পরই সম্মুখের দিক থেকে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখা গেল। সে নীল বর্ণের চক্ষু বিশিষ্ট, কানা ব্যক্তি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা আমাকে গালি দাও কেন? সে বললোঃ আমাকে ক্ষণিকের জন্যে অনুমতি দিন, আমি একটু পর আপনার নিকট আসছি। সে ব্যক্তি চলে গেল

এবং তার সাথীদের নিয়ে আসল, তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে শপথ করে বললো, আমরা আপনাকে এসব কথা বলিনি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

এ আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীদের সঙ্গে তাদের আন্তরিক প্রীতি-বন্ধন ছিল অথচ ইহুদীরা ছিল আল্লাহর কোপগ্রস্ত জাতি। মুনাফেকরা প্রকৃতপক্ষে ইহুদীও নয়; মুসলমানও নয়। ঈমানদারদের নিকট এসে ঈমানের কথা বলে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে শপথ করে বলে যে, আমরা মোমেন অথচ অন্তরে মোমেনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে, এ মিথ্যা কথার উপর মিথ্যা শপথ করে, আর ঐ শপথকে আত্মরক্ষার্থে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। মুসলমানদেরকে এমন মুনাফেকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখার বিশেষ তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে এবং তাদের কঠিন শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

তফসীরকারগণ বলেছেন, الذين تولوا। (যারা বন্ধুত্ব করে কোপগ্রস্ত জাতির সাথে) কথাটি দ্বারা আবদুল্লাহ এবনে নাবতাল (মতান্তরে আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল) এবং তার সঙ্গীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২]

আর قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ (যে জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের গজব পড়েছে) কথাটি দ্বারা ইহুদী জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মদীনা মোনাওয়্যারার মুনাফেকরা ইহুদীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাযির হতো এবং এ পবিত্র মজলিসের কথাবার্তা ইহুদীদেরকে জানিয়ে দিত, এভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো।

مَا هُمْ مِّنْكُمْ

মুনাফেকরা দ্বীনের দিক থেকে তোমাদের দলভুক্ত নয়; কেননা তারা প্রকৃত মোমেন নয়। তারা বন্ধুত্ব রাখে ইহুদীদের সঙ্গে।

وَلَا مِنْهُمْ

আর তারা ইহুদীদেরও অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

তারা শপথ করে মিথ্যা দাবী করতো যে আমরা মুসলমান অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান নয়, আদৌ তারা ঈমানদার ছিলনা, তবে ঈমানের দাবীদার ছিল।

১। তফসীরে আল বাহরুল মুহীত খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৬১
২। তফসীরে আল বাহরুল মুহীত খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩৭

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

তারা জেনে শুনেই মিথ্যা শপথ করতো। তারা যে নিজেদেরকে সত্যবাদী মনে করতো এমন নয়; বরং নিজেদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করেই মিথ্যা শপথ করতো।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত মুনাফেক আবদুল্লাহ এবনে নাবতালের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বসতো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথাগুলো ইহুদীদেরকে জানিয়ে দিত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুনাফেক আবদুল্লাহকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সে সরাসরি তা অস্বীকার করলো, এরপর নিজের সঙ্গীদের নিয়ে আসল এবং তারা বললোঃ আমরা আপনার সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তি করিনি।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا

আল্লাহ পাক তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠিন শাস্তি। দোযখের সর্ব নিম্নস্তরেই হবে তাদের স্থান, তাই অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

(নিশ্চয় মুনাফেকরা দোযখের সর্ব নিম্ন স্তরেই থাকবে, কেননা দুনিয়ার জীবনে তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত ছিল।)

আর এ ঘৃণ্য কর্ম হলো মুনাফেকী, ধোকাবাজি, প্রতারণা, ছলচাতুরী, মানুষকে কষ্ট দেয়া, সত্য পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা, মানবতার কষ্টি পাথরে এসব হলো অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

নিশ্চয় তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ এবং ঘৃণ্য, তাই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ শাস্তি হলো কবরের আযাব। এর কারণ এই, মুনাফেকরা মুখে ঈমানের দাবীদার ছিল, প্রকাশ্যে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করলেও তাদের অন্তর ছিল কাফেরদের সাথে, তাদের বন্ধুত্ব ছিল আল্লাহ পাকের গজবে পতিত, চির অভিশপ্ত ইহুদী জাতির সঙ্গে অথচ মুসলমানদের নিকট তারা শপথ করে বলতো, আমরা তো মুসলমান, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তারা তাদের মিথ্যা শপথগুলোকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করেছে। এর পর তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, অর্থাৎ এ মুনাফেকরা শুধু যে মনে প্রাণে সত্য গ্রহণ করেনা তাই নয়; বরং তারা সত্য গ্রহণে অন্য মানুষকেও বাধা দেয়।

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

'তাই তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, এ আয়াতে সে ঘোষণারই তাগিদ রয়েছে আর একথাও রয়েছে, মুনাফেকদের ঐ শাস্তি শুধু কঠিনই হবে না; বরং তা হবে অত্যন্ত অপমানজনকও। এর তাৎপর্য হলো তাদেরকে কঠোর কঠিন দৈহিক শাস্তি দেয়ার পাশাপাশি মানসিকভাবেও তারা লাঞ্ছনা এবং অপমান ভোগ করবে।

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

'আল্লাহ পাকের শাস্তির মোকাবেলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাদের কোন উপকারেই আসবেনা। তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে'।

মুনাফেকরা মুসলমানদের নিকট মিথ্যা শপথ করে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো, এভাবে তারা আশা করতো যে, তাদের অর্থ-সম্পদ এবং প্রাণ রক্ষা পাবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আখেরাতে তাদের জন্যে যে শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাদের এ অর্থ-সম্পদ কোন কাজেই আসবেনা।

বর্তমান পৃথিবীতেও বিভিন্ন সময়ে বহু জাতি সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করে সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে গাফেল থাকার কারণে তাদের শাস্তি অবধারিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, জাগতিক এ শক্তি-সামর্থ আখেরাতে তাদের কোন উপকারেই আসবেনা। দুনিয়ার অনেক দুর্বল জাতি শক্তিশালী জাতিগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে এবং

দুর্বলচিত্ত কোন কোন মুসলমানও আধুনিক বিশ্বের উন্নত জাতিগুলোকে ভাগ্যবান বলে মনে করে, অথচ কোরআনে করীমের চিরন্তন ঘোষণা হলো কাফেরদের বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক কোন উন্নতিই আখেরাতে কোন কাজে আসবেনা, আল্লাহ পাকের কঠোর শাস্তি থেকে তারা নিস্তার পাবেনা।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো যারা মুনাফেক, তারাই অভিশপ্ত কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কোন মুসলমানের পক্ষে তা অসম্ভব এবং অচিন্তনীয়, কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

"হে মোমেনগণ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করোনা"।

অন্যত্র আরো এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ............فِىْ شَىْءٍ

"মোমেনগণ যেন মোমেন ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে"।

কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে অনেক মুসলিম নামধারী লোকও বিনা দ্বিধায় কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, যার পরিণতিতে শুধু যে তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র হারিয়ে ফেলে তাই নয়; বরং জাতি হিসেবেও দুর্বল হয়ে পড়ে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য, এদিক থেকে বিচার করলে মুসলিম জাহানের পক্ষে এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সার্বজনীন, যারা যখন যেভাবে তার উপর আমল করবে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তার ফল লাভ করবে, পক্ষান্তরে, যারা যখন যেভাবে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বিরোধী কাজ করবে, তারা তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে, আর সে শাস্তির কথাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

'তারাই দোযখবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে'।

আর আখেরাতের শাস্তি বহু দূরেও নয়; কেননা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের পুরস্কার বা শাস্তি শুরু হয়ে যায়।

এতদ্ব্যতীত, প্রতিদিনই কেয়ামতের কঠিন দিন ঘনিয়ে আসছে, তাই পরবর্তী আয়াতেই কেয়ামতের দিনের উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ

(সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ পাক তাদের সকলকে একত্রিত করবেন (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন)। তখন তারা আল্লাহ্ পাকের সম্মুখেও শপথ করবে, যেমন তারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করতো, তারা এমন ধারণা করবে যে, আমরা ভাল অবস্থায় রয়েছি।)

বস্তুতঃ যারা সারা জীবন মিথ্যা ধোঁকা এবং মুনাফেকীতে লিপ্ত থাকে, তারা কেয়ামতের দিনও মিথ্যা শপথ করে বসবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এভাবেঃ

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

সাবধান! খুব ভালভাবে জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী। তাদের এ মিথ্যাবাদিতার শাস্তি বড়ই কঠিন, অত্যন্ত অপমানজনক, তাদের এ মিথ্যাবাদিতা এবং মুনাফেকীর কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

মূলতঃ শয়তান তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে, পরিণামে তাদেরকে বিস্মৃত করে দিয়েছে আল্লাহ পাকের স্মরণ, আল্লাহ্ পাকের জিকর থেকে তারা সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে পড়েছে। আর গাফলত এত বেশী হয়েছে যে, তারা ভুলেই গেছে অবশেষে একদিন প্রত্যেককে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে, এখানকার কোন কিছুই সঙ্গে যাবেনা, আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর একথাও তারা ভুলে গেছে যে আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ

এরা হল শয়তানেরই দল।

اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই সর্বস্বান্ত হবে, কেননা তারা জান্নাতের স্থলে দোযখ ক্রয় করে নিয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, কাফেরদের জন্যে কবরের অভ্যন্তরে জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্র করা হয়, যা দ্বারা সে জান্নাতের নেয়ামত দেখতে পায়, তাকে বলা হয়, তোমার কৃতকর্মের কারণে এসব নেয়ামত থেকে তুমি বঞ্চিত, এরপর দোযখের দিকে একটি ছিদ্র করা হয়, সেখানে সে অগ্নি শিখা দেখতে পায়, তখন ঐ কাফেরকে বলা হয়, এটিই তোমার চিরন্তন ঠিকানা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি বাসস্থান রয়েছে, একটি জান্নাতে আর একটি দোযখে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর দোযখে যায়, জান্নাতবাসীগণ তার বাসস্থানের উত্তরাধিকারী হয়। আর এজন্যে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

তারাই হবে উত্তরাধিকারী।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা হবে সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত'।

আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতার পরিণতি যে কত ভয়াবহ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে আখেরাতে, তাই যারা এমন অন্যায় কাজ করে, তারা সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে, এটিই স্বাভাবিক।

মূলতঃ শয়তান যাদেরকে কাবু করে ফেলে, তারা প্রথমতঃ আল্লাহ্ পাককে ভুলে যায়, তাঁর বিধান সম্পর্কে গাফলত করে, ওলামায়ে কেরাম ও নেককার লোকদের সংসর্গ থেকে দূরে সরে পড়ে, ভাল কাজে তাদের মন বসেনা, মন্দ কাজে থাকে তারা অগ্রগামী, পাপাচারে লিপ্ত হতে থাকে, অবশেষে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের অপমান এবং শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে পড়ে (আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমীন)।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا
یُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ یُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓىِٕكَ
كَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَاَیَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَیُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا
عَنْهُ ؕ اُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(২১) আল্লাহ পাক একথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রসূল জয়ী থাকবো, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমতাবান, তিনি মহা পরাক্রমশালী।

(২২) (হে রসূল!) যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আপনি তাদের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, এ বিরোধীরা তাদের পিতা-পুত্র, তাদের ভাই বা আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন, এরা সে সব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ঈমান লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং আল্লাহ পাকের গায়বী অনুগ্রহ তাদেরকে সাহায্য করেছে, অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ দান করবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত রয়েছে, তারা তাতে চিরদিন থাকবে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ পাকের বাহিনী, জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ পাকের বাহিনীই সফলকাম।

তফসীরুল কোরআন

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیْزٌ

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তারা চরম লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে

রেখেছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই জয়ী থাকবো এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধীরা তথা সত্যের দুশমনরা নিপাত যাবে, কেননা আল্লাহ পাক পরম ক্ষমতাবান, আল্লাহ পাক যা তকদীরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন হয়না কখনো হবেনা, পরিবর্তনের ক্ষমতাও কারোর নেই।

অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"নিশ্চয় আমি সাহায্য করবো আমার রসূলগণকে এবং মোমেনদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে। যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, যেদিন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে"।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

(হে রসূল!) যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আপনি তাদের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, এ বিরোধীরা তাদের পিতা-পুত্র তাদের ভাই বা আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন।

প্রকৃত মোমেন কখনও কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনা

মূলতঃ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত ঈমানদার হয়, তাদের পক্ষে আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা সম্ভবই নয়। অতএব, মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য হলো কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের, আপনত্বের সম্পর্ক না করা, যদিও তারা পিতা-পুত্র, ভাই, আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এ আয়াতের শিক্ষার যে বাস্তবায়ন ঘটেছিল, তা এ পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর পিতা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এসেছিল, হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, যদি আজ আবু ওবায়দা (রাঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমি তাঁকেই খলীফা নিযুক্ত করতাম।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। একদিন হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেছিলেন, বদরের যুদ্ধে কয়েকবার এমন হয়েছিল যে, আপনি আমার তরবারীর আওতায় চলে এসেছিলেন, কিন্তু যেহেতু আপনি আমার পিতা, তাই আপনার প্রতি আঘাত করিনি। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, বদরের যুদ্ধে আমি তোমাকে দেখতে পাইনি, যদি পেতাম তবে স্বহস্তে দ্বিখন্ডিত করতাম, কেননা তুমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলে।

এমনিভাবে হযরত মাসআব এবনে উমায়ের (রাঃ) বদরের যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতা ওবায়েদ এবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন আর হযরত ওমর (রাঃ), হযরত হামজা (রাঃ) এবং হযরত ওবায়দা এবনে হারেস (রাঃ) তাঁদের নিজ নিজ নিকটাত্মীয় ওতবা, শাইবা এবং ওলীদ এবনে ওতবাকে হত্যা করেছিলেন।

এ পর্যায়ে আরো একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া হোক, এভাবে আমাদের অর্থনৈতিক যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান হবে। তাদের থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা আমরা অস্ত্র ক্রয় করবো এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলে হয়তো আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত নসীব করবেন, তারা তো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন।

পক্ষান্তরে, হযরত ওমর (রাঃ) এর বিপরীত পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! প্রত্যেক মুসলমানকে তার মুশরেক বন্দী আত্মীয়কে দেয়া হোক এবং নির্দেশ দেয়া হোক, সে যেন তাকে হত্যা করে। আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে এ সত্য প্রকাশ করতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশরেকদের জন্যে কোন প্রকার প্রীতি ভালবাসা নেই। আমাকে আমার অমুক আত্মীয়কে দিয়ে দেয়া হোক, হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট আকীলকে দেয়া হোক এবং অমুককে অমুক কাফেরকে দিয়ে দেয়া হোক। এ ছিল মুসলিম জাতির সোনালী যুগের ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য।

وَاَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

এবং আল্লাহ পাক জীব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা মোমেনদেরকে সাহায্য করেছেন, যাদের অন্তর আল্লাহ পাকের দুশমনদের মহব্বত এবং মুশরেক আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন, তারাই প্রকৃত মোমেন তাদের ভাগ্য হয়েছে সুপ্রসন্ন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তাদের মনকে শক্তিশালী

করেছেন, তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, আর মোমেনগণ চিরদিন তাতে বসবাস করবে।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কেননা তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের আপন আত্মীয়-স্বজনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আল্লাহ পাক তাদেরকে এত অগণিত নেয়ামত দান করেছেন যে, তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তারাই আল্লাহ পাকের বাহিনী। আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাকের বাহিনীই সফলকাম হয়ে থাকে।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হলো এই, মোমেন কখনও কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনা, কাফের যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন, কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং কাফের আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি ভালবাসা এ দু'টি স্ববিরোধী অবস্থা কোন মোমেনের অন্তরে একত্রিত হতে পারেনা, যদি কারো অন্তরে আল্লাহর দুশমনদের ভালবাসা থাকে তবে সে প্রকৃত মোমেন হতে পারেনা; বরং এমন ব্যক্তি হয় মুনাফেক।

দ্বিতীয়তঃ যদি কারো মধ্যে এ দু'টি অবস্থা একত্রিত হয় তবে তা হয় কবীরা গুনাহ। সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নাফরমান বলে পরিগণিত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কেননা বদরের যুদ্ধে তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ (রাঃ) সম্পর্কে, কেননা তিনি মক্কাবাসীকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিঠি দ্বারা অবগত করেছিলেন।

أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

'তারাই সে সব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন'।

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ

আলোচ্য আয়াতে روح শব্দ দ্বারা নূর অথবা আল্লাহ পাকের সাহায্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ঈমান আর রবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ কোরআনে করীম এবং কোরআনে করীমে বর্ণিত দলিল সমূহ।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহর রহমত, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ জীব্রাঈল (আঃ)।

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

মোমেনদের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর সওয়াব লাভের কারণে অথবা আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার কারণে তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে।

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আর তারাই আল্লাহ পাকের বাহিনী, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত দ্বীনের তারাই সাহায্যকারী, দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানে তারাই সফলকাম হয়ে থাকে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৭৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩২৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-১৫-১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হাশর

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِىَ اَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (১)

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ

مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِىْ

قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ (২) وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ

الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (৩)

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) আসমান সমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২) তিনিই আহলে কিতাব কাফেরদেরকে তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারা যে নির্বাসিত হবে তা তোমরা কল্পনাও করোনি। তারা ভেবেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে, কিন্তু তাদের শাস্তি এমন দিক থেকে আসল যা ছিল তাদের জন্যে কল্পনাতীত, এবং তিনি তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে দেন, তারা নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেদেরই হাতে এবং মোমেনদের হাতে উজাড় করে দেয়, অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(৩) আর যদি আল্লাহ্ পাক তাদের ভাগ্যে নির্বাসন দন্ড লিপিবদ্ধ না রাখতেন, তবে পৃথিবীতেই তাদেরকে অবশ্যই আযাব দিতেন, আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে দোযখের কঠিন শাস্তি।

সূরায়ে হাশর প্রসঙ্গে

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সূরা হাশর মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়েছে। ৩ রুকু এবং ২৪ আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ৭৪৬টি বাক্য ও ১,৭১২টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার শেষ তিন আয়াতের ফজিলত

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ফজরের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তার জন্যে সারা দিন দোয়া করতে থাকে, এমনিভাবে যে মাগরিবের পর এ আয়াত সমূহ্ পাঠ করে, তার জন্যে সারা রাত ঐ ফেরেশতাগণ দোয়া করতে থাকে। যদি ঐ দিনে বা রাতে তার ইন্তেকাল হয় তবে তাকে শাহাদতের মর্তবা দেয়া হয়।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) "এতকানে" এই হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা হাশর তেলাওয়াত করছে, সে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হবে।

নামকরণ

সূরা হাশরের আরেকটি নাম হলো সূরা বনী নজীর। বোখারী শরীফে সংকলিত, এবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, এটি সূরা হাশর, তিনি বললেন, একে সূরা বনী নজীর বল, কেননা এ সূরায় মদীনা শরীফ থেকে বনী নজীর গোত্রের বহিঃস্কারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদের অপমানজনক শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর এ সূরায় ইহুদী ও মুনাফেকদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে, কেননা তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত

থাকত। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আনফাল বদরের যদ্ধের বিবরণে নাযিল হয়েছে, আর সূরা হাশর বনী নজীর গোত্রের শাস্তির বিবরণ নিয়ে নাযিল হয়েছে।

এবনে এসহাক বর্ণনা করেন, বনী নজীরকে মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে তখন বহিঃস্কার করা হয়, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের যুদ্ধ শেষে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করেন, আর বনী কোরায়জার ঘটনা ঘটে আহযাবের যুদ্ধের পর। দু'টি ঘটনার মধ্যে দু' বছরের ব্যবধান ছিল।

তফসীরুল কোরআন

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাকের অপরিসীম ক্ষমতা এবং মহাজ্ঞানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'আসমান সমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তাঁর মহিমা ঘোষণা করছে, আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ

'তিনিই আহলে কেতাব কাফেরদেরকে তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন'।

এ আয়াতে মদীনা শরীফ থেকে ইহুদী বনী নজীর গোত্রের বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে তফসীরে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থে।

বনী নজীরের ঘটনা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করেন তখন বনী নজীর গোত্রের সাথে তিনি একটি শান্তি চুক্তি করেন। এর মূল কথা ছিল এই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনী নজীর কোন বিদ্রোহ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র করবেনা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমনদের তারা কোন প্রকার সাহায্য করবেনা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী হয়েও কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করবেনা এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও লড়াই করবেনা। কিন্তু এ দূরাত্মা ইহুদীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দেখে তারা যদিও বলেছিল, ইনিই সেই নবী, যাঁর গুণাবলী তৌরাতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধের পর এ ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা শুরু করে। তাদের কৃত অঙ্গীকার তারা প্রকাশ্যে ভঙ্গ করে। মক্কার কাফেরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। ইহুদী

সর্দার কা'ব এবনে আশরাফ দলপতি হয়ে ৪০ জন অশ্বারোহী নিয়ে মক্কায় যায় এবং মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করার চুক্তি করে। মক্কার কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কা'বা শরীফের ভেতরে বসে তারা এ চুক্তি করে। এরপর কা'ব সাথীদেরকে নিয়ে মদীনা শরীফ ফিরে আসে। আল্লাহ্ পাক হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কার কাফের ও ইহুদী বনী নজীরের চুক্তির কথা জানিয়ে দেন। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'ব এবনে আশরাফের শাস্তি বিধানের তথা মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। হযরত মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ)-এর মাধ্যমে এ দন্ড কার্যকর হয়। কিন্তু এরপরও এ দূরাত্মা ইহুদীদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি; বরং তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একবার তিনি বনী নজীর গোত্রে তশরীফ নিয়ে যান। পাহাড়ের পাদদেশে উপবিষ্ট হন, তখন ইহুদীরা গম পিষবার যাঁতার একটি চাকা উপর থেকে তাঁর উপর নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ পাক হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন। ফলে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে তিনি তাঁর স্থান ত্যাগ করেন। এভাবে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বনী নজীর গোত্র হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই খবর পৌছায় যে, আমরা আপনার বাণী শ্রবণ করতে চাই এবং আপনার আহবানে সাড়া দিতে চাই, এজন্যে আপনি আপনার ত্রিশজন সাথী নিয়ে আসুন, আমরাও আমাদের ত্রিশজন আলেম নিয়ে আসি, কোন মধ্যস্থলে একত্রিত হই, আমাদের ইহুদী আলেমরা যদি আপনার কথায় আস্থা স্থাপন করে তবে আমরা সকলেই আপনার প্রতি ঈমান আনব। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং ত্রিশজন সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে ময়দানে আগমন করলেন। তখন বনী নজীরের কিছু লোক বললো, মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট তোমরা কিভাবে পৌছবে, তাঁর সঙ্গে ত্রিশজন ত্যাগী কর্মী রয়েছে। তারা অনুধাবন করলো যে এভাবে কিছু করা যাবেনা। তখন তারা পুনরায় খবর পাঠালো যে, আমরা যদি ত্রিশ ত্রিশ ষাটজন একত্রিত হই তবে আমরা আপনার কথা কিছুই বুঝবোনা, আপনি শুধু তিনজন সাথী নিয়ে আসুন, আমরাও তিন জন সাথী নিয়ে আসি, আমরা আপনার কথা শ্রবণ করবো, যদি আমাদের আলেমগণ আপনার প্রতি আস্থা স্থাপন করে, তবে আমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের এ প্রস্তাবও মেনে নিলেন এবং তিনজন সাহাবী নিয়ে বের হয়ে আসলেন। তিনজন ইহুদীও বের হয়ে আসল কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে বিষাক্ত খঞ্জর নিয়ে আসে। তাদের

পরিকল্পনা ছিল, কথার ফাকে হঠাৎ করে তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করবে এবং তাঁকে শহীদ করবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়ে থাকে। বনী নজীর গোত্রের এক মহিলার ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঐ মহিলা ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে তার ভাইকে তা জানিয়ে দেয়। তিনি ইহুদীদের সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলেন এবং তাঁকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথা বললেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

আবু দাউদ, বায়হাকী, আবদ এবনে হোমায়েদ, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

বনী নজীর এ বিশ্বাসঘাতকতা তখন করে যখন বদরের যুদ্ধের পর মক্কার কাফেররা বনী নজীর গোত্রের লোকদেরকে লিখেছিল, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রয়েছ, তোমরা সুরক্ষিত দুর্গে বাস কর, আমাদের শত্রুর সাথে তোমরা যুদ্ধ করতে পার। এ চিঠি পাওয়ার পর বনী নজীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, এ ঘটনার দ্বিতীয় দিন সকালে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বনী নজীরের এলাকায় রওয়ানা হন এবং তাদের দুর্গগুলোকে অবরোধ করে রাখেন।

এবনে হোমায়েদ একরামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ইহুদীদের প্রস্তর নিক্ষেপ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করা হলো, তখন তিনি মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলেন, সে সময় কানানা এবনে সুরীয়া নামক একজন ইহুদী আলেম ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা কি জান মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কেন উঠে চলে গেলেন? তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা এর কারণ জানিনা, হয়তো আপনিও জানেন না। সে বললো, তৌরাতের শপথ! আমি জানি তিনি কেন চলে গেছেন, তিনি তোমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁকে তোমাদের পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশেষ নবী, তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছিলে যে শেষ নবী যেন হারুন (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে হয় কিন্তু আল্লাহ পাক যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে নবুওয়্যত দান করেছেন, আমাদের কিতাবেই রয়েছে সর্বশেষ নবীর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন মদীনায়, তাঁর যে সব গুণাবলীর কথা আমাদের তৌরাতে রয়েছে তা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে রয়েছে, একটি অক্ষরেরও পার্থক্য নেই। আমি দেখছি তোমরা এখান থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছ, তোমাদের শিশু সন্তানগুলো বিনষ্ট

হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের বাসস্থানগুলো তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ। অতএব তোমরা আমার কথা মেনে নাও, দুটি প্রস্তাবের যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ কর। লোকেরা বললো, সে দু'টি কথা কি? কানানা বললো, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এভাবে তোমাদের জান-মাল সবই সংরক্ষিত থাকবে, সব তোমাদের নিকটই থাকবে, তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করা হবেনা। ইহুদীরা বললো আমরা তৌরাতকে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নসিহতকে ছাড়তে পারবো না। তখন কানানা বললো, তাহলে দ্বিতীয় পথ হলো, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আদেশ দেবেন, তোমরা আমার শহর ছেড়ে চলে যাও, তোমরা বলবে ঠিক আছে, এ অবস্থায়ও তিনি তোমাদের জান-মালে হাত দেবেন না। এ অবস্থায় তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের মাল-পত্র বিক্রিও করে দিতে পার বা সঙ্গেও নিয়ে যেতে পার। ইহুদীরা বললো, হ্যাঁ এ পন্থা ঠিক আছে। তখন সালাম এবনে মোশকাম নামে এক ব্যক্তি বললো, তোমরা ইতিপূর্বে যে আচরণ করেছো, তাও আমার নিকট অপছন্দনীয় ছিল, এখন তিনি খবর পাঠাবেন, তোমরা আমার শহর থেকে বেরিয়ে যাও।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা (রাঃ) ইহুদীদের নিকট গমন করে তাদেরকে তাঁর এ বাণী শুনিয়ে দেনঃ "তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি ছিল তা তোমরা ভঙ্গ করেছ, তোমরা বিদ্রোহ করেছ, তোমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করেছ, অতএব তোমরা আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হলো, এরপর যদি তোমাদের কাউকে দেখা যায়, তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে"।

এ ফরমান শ্রবণের পর ইহুদীরা দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলো, এ সময় মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই সোয়ায়দা এবং আ'মাশ নামক দু' ব্যক্তিকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করলো, আবদুল্লাহ তাদের মাধ্যমে ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেয় যে, তোমরা তোমাদের দুর্গ ছেড়ে যাবেনা, আমার নিকট দু' হাজার লোক রয়েছে, আমরা তোমাদের দুর্গ হেফাজতের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো, তোমাদের প্রতি আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্বে আমরা প্রাণ দেব, বনু কোরায়জা গোত্রও তোমাদের সাহায্য করবে, এছাড়া বণী গাতফান গোত্রও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

এরপর আবদুল্লাহ এবনে উবাই কা'ব এবনে আসাদ কারজীর নিকট দু' ব্যক্তিকে প্রেরণ করে তার নিকট আবেদন করলো যে, তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর।

কা'ব বললো, আমরা চুক্তিভঙ্গ করে কোন সাহায্য করতে পারবোনা।

ইহুদী নেতা হুয়াই এবনে আখতাব বললো, আমি (হযরত) মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট লোক মারফত এ সংবাদ দেব যে, আমরা কেউ ঘর ছেড়ে যাব না, আপনার যা ইচ্ছা করুন।

আবদুল্লাহ এবনে উবাইর পক্ষ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েই হুয়াই এ মন্তব্য করেছে, কিন্তু ঐ স্থানেই সালাম এবনে মোশকাম হুয়াইকে বলে, সতর্ক হও! আল্লাহর শপথ! তুমি জান এবং আমরাও জানি যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং তাঁর গুণাবলী আমাদের কিতাবে বর্ণিত আছে, এতদসত্ত্বেও আমরা তাঁর অনুসরণ করিনি, এর একমাত্র কারণ হলো আমাদের এই হিংসা যে, হারুন (আঃ)-এর বংশধর থেকে নবুওয়্যত চলে গেল, যাহোক, এখন আমাদের উচিত তাঁর হুকুম মেনে নেয়া এবং এ শহর ছেড়ে চলে যাওয়া।

কিন্তু হুয়াই এবনে আখতাব এ পরামর্শ গ্রহণ করলোনা; বরং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তার ভাইকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে, তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে যাবেনা, আপনার যা ইচ্ছা করুন।

হুয়াই এবনে আখতাব আবদুল্লাহ এবনে উবাইকেও জানিয়ে দিয়ে বললো, তুমি যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা পূর্ণ কর।

এদিকে হুয়াইয়ের ভাই যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ইহুদীদের বার্তা পৌঁছে দেয় তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও বললেন, আল্লাহু আকবর, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এখন আমি ইহুদীদের মোকাবেলা করবো। এরপর মুসলমানদের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ঘোষণা প্রচার করা হলো যে, সকলে বনী নজীরের এলাকার দিকে অগ্রসর হও।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মকতুমকে মদীনা মোনাওয়্যারার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি বনী নজীরের ময়দানে পৌঁছলেন এবং আছরের নামাজ আদায় করলেন।

বনী নজীরের প্রতি হামলা করার পরিকল্পনা নেয়া হলে তারা দুর্গের দেয়ালে উঠে প্রস্তর এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করলো। বনু কোরায়জা গোত্র বনু নজীরের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে এশার নামাজ আদায় করলেন এবং দশজন সাহাবীকে নিয়ে তিনি মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন।

মুসলমানগণ ফজর পর্যন্ত তাদের অবরোধ অব্যাহত রাখলেন, ঐ অবস্থায় হুয়াই এবনে আখতাব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ দেয় যে আমরা আপনার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত, আমরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব, হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আজ তোমাদের একথা মঞ্জুর করা হবেনা, তবে অস্ত্র ব্যতীত যথাসম্ভব মালপত্র নিয়ে বের হয়ে যেতে পার। তখন সালাম এবনে মোশকাম বললো, হে অপদার্থ! একথাটিই গ্রহণ কর, সে সময়ের পূর্বে যখন এর চেয়ে মন্দ কথা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

হুয়াই বললো, এর চেয়ে মন্দ কথা আর কী হবে?

তখন সালাম বললো, এরপর তোমাদের সন্তান-সন্ততীদেরকে গোলাম বাঁদীতে পরিণত করা হবে, ধন-দৌলতের পাশাপাশি প্রাণও যাবে। হুয়াই তখনও এক দু'দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐ প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। তখন ইয়ামীন এবনে উমায়ের এবং আবু সায়ীদ এবনে রাহাব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বললো, আমরা জানি তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, এমন অবস্থায় আমাদের কর্তব্য হলো মুসলমান হওয়া, তারা একথা বলে রাত্রিকালে দু'জন দুর্গ থেকে বের হয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং এভাবে তাদের জান মাল সুরক্ষিত হলো। মোহাম্মদ এবনে আমর, এবনে সা'দ, বালাজুরী, আবু মা'শার, এবনে হাব্বান লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী নজীর গোত্রের দুর্গ অবরোধ অব্যাহত রাখেন।

এবনে এছহাক বলেছেন, এ অবরোধ ছিল ছয় দিন। সোলায়মান তাইমী বলেছেন, বিশ দিন পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত ছিল।

আর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, এ অবরোধ পঁচিশ দিন অব্যাহত ছিল।

যে সব বাড়ী-ঘর ইহুদীদের নিকট ছিল, অবরোধ চলাকালীন সময় সেগুলো তারা নিজেরাই উজাড় করছিল, ইহুদীদের যেসব বাড়ী-ঘর মুসলমানদের নাগালে ছিল, সেগুলো মুসলমানগণ ধ্বংস করে দেয়। অবশেষে ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত হলো, অস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য মালপত্র নিয়ে দুর্গ থেকে বের হতে শুরু করলো। ইহুদীরা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করলো, তন্মধ্যে তিনশত চল্লিশটি তরবারি, পঞ্চাশটি লৌহ বর্ম এবং সমান সংখ্যক শিরস্ত্রাণ জমা দেয়া হলো। এভাবে ইহুদীদের চক্রান্ত এবং শত্রুতার শাস্তি হলো আর একথাটিকেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ

(তিনিই আহলে কেতাব কাফেরদেরকে তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাড়ী ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।)[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৬৭-৩৭৪
তফসীরে আল বাহরুল মুহীত খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৪১
তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্টা-২৭৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-১৯-২২

প্রথম সমাবেশ

বনী নজীর গোত্রের নির্বাসনের এ ঘটনাকে কোরআনে করীমে "আউয়ালুল হাশর" বা প্রথম সমাবেশ বলা হয়েছে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এটি ছিল প্রথম অভিযান, আর এ অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। দূরাত্মা ইহুদীরা পরাজয় মেনে নিয়েছিল। তারা তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিহাসে কোন জাতির নির্বাসনের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। আর এজন্যেই একে "আউয়ালুল হাশর" বলা হয়েছে।

ইহুদীদের দ্বিতীয় নির্বাসন হয়েছিল খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদেশ ক্রমে খায়বর থেকে সিরিয়ায়। এ সময় সেখান থেকে ইহুদীদের সঙ্গে নাসারাদেরকেও নির্বাসিত করা হয়। এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ আদেশ কার্যকর হয়েছিল। তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ

اخرجوا اليهود والنصرى من جزيرة العرب

(ইহুদী এবং নাসারাদেরকে আরব ভূমি থেকে বের করে দাও।)[১]

হাশরের ময়দান কোথায় হবে?

আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হাশরের ময়দান হবে সিরিয়াতে। আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সিরিয়ার মাটিতেই সকলকে একত্রিত করবেন, যে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে তার এ আয়াত পাঠ করা উচিত।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, একটি অগ্নি প্রাচ্যের কোন এক গর্ত থেকে বের হয়ে সমগ্র মানব জাতিকে প্রতীচ্যের দিকে নিয়ে যাবে, যেখানে রাত্র হবে মানুষ সে স্থানে অবস্থান করবে, অগ্নিও থেমে থাকবে, সকালে পুনরায় ঐ অগ্নি মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে সিরিয়ার ময়দানের দিকে।

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে এ মর্মে যে, কেয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত হবে এই, একটি অগ্নি মানুষকে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।[২]

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতির সর্বশেষ নির্বাসন হবে কেয়ামতের দিনে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৪-৭৫

مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ

'তারা যে নির্বাসিত হবে তা তোমরা কল্পনাও করোনি, তারা ভেবেছিল যে তাদের দূর্ভেদ্য দুর্গগুলো আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে, কিন্তু তাদের শাস্তি এমন দিক থেকে আসল যা ছিল তাদের জন্য কল্পনাতীত এবং তিনি তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে দেন, তারা নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেরই হাতে এবং মোমেনদের হাতে উজাড় করে দেয়'।

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! বনী নজীর এভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হবে এবং তাদের ঘর-বাড়ী তোমাদের দখলে আসবে একথা তোমরা কল্পনাও করোনি। এমনিভাবে বনী নজীর গোত্রের ইহুদীরা ভেবেছিল তাদের দূর্ভেদ্য দুর্গ এবং প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র তাদের আত্মরক্ষার জন্যে যথেষ্ট হবে, কোন শক্তিই তাদের এমন অবস্থায় পরাজিত করতে পারবে না।

فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

'কিন্তু যখন আল্লাহ পাকের হুকুম আসলো এবং তাদের প্রতি আযাব আপতিত হল, মুসলমানগণ অতর্কিত আক্রমণ করলো, তখন তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। আল্লাহ পাক ইহুদীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন, ফলে তারা নিরস্ত্র মুসলমানদের আক্রমণ করতে সাহস করলোনা, আল্লাহ পাকের রহমতে ইসলামের দুশমনদের সর্বনাশ ঘটলো। ইতিপূর্বে তাদের সর্দার কা'ব এবনে আশরাফ যে ৪০ জন অশ্বারোহী নিয়ে মক্কায় গিয়েছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের চুক্তি করে, তাকে যখন সমুচিত শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়, তখন তারা আতংকিত হয়েছিল। কিন্তু এবার যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করা হয়, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলে। আর একথা চিরসত্য মনোবল না থাকলে শুধু অস্ত্রবল বা বাহুবল কোন ভাবেই উপকারী হয়না, এ যুগেও তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের উপর এক কালের পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আক্রমণ করে তখন তাদেরকেও এরকম পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পলায়ন করতে হয়। মুসলমানদের নিকট ঈমানী বল ছিল। আর সেভিয়েত ইউনিয়নের নিকট সামরিক বল ছিল। কিন্তু ঈমানী বলের মোকাবেলায় সামরিক বল কাজে আসেনি। আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে কথাটিকে

এভাবে ঘোষণা করেছেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

'আর তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়োন্না, চিন্তিতও হয়োনা, তোমরাই হবে জয়ী, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও, যদি তোমরা ঈমানের বলে বলীয়ান হও'।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ ক্ষোভে উত্তেজনায় ইহুদীরা তদের পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘর উজাড় করছিল, যাতে করে এসব বাড়ী-ঘর মুসলমানদের হাতে না আসে, অর্থাৎ তারা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করছিল। নিজেরাই নিজেদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করছিল, আর মুসলমানদের হাতেতো নষ্ট হচ্ছিলই। কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, অস্ত্র ব্যতীত তোমরা যা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পার, তাই বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে তারা যা কিছু সম্ভব উটের পিঠে তুলে নিয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমানগণ যখন ইহুদীদের বাড়ী-ঘর দখল করতেন তখন তা ভেঙ্গে দিতেন যাতে করে যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। আর ইহুদীরা একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করতো এবং মুসলমানদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করতো, যাতে মুসলমানগণ আহত হয়।

فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ

'অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর'।

অর্থাৎ দূরাত্মা ইহুদীদের এ পরিণতি দেখে হে ঈমানদারগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর, তাদের ন্যায় নাফরমানী করোনা, বিশ্বাসঘাতক হয়োনা এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়োনা।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

'আর যদি আল্লাহ পাক তাদের ভাগ্যে নির্বাসন দন্ড লিপিবদ্ধ না রাখতেন তবে পৃথিবীতেই তাদেরকে অবশ্যই আযাব দেয়া হতো, আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে দোযখের শাস্তি'।

মূলতঃ আল্লাহ পাক তাদের ভাগ্যে নির্রাসন দন্ড পূর্বেই লিখে রেখেছিলেন আর এজন্যেই তারা তখন প্রাণে বেঁচে গেল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, চুক্তি ভঙ্গ করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, শত্রুতা এসব কিছুই তাদের প্রাণ দন্ডের কারণ হতো। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের জন্যে নির্বাসনের শাস্তি লিখে রেখেছিলেন, তাই তারা কঠোর আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। নির্বাসিত হয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছে,

অন্যথায় দুনিয়াতেই তাদের প্রতি কঠোর আযাব আপতিত হত। আর দুনিয়াতে এ লঘু শাস্তি হলেও আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য দোযখের কঠিন শাস্তি। দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা তাদের নেই, অতএব আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত।[1]

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ (৪) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى
اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ (৫) وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ
اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (৬)
مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا
يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَ
مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (৭)

তরজমা

(৪) তাদের এ শাস্তি এজন্যে যে, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে, আর (একথা চির সত্য) যে কেউ আল্লাহ পাকের বিরোধিতা করবে, সে যেন জেনে রাখে যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

(৫) তোমরা যেসব খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলেছ অথবা তাকে তার শেকড়ের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ পাকের হুকুমেই করেছ, তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ লোকদেরকে অপমানিত করবেন।

(৬) আর তাদের যে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা তো তাতে অশ্ব বা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। অবশ্য আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্টা-২৬২

(৭) আল্লাহ পাক এ জনপদবাসীদের নিকট থেকে যা কিছু তাঁর রসূলকে দান করেছেন, তা আল্লাহ পাকের, রসূলের এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীমদের এবং অভাবগ্রস্ত ও পথিক মুসাফিরের, যাতে করে শুধু তোমাদের বিত্তবান লোকদের মধ্যেই ঐশ্বর্য সীমাবদ্ধ না থাকে। রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী নজীর গোত্রের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে এর কারণ বর্ণনা করে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاۤقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

তাদের এ শাস্তি এজন্যে যে, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাঁকে শহীদ করার চক্রান্ত করেছে। আর যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তার শাস্তি হয় অত্যন্ত কঠিন, অতএব আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۤئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ

‘তোমরা যে সব খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলেছ অথবা তাকে তার শেকড়ের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা-তো আল্লাহ পাকের হুকুমেই করেছ, তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ লোকদেরকে অপমানিত করবেন’।

শানে নুযুল

বনী নজীর গোত্রকে যখন ঘেরাও করা হয় তখন তারা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে প্রস্তুত হয়নি। তাই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের বাগ-বাগিচার খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার আদেশ দান করেন, যাতে তারা এসবের মায়ায় দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে।

এবনে এসহাক এজিদ এবনে নোমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বনী নজীর গোত্র যখন তাদের দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের কিছু গাছপালা কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু লায়লা মাজেনী এবং আবদুল্লাহ এবনে সালামকে খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবু লায়লা "আজওয়া" নামক খেজুর বৃক্ষ কাটতে আরম্ভ করলেন। আর আবদুল্লাহ এবনে সালাম "লওন" নামক খেজুর বৃক্ষ কাটতে শুরু করেন। আজওয়া সর্বোত্তম প্রকারের খেজুর, আর লওন হলো সাধারণ প্রকার। আবু লায়লাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি এগুলোকে কেন কাট? তিনি বললেন, ইহুদীরা যেন কোন দিনও আর এগুলো না পায়। আর আবদুল্লাহ এবনে সালামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ পাক কাফেরদের এসব কিছু মুসলমানদেরকে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসেবে দান করবেন, আর আজওয়া অত্যন্ত মূল্যবান বৃক্ষ, অদূর ভবিষ্যতে এসব কিছু মুসলমানদের করতলগত হবে, এজন্যে আমি এগুলো কাটিনা।

বর্ণিত আছে, আজওয়া বৃক্ষ কাটা হলে ইহুদী মহিলারা চিৎকার করে আক্ষেপ করতে থাকে। সালাম এবনে মুশকাম হুয়াইকে বলে, আজওয়া বৃক্ষ কাটা হচ্ছে, আজওয়া খেজুরের একটি ছড়া আগামী ত্রিশ বছরে একটি অশ্বের বিনিময়েও পাওয়া যাবেনা। তখন হুয়াই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রস্তাব প্রেরণ করলো, আপনি তো সর্বদা অশান্তি অপছন্দ করতেন, এখন আমাদের বাগ-বাগিচা বিনষ্ট করার আদেশ কেন দিয়েছেন, এটি কি অশান্তি নয়?

কোন কোন মুসলমানও বললেন, এগুলোতো কর্তন করা ঠিক হবেনা, এক সময় এগুলো আমরাই পাব। আর কোন কোন মুসলমান বললেন, আমরা অবশ্যই এগুলো কাটব, আর এমনিভাবে ইহুদীদের মনের ব্যথা বৃদ্ধি করবো।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ

অর্থাৎ তোমরা যে খেজুর বৃক্ষ কর্তন করেছ, অথবা না কেটে রেখে দিয়েছ সবই আল্লাহ পাকের হুকুমে করেছ। অর্থাৎ উভয় আচরণেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে।

وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থাৎ এভাবে দূরাত্মা পাপীষ্ঠদেরকে অপমানিত করার জন্যেই এ আদেশ হয়েছে। তাদের চোখের সামনেই তাদের বাগ-বাগিচা বিনষ্ট হচ্ছে অথচ তারা কিছুই করতে পারছেনা। এভাবে তাদের অপমান, ক্ষোভ এবং গাত্রদাহ বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য আয়াতের لينة শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, সর্ব প্রকার খেজুর বৃক্ষকেই لينة বলা হয়, তবে তাতে আজওয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। একথা বলেছেন, একরামা এবং কাতাদা (রঃ)। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মত পোষণ করতেন।

ইমাম জুহরী (রঃ) বলেছেনঃ আজওয়া এবং বর্ণিয়া নামক খেজুর ব্যতীত অন্যান্য সকল খেজুর বৃক্ষকে "আলওয়ান" বলা হয়।

মুজাহেদ (রঃ) এবং আতীয়া (রঃ) বলেছেন, সকল খেজুর বৃক্ষকেই “লিনাহ” বলা হয়।

সুফিয়ান (রঃ) বলেছেনঃ সর্ব প্রকার উত্তম খেজুরের বৃক্ষকেই “লিনাহ” বলা হয়।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এক প্রকার বিশেষ খেজুরের বৃক্ষকে “লওন” বলা হয়। এ খেজুরগুলোর বর্ণ হলুদ হয় আর তা এত পরিচ্ছন্ন হয় যে, বাইরে থেকে ভেতরের দানা পর্যন্ত দেখা যায়, আরবরা এ ধরনের খেজুরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন।

এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়, ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, যথা তাদের বাগ-বাগিচা বিনষ্ট করা হয়েছে বা তাদের ঘর-বাড়ী উজাড় করা হয়েছে, সব আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়েছে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমনদেরকে অপমানিত করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে, আর এ শাস্তি তাদের প্রাপ্য।

এ প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান শাসনকর্তা যদি কাফেরদের কোন দুর্গ অবরোধ করে তবে তাদের বৃক্ষ কর্তন করা এবং তাদের ফসল বিনষ্ট করা এবং তাদের বাড়ী-ঘরে অগ্নি সংযোগ করা বৈধ। আর ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন, এ কাজটি দু'টি শর্তে বৈধ (১) যদি কাফেররাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন কার্যক্রম গ্রহণ করে। (২) যদি কাফেরদের ক্ষেত্রে এমন কার্যক্রম গ্রহণ না করলে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, কাফেরদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করা সামরিক প্রয়োজনে এবং বিজয় লাভের জন্যে বৈধ, আর যদি এ কার্যক্রম ব্যতীতই বিজয় লাভের আশা করা যায়, তবে তা না করা ভাল।

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

‘আর তাদের যে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা তো তাতে অশ্ব বা উষ্ট্রে আরোহন করে যুদ্ধ করোনি, অবশ্য আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করে থাকেন, আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান’।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বনী নজীর যখন ঘর-বাড়ী ছেড়ে মদীনা মোনাওয়্যারার উপকণ্ঠ থেকে চলে যায়, তখন যেভাবে খায়বরের মালে গণিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে বনী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পদও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার কথা কোন কোন সাহাবী চিন্তা করছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তাই এরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

মুসলমানগণ যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে, তাকে শরীয়তের ভাষায় গণিমত বলা হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ। এ গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাকের নামে থাকবে, অবশিষ্ট চার অংশ মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে যথা নিয়মে বিতরণ করা হবে। এ গণিমতের বন্টন সম্পর্কে সূরা তওবায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু যা কিছু বিনা যুদ্ধে অর্জিত হয় বা সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে "ফা'ই" বলা হয়। ফা'ই হিসেবে যে সম্পদ অর্জিত হয় তা বায়তুল মালে তথা সরকারী কোষাগারের জন্যে হয় এবং মুসলমানদের সার্বজনীন কাজে এ সম্পদ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক এ সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্তমানে এ সম্পদ ব্যয়ের অধিকার শুধু তাঁরই। তাঁর অবর্তমানে তাঁর খলিফা বা রাষ্ট্রনায়কেরই ঐ সম্পদ ব্যয়ের অধিকার থাকবে। তিনি যেখানে পছন্দ করেন সেখানে ঐ সম্পদ ব্যবহার করবেন, তবে ঐ সম্পদের মালিক হিসেবে নয়, শাসনকর্তা হিসেবে ঐ সম্পদ ব্যবহারের অধিকারী হন। আর আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে,

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ

আল্লাহ পাক যা তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা তার জন্যে অশ্ব বা উষ্ট্রে আরোহন করে যুদ্ধ করোনি। তোমরা এ সম্পদ অর্জনে যদি যুদ্ধ করতে, তবে তা তোমাদের জন্যে গণিমত হত।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে বনী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পদ একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছিল, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যয় করতেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পদ ব্যবহার করার বিশেষ অধিকার দান করেছেন, যা আর কাউকে দেননি। এর দ্বারা তিনি নিজের এবং তাঁর পরিবারবর্গের ব্যয় ভার বহন করতেন। এরপর যদি কিছু বেঁচে থাকত, তা আল্লাহ্ পাকের সম্পদ হিসেবে রাখতেন এবং জেহাদের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আছে, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। একটু পর হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) আসলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমার এবং হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে মীমাংসা করে দিন, বনী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আপনারা একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন। এরপর বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহ্ পাকের শপথ দিয়ে বলছি, আপনাদের কি জানা আছে যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আমার অর্থ-সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাইনা, যদিও তিনি একথাটি আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্পর্কে বলেছিলেন, তবে এর দ্বারা তিনি তাঁর পবিত্র সত্তাকে উদ্দেশ্য করেছেন। তখন উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ হ্যাঁ, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি একথাটি বলেছিলেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ বলেছিলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এ ফা'ইকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা আর কাউকে দেয়া হয়নি, তাই বনী নজীরের সব পরিত্যক্ত সম্পদই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আজীবন এ নীতিমালার উপরই আমল করেছেন। যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। একথা বলে তিনি ঐ সম্পদ নিজের কজায় নিয়ে নেন এবং যেভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতরণ করতেন সেভাবেই হযরত আবু বকর (রাঃ) বিতরণ করলেন। এরপর হযরত

আবুবকর (রাঃ) এর ইন্তেকাল হলো, দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হলো, যেভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) এ সম্পদ বিতরণ করেছেন আমিও তা করবো।

আমি এ সম্পদ আপনাদের উভয়ের নিকট এ শর্তে অর্পণ করতে পারি যে, আপনারা তা এভাবে ব্যয় করবেন, যেভাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ব্যয় করতেন, যদি আপনারা তা ব্যয় করতে না পারেন, তবে এ সম্পর্কে কোন কথা না বলাই উচিত। আপনারা উভয়ে এ শর্ত মেনে নিয়েছেন, তাই আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট অর্পণ করলাম। এখন আপনারা কি এ সিদ্ধান্তের বরখেলাফ অন্য কিছু করতে ইচ্ছুক? শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম রয়েছে, আমি ঐ সিদ্ধান্তের বরখেলাফ কিছু করবোনা, যদি আপনারা এ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন তবে তা আমার নিকট সোপর্দ করবেন, আমি আপনাদের কাজ সম্পূর্ণ করবো। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। বনী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পদ আল্লাহ পাক বিশেষভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করেছিলেন, এজন্যে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে হয়নি, অশ্বে বা উষ্ট্রে আরোহন করতে হয়নি, এজন্যে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মালিকানায় ছিলো, তিনি এর দ্বারা তাঁর সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন, আর যা কিছু সঞ্চিত থাকতো তা দ্বারা জেহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ অস্ত্র এবং অশ্ব ক্রয় করতেন।

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

'আল্লাহ পাক এ জনপদবাসীদের নিকট থেকে যা কিছু তাঁর রসূলকে দান করেছেন তা আল্লাহ পাকের, রসূলের এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীমদের এবং অভাবগ্রস্ত ও পথিক মুসাফিরের, যাতে করে সম্পদ শুধু তোমাদের বিত্তবান লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু বনী নজীর গোত্রের পরিত্যক্ত সম্পদ "ফা'ই" হিসেবে যা এসেছিল সে সম্পর্কেই নির্দেশ ছিল, আর আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে যে কোন স্থান থেকে "ফা'ই" হিসেবে কোন সম্পদ আসলে তার বিধান বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে যে, এমন সম্পত্তিতে যা কোন জনপদের কাফেরদের থেকে অর্জিত হয়, তাতে

হক্ব রয়েছে আল্লাহ পাকের, তাঁর রসূলের এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীম ও দারিদ্র্য প্রপীড়িত মানুষের এবং পথিক মুসাফিরের।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের উল্লেখ শুধু বরকতের জন্যেই রয়েছে, আল্লাহ্ পাক আসমান যমীনের মালিক, তাঁর তো কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, তিনি সব কিছুর অধিকর্তা, তিনি মহান দাতা।

এ ব্যাখ্যা করেছেন হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ), ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), আমের (রঃ), শা'বী (রঃ) এবং অন্যান্য তফসীরকারগণ।

আর কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের নামের যে অংশ হবে তা কা'বা শরীফ এবং অন্যান্য মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যয় হবে। আল্লাহ্ পাকের নামের অংশ হওয়ার এটিই অর্থ।

وَلِذِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, যেমন বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিব।

পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, ফা'ই হিসেবে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তার মালিকানা একমাত্র হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই হয়, আর এ আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, ফা'ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, পথিক, মিসকীন সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

মূলতঃ এর দ্বারা একথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য, যে সম্পদ ফা'ই হিসেবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসবে, তা তিনি কোথায় কিভাবে ব্যয় করবেন, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে এ আয়াতে।

আর একথাও চিরসত্য যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক জনকল্যাণের দৃষ্টিতে যেখানে যা ব্যয়ের প্রয়োজন, তা তিনি করতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতের اهل القرى (জনপদবাসী) শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বনী কোরায়জা, বনী নজীর, ফোদকবাসী, খায়বার এবং ওরায়নার অধিবাসীরা এর দ্বারা উদ্দেশ্য।

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ

"যাতে করে শুধু তোমাদের বিত্তবান লোকদের মধ্যেই ঐশ্বর্য সীমাবদ্ধ না থাকে"।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ফাই বিতরণ করা হবে

ফাই হিসেবে যে সম্পদ অর্জিত হয় তার বিতরণ ব্যবস্থা করা হয়েছে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে। প্রথমতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফাই থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে দান করতেন, এ দান লাভের জন্যে দরিদ্র হওয়া জরুরী নয়; বরং আত্মীয় হওয়া জরুরী। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাঁরা এর অংশ লাভ করতেন, যেমন হযরত আব্বাস (রাঃ) তদানীন্তন কালে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি ফাইয়ের অংশ লাভ করতেন। এরপর এতীম, মিসকীন, অনাথ, বিপদগ্রস্ত এবং এমন পথিক মুসাফির যার নিকট তার পথ খরচ নেই, এমন লোকদেরকেও ফাই থেকে দান করার বিধান দেয়া হয়েছে। এ বিতরণ ব্যবস্থার কারণ স্বরূপ কোরআনে করীম যে নীতি ঘোষণা করেছে, তা সর্বকালের মানুষের নিকট প্রশংসনীয় ও অভিনন্দিত হয়েছে।

كَيْ لَا يَكُوْنَ

অর্থাৎ সম্পদের আদান-প্রদান যেন শুধু ধনীক শ্রেণীর মধ্যে সীমিত না থাকে; বরং ধনী-দরিদ্র সকলেই যেন এর অংশ পায়। ধন-সম্পদ যেন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট কুক্ষিগত হয়ে না থাকে, বরং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের হাতেই যেন ধন-সম্পদ যায়, এটিই হলো কোরআনের বিধানের লক্ষ্য। মানবতার কল্যাণে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এ বিধানের উপকারিতা কত বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

وَمَا آتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'রসূল তোমাদেরকে যা দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক'।

অর্থাৎ ফাইয়ের হিসাব থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ কর, তার অধিক পাওয়ার জন্যে লোভ করোনা, আর যে ব্যাপারে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

যদিও এ আয়াত ফাইয়ের সম্পদ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতাংশ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার উপর গুরুত্বারোপ করে। আর এজন্যে তফসীরকারগণ বলেছেন, ধন-সম্পদ হোক বা বিধি-নিষেধ হোক, যা কিছুই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে আসে তা সাদরে গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন ব্যাপারে বিরোধিতা, আল্লাহ পাকেরই বিরোধিতা করার নামান্তর।

মানব জীবনের সাফল্য হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ পাক তাঁকেই সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ করে প্রেরণ করেছেন, পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

(তোমরা এক আল্লাহকে ভয় কর।)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বিরোধিতা করা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর'।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ؕ۫ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

তরজমা

(৮) যে সমস্ত অভাবগ্রস্ত মোহাজেরগণ তাদের বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের জন্যেই এ সম্পদ। যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং তাঁর দান ও অনুগ্রহ কামনা করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে, তাদের জন্যে এ সম্পদ, তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্য।

(৯) আর যারা মোহাজেরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, মোহাজেরগণকে যারা ভালবাসে এবং মোহাজেরগণকে যা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্যে তাদের মনে কোন ক্ষোভ নেই, তারা নিজেদের জঠর-জ্বালা

সত্ত্বেও মোহাজেরগণকে নিজেদের প্রাণের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়, আর যে কেউ নিজের মনের লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তারাই তো সফলকাম হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বনী নজীরের নির্বাসনের কথা ছিল এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে এ ঘোষণা ছিল যে, এ সম্পদ আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করবেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, বিপদগ্রস্ত, পথিক-মুসাফিরকে এ সম্পদ থেকে দেয়া হবে। এভাবে জনকল্যাণ সাধনের বিধান পেশ করা হয়েছে।

আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "ফাই" হিসেবে অর্জিত এ সম্পদের হক্বদার হবে সে মোহাজেরগণ, যাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করা হয়েছে, কাফেররা তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, তারা নির্যাতীত-উৎপীড়িত হয়েছে, তারা অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তারা জান-মাল দিয়ে সাহায্য করেছে আল্লাহর দ্বীনকে এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

'তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্য'।

কেননা ঈমানের কারণে তাঁরা বাড়ী-ঘর হারিয়েছেন, নিঃস্ব-হৃতসর্বস্ব হয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে হিজরত করেছেন, বনী নজীরের নির্বাসনের কারণে যে সম্পদ পাওয়া গেছে তাতে হক্ব রয়েছে এ মোহাজেরগণের।

মোহাজেরগণের ফজিলত

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, মোহাজেরগণ সে পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতে বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি, দেশ ত্যাগ করেছেন এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে যে অকথ্য নির্যাতন উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তা বর্ণনাতীত, কিন্তু

তাঁরা সব কিছু ছেড়েছেন ইসলামকে বুকে নিয়ে, কোরআনকে বুকে নিয়ে, আল্লাহ পাক ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতে এবং মাতৃভূমি ছেড়ে চলে এসেছেন। কোন কোন সাহাবী ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন, যাতে করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। কোন কোন মোহাজেরের অবস্থা এই ছিল, চরম শীত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের নিকট প্রয়োজনীয় বস্ত্র ছিল না, সেজন্যে তাঁরা মাটিতে গর্ত করে তাতে আশ্রয় নিতেন। আর সর্বদা তাঁরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাত বরণে উদগ্রীব থাকতেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন দারিদ্র-পীড়িত মোহাজেরগণ চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবেন।

আবু দাউদ শরীফে সংকলিত, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে অভাবগ্রস্ত মোহাজেরের দল! কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ নূর অর্জনের সুসংবাদ রয়েছে। তোমরা সম্পদশালী লোকদের অর্ধেক দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এ অর্ধেক দিন (দুনিয়ার হিসাবে) পাঁচশত বছরের সমান হবে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, সম্পদশালী মোহাজের থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে দরিদ্র মোহাজেরগণ জান্নাতে যাবেন। আর অন্য সম্পদশালী লোকদের থেকে মোহাজেরগণ পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবেন।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُ والدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"আর যারা মোহাজের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, যারা মোহাজেরগণকে ভালবাসে এবং মোহাজেরগণকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্যে তাদের মনে কোন ক্ষোভ নেই, তাঁরা নিজেদের জঠর-জ্বালা সত্ত্বেও নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি তাদের প্রতি গুরুত্ব দেয়"।

শানে নুযুল

এবনুল মুনজের হযরত ইয়াজিদ এবনে আসমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনসারগণ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আবেদন পেশ করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)!

আমাদের এবং মোহাজেরদের মধ্যে আমাদের যমীনকে ভাগ করে দিন (অর্থাৎ আনসারগণ তাদের যমীনের অর্ধেক মোহাজেরগণকে দিয়ে দেয়ার আরজী পেশ করলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যমীনের মালিকানা তোমাদেরই থাকবে (মালিকানায় কোন অংশীদারিত্ব থাকবেনা) অবশ্য তোমাদের যমীনে তাদেরকে মেহনতের সুযোগ দিও এবং উৎপন্ন ফসলকে ভাগ করে নিও। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আনসারগণের ফজিলত

পূর্ববর্তী আয়াতে মোহাজেরগণের ফজিলতের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতে আনসারগণের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর যারা মোহাজেরদের আগমনের পূর্বে মদীনায়ে তৈয়্যেবায় বসবাস করতো, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল, যারা মদীনায়ে তৈয়্যেবায় হিজরত করে আসতেন তাদের জন্যে এ আনসারদের অন্তরে ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা, আনসারগণ মোহাজেরগণকে জানিয়েছেন প্রীতির সম্ভাষণ।

দ্বিতীয়তঃ মোহাজেরদেরকে যা কিছু দেয়া হয় তার জন্যে আনসারদের মনে কখনও ক্ষোভ বা হিংসা দেখা যায়নি।

অর্থাৎ বণী নজীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু মোহাজেরদের মধ্যে বন্টন করেছেন, এতে আনসারগণ খুশি হয়েছেন, তাদের মনে কোন ক্ষোভ ছিলনা।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী লিখেছেন, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী আমরের জনপদ থেকে মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করলেন, তাঁর সাথে সাথে মোহাজেরগণও আসলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজের ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং প্রত্যেক আনসার এক একজন মোহাজেরকে ভাই হিসেবে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ঘরের অর্ধেক তাদেরকে দিয়ে দিলেন। দোকান থাকলে অর্ধেক দোকান মোহাজের ভাইকে দিলেন। এমনকি, যার দু' স্ত্রী ছিল তিনি মোহাজের ভাইকে বললেন, আপনার যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তালাক দিয়ে দিই, আপনি যথা নিয়মে তাকে বিবাহ করে সংসার ধর্ম শুরু করুন। এ ছিল আনসারদের ত্যাগ-তিতিক্ষার একটি নমুনা। এমন সম্প্রীতি এমন আত্মত্যাগের আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দেখা যায়না। যখন বনী নজীর গোত্রের সম্পদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে আসলো তখন তিনি সাবেত এবনে কায়েস এবনে সাম্মাছকে তলব করলেন এবং আদেশ দিলেন, আনসারগণকে হাযির কর। আওস খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত কর। সকলে যখন সমবেত হলো তখন হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি ভাষণ দান করলেন, তিনি প্রথমে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করেন, এরপর মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম তথা আনসারগণ মোহাজেরগণের জন্যে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন এবং নিজেদের বাড়ী-ঘরে তাঁদেরকে স্থান দিয়েছেন, অর্থ-সম্পদ দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ করেছেন, এরপর তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক বনী নজীরের যে সম্পদ আমাকে দান করেছেন, সে সম্পর্কে যদি তোমরা পছন্দ কর, তবে তা তোমাদের এবং মোহাজেরদের মধ্যে আমি ভাগ করে দিতে পারি। এ পন্থায় মোহাজেরগণ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, অর্থাৎ তোমাদের বাড়ী-ঘরে অবস্থান এবং তোমাদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে তারা আছে, সে অবস্থাতেই থাকবে। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা পছন্দ কর, তবে বণী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পদ আমি শুধু তাদেরকেই দিয়ে দেব, এ অবস্থায় তারা তোমাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যাবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ভাষণ শ্রবণ করে হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) এবং সা'দ এবনে মা'আজ (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করে আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি এ সম্পদ মোহাজেরগণের মধ্যেই বিতরণ করে দিন, আর যেভাবে এখন তাঁরা আমাদের বাড়ী-ঘরে আছেন, ভবিষ্যতেও তাঁরা এভাবে থাকবেন। (উভয় নেতার সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে) আনসার সাহাবায়ে কেরাম চিৎকার করে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা এ সিদ্ধান্তে রাজী, আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি রহমত নাযিল কর, এরপর বনী নজীরের যে সম্পদ আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন, তা তিনি শুধু মোহাজেরগণের মধ্যে বিতরণ করলেন। আনসারদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন অসহায় ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে কিছু দান করলেন না। এ দু'জন হলেন (১) সাহাল এবনে হানিফ (২) আবু দোজানা।

অবশ্য সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ)-কে এবনে আবি হাকীকের তরবারীটি দান করেন। তখন এ তরবারীটির খ্যাতি ছিল অত্যন্ত বেশী।

আত্মত্যাগের অপূর্ব নিদর্শন

বালাজুরী "ফতুহুল বুলদানে" লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আনসারগণকে বললেন, তোমাদের মোহাজের ভাইদের নিকট অর্থ-সম্পদ বলতে কিছুই নেই, যদি তোমরা পছন্দ কর তবে বনী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পদ আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেব, আর তোমাদের যে অর্থ-সম্পদ এখন তাদের নিকট রয়েছে, তা-ও তোমাদের এবং তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেব।

আর যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে, তোমাদের সম্পদ তোমাদের নিকটই থাকুক, (মোহাজেরগণকে তা থেকে কিছু দেবেনা) আর বনু নজীর থেকে ফাই হিসেবে যা এসেছে, তা মোহাজেরদের মধ্যে বিতরণ করে দেই (তোমাদেরকে কিছুই না দেই), তখন আনসারগণ জবাব দিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! বনী নজীরের সমস্ত সম্পদ মোহাজেরগণকে দিয়ে দিন, আর আমাদের সম্পদ থেকেও আপনার যা ইচ্ছা তাদেরকে দিয়ে দিন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ তারা নিজেদের শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মোহাজেরগণকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নিজেদের বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দেয়। এমনকি, যে আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিলেন, তার একজনকে তালাক দিয়ে মোহাজের ভাইকে তার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি ক্ষুধার্ত, জঠর-জ্বালায় চরম কষ্ট পাচ্ছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ঘরে লোক পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, খাদ্য দ্রব্য যা পাও নিয়ে আস, কিন্তু কোন স্ত্রীর ঘরে কিছুই পাওয়া গেলনা, তখন তিনি এরশাদ করলেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজকের রাতে এ ব্যক্তির মেহমানদারী করবে, আল্লাহ পাকের রহমত তার প্রতি বর্ষিত হোক। তখন সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসারী ব্যক্তি দন্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি তাঁর মেহমানদারী করতে চাই, তাই মেহমানকে নিয়ে ঐ ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পৌঁছেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেন, ইনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মেহমান, তাঁকে না দিয়ে কোন জিনিস রাখবেনা, স্ত্রী বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এ শিশুদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। আনসারী সাহাবী বললেন, কোনভাবে শিশুদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে। আমরা উভয়ে আজ রাত ক্ষুধার্ত থাকবো, আর শিশুদের খাবার মেহমানকে খাওয়াবো। স্ত্রী তাই করলেন। বাতি ঠিক করার অজুহাতে তা নিভিয়ে দিলেন, আর একথা প্রকাশ করতে থাকেন, আমরা খাচ্ছি, আপনিও খান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সামান্য খাবারও গ্রহণ করেননি। সকালে ঐ আনসারী সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলে তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক অমুক পুরুষ এবং অমুক নারীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৯৭-৯৮

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"আর যে কেউ তার মনের লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তারাইতো সফলকাম হয়েছে"।

লোভ ও কৃপণতা বর্জনীয়

মানুষের মনের গহনে থাকে অর্থ লিপ্সা এবং কৃপণতা। এ অর্থ-লিপ্সা ও কৃপণতাই এমনি উদারতা ও মহানুভবতার আদর্শ এবং ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপনে বাধা দিয়ে থাকে। অর্থ লোভ এবং কৃপণতা প্রকৃতপক্ষে মানব অন্তরের এক দূরারোগ্য ব্যাধি। যে এ ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষা করেছে তথা আল্লাহ পাক যাকে এমন জঘন্য ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষা করার তৌফিক দান করেছেন, এমন ব্যক্তিই জীবন সংগ্রামে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে,

فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

বস্তুতঃ তারাই হলো সফলকাম, তারাই ভাগ্যবান।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ কামুসে شح শব্দটির অর্থ লেখা হয়েছে কৃপণতা এবং লোভ-লালসা। আর জাওহারী লিখেছেন, লোভ সহ কৃপণতা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, شح এবং কৃপণতার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি বললো, কেয়ামতের দিন আমি ধ্বংস হয়ে যাব। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ আশংকা কেন হচ্ছে? সে আলোচ্য আয়াত

وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তেলাওয়াত করলো এবং বললো, আমি অত্যন্ত কৃপণ, আমার হাত থেকে কোন কিছুই বের হয়না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আলোচ্য আয়াতের شح শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক যে কথা এরশাদ করেছেন, তা এটি নয় যা তুমি বুঝছো, আলোচ্য আয়াতের شح শব্দটির তাৎপর্য হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ-সম্পদ যদি অন্যায়ভাবে হজম কর তবে তা شح হবে, তবে হ্যাঁ এটি কৃপণতা, আর কৃপণতাও অত্যন্ত মন্দ জিনিস।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, কেউ যদি নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় না করে তাকে شح বলা হবেনা; বরং شح হল পরের অর্থ-সম্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখা।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, شح শব্দটির অর্থ হলো মানুষ হারাম পন্থায় অর্থ-সম্পদ আহরণ করে এবং তার যাকাত আদায় না করে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, شح শব্দটির তাৎপর্য হলো এমন অদম্য লোভ, যা নিষিদ্ধ পথে রোজগারের কারণ হয়।

এবনে যায়েদ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন তা গ্রহণ না করা, আর যা দান করার আদেশ দিয়েছেন, তাকে কৃপণতার কারণে রেখে না দেয়া। যদি সে আল্লাহর রাহে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করে, তবে বলা যাবে এ ব্যক্তিشح থেকে সংরক্ষিত।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা জুলুম থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা কেয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা شح থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা شح তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে, আর এ কারণেই তারা পরস্পর পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং হারামকে হালাল বানিয়েছে। (মুসলিম শরীফ, আহমদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাহে (জেহাদের সময়) যে বালু উড়েছে, আর দোযখের ধূম্র কোন এক বন্দার মধ্যে একত্রিত হবেনা। অর্থাৎ যে মুজাহেদের মস্তিস্কে জেহাদে রত অবস্থায় বালু প্রবেশ করেছে, তার মস্তিস্কে দোযখের ধূম্র পৌঁছবে না। আর কোন এক বন্দার অন্তরে কখনও شح এবং ঈমান একত্রিত হতে পারেনা (কেননা شح ঈমান বিরোধী কাজ)[১] (বগভী, নেসায়ী)

বস্তুতঃ মদীনাবাসী আনসারী সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ্ পাক এমন নিন্দনীয় চারিত্রিক দোষ থেকে রক্ষা করেছেন কেননা, তাঁদের মধ্যে কৃপণতা ছিল না, সেজন্য তাঁরা মোহাজের সাহাবায়ে কেরামকে বিনা দ্বিধায় অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তাঁদের বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট প্রদান করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেননি। আর যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজেরগণকে বণী নজীরের পরিত্যক্ত সম্পদ দান করলেন এবং মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরামকে দান করলেন না, তখনও তাঁদের অন্তরে কোন দুঃখ ক্ষোভ হয়নি এবং মোহাজেরদের প্রাপ্ত সম্পদের দিকেও তারা কখনও লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেননি। আলোচ্য আয়াতে এমনি গুণ অর্জনেরই তাগিদ করা হয়েছে।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৫৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৯৯
তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৮৭-৮৮
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১০৯৩

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن
قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا
لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾

তরজমা

(১০) আর (ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদে তাদেরও হক্ব রয়েছে) যারা (ইসলাম ধর্মে) তাদের (আনসার ও মোহাজেরদের) পরে এসেছে, তারা এভাবে মোনাজাত করে, "হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর ঈমানের ব্যাপারে যারা আমাদের অগ্রণী আমাদের সেই ভাইদেরকেও ক্ষমা কর। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি যেন ঈর্ষা না হয়, তার তৌফিক দিও। হে পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত দয়াদ্র, অতীব করুণাময়"।

(১১) (হে রসূল!) আপনি কি সেই মুনাফেকদের অবস্থা দেখেননি, যারা তাদের কিতাব প্রাপ্ত কাফের ভাইদেরকে বলে, আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে পড়বো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মানবোনা। আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ হয়, তবে আমরা তোমাদেরকেই সাহায্য করবো। আর আল্লাহ পাক সাক্ষী রয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

(১২) যদি আহলে কিতাব কাফেররা বহিস্কৃত হয় তবে এ মুনাফেকরা তাদের সাথে বের হবেনা, আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ হয় তবে মুনাফেকরা তাদেরকে

সাহায্য করবে না। আর যদি তারা সাহায্য করতে যায়ও তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, এরপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আনসার এবং মোহাজেরগণের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদে তাঁদের হক্বের কথাও ঘোষিত হয়েছে।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আনসার ও মোহাজেরগণের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করে, হিজরত করে এবং পূর্ববর্তী কালের মুসলমানদের প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং তাঁদের জন্যে আন্তরিক ভাবে দোয়া করে, ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদে তাদেরও হক্ব থাকবে, কেননা পূর্ববর্তী কালে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যাদের হেদায়েত নসীব হয়েছে, তাঁরা ইসলামের জন্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ছিল অপরিসীম, তাঁরা যদি তখন ইসলামের জন্যে জান-মালের কোরবানী না দিতেন, তবে পরবর্তীতে কারো পক্ষে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ আসত না, তাই পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানদের জন্যে দোয়া করা এবং তাঁদের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ না করা প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'আর (ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদে তাদেরও হক্ব রয়েছে) যারা (ইসলাম ধর্মে) তাদের (আনসার ও মোহাজেরদের) পরে এসেছে, তারা এভাবে মোনাজাত করে, "হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর ঈমানের ব্যাপারে যারা আমাদের অগ্রণী, আমাদের সেই ভাইদেরকেও ক্ষমা কর, আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি যেন ঈর্ষা না হয়, তার তৌফিক দিও। হে পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত দয়াদ্র, অতীব করুণাময়'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বকালের মুসলমানদের জন্যে দোয়া করা পরবর্তী কালের মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।

পূর্বকালের মুসলমানদের সমালোচনা বর্জনীয়

দ্বিতীয়তঃ পূর্বকালের মুসলমানদের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করা, তাদের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ বর্জনীয় কাজ। বর্তমানে কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে এমনি বর্জনীয় এবং নিন্দনীয় চরিত্র পরিলক্ষিত হয়, যা কোনভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়। এজন্যে ইমাম মালেক (রঃ) বলতেন, যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাঁদের সমালোচনা করে, সে সব লোকদেরকে ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদ থেকে কিছুই দেয়া যাবেনা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এসব লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, কিভাবে তারা কোরআনে করীমের বিরোধিতা করে, কেননা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় আদেশ দেয়া হয়েছে যে, মোহাজের ও আনসারদের জন্যে দোয়া কর, অথচ তারা তাদেরকে গালি দেয়। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। (এবনে আবি হাতেম)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) একথাও বলেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি যে, এ উম্মত শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী কালের লোকেরা পূর্ববর্তী কালের লোকদেরকে লা'নত করবে।[১] (বগভী)

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানদের তথা মোহাজের ও আনসারগণের জন্যে দোয়া করা, তাঁদের প্রতি কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা মুসলমান মাত্রেরই ঈমানী দায়িত্ব। যারা এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেনা, তারা যে প্রকৃত মোমেন নয়, তা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কারো অন্তরে কোন সাহাবী সম্পর্কে সামান্যতম শত্রুতা বা বিদ্বেষ থাকে, তবে সে ব্যক্তি সে সব লোকের অন্তর্ভূক্ত হবেনা, যাদের কথা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, অথচ এ আয়াতের আলোকে ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) এ দোয়া করতেনঃ

হে আল্লাহ! হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল কর, যাঁরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করেছেন, আর হযরত রসূলে করীম

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৩০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৮৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্য করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, অনতিবিলম্বে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাঁরা হাযির হয়েছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন, আর যখনই তিনি তাঁর রেসালতের দলিল প্রমাণ পেশ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কবুল করেছেন এবং কলেমায়ে তৌহীদ ও রেসালত গ্রহণে ও তার প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে ছেড়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রতি সুদৃঢ় ঈমানের কারণে তাঁদেরকে নিজেদের পিতা-মাতা এবং সন্তানদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে তাঁদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

হে আল্লাহ! সে সব লোকদের প্রতি রহমত নাযিল কর, যাঁরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতের সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন।

হে আল্লাহ! সে সব লোকদের প্রতি রহমত নাযিল কর, যারা ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জুকে ধরে নিজেদের গোত্রকেও ছেড়ে দিয়েছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন।

হে আল্লাহ! তাঁরা যা কিছু তোমার রাহে কোরবান করেছেন, তার বদলে তুমি তাঁদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি দান কর।

হে আল্লাহ! যেহেতু তাঁরা তোমার দ্বীনের প্রতি মানুষকে একত্রিত করেছেন এবং আজীবন তাঁরা তোমার রসূলের সঙ্গে ছিলেন এবং তোমার দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন, তাই তাঁদেরকে তার শুভ-পরিণতি দান কর। তাঁরা তোমার পথে এসে নিজের বাড়ী-ঘর এমনকি দেশ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন, ধন-সম্পদ ছেড়ে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হয়েছেন।

হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর সে সব লোকদের প্রতি, যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হয় আর যারা এ দোয়া করেঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর ঈমানের ব্যাপারে যারা আমাদের অগ্রণী, আমাদের সে ভাইদেরকেও ক্ষমা কর'।[১]

'ফা'ই-এর উপর হক্ব রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ফা'ই হিসেবে যে অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয় তাতে মুসলমান মাত্রেরই হক্ব রয়েছে, যদি কেউ সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪০০-০১

করে তবে তাকে ফা'ই থেকে সামান্য অংশও দেয়া হবেনা, এতদ্ব্যতীত ধনী-দরিদ্র, চাকুরীজীবি, ওলামায়ে কেরাম এক কথায় সকল মুসলমানকে ফাইয়ের অংশ দেয়া হবে, এমনিভাবে জেহাদের জন্যে ফাই থেকে ব্যয় করা হবে।

প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) ফাইকে মুসলমানদের মাঝে সমানভাবে বিতরণ করতেন, আর দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের খেদমতে যার অবদান যত বেশী তাকে ফাই তত বেশী দান করতেন।

'ফা'ই-এর বন্টনে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নীতি

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) "কিতাবুল খারাজে" লিখেছেন, আমার নিকট এবনে আবিন্নাজীহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেদমতে যখন ফাইয়ের ধন-সম্পদ পেশ করা হলো, তখন তিনি ঘোষণা করলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাকে অর্থ-সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে যেন হাযির হয়।

এ ঘোষণা শ্রবণ করে হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) আসলেন এবং বললেন, আমাকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, যদি বাহরায়েন থেকে ধন-সম্পদ আসে তবে তোমাকে এত এত (দু' হাতে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন) দান করবো।

তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, তুমি দু' হাত পরিপূর্ণ করে নিয়ে যাও। হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, আমি নিয়ে নিলাম এবং তা গণনা করে দেখলাম পাঁচশত। এরপর হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, এক হাজার নিয়ে নাও (কেননা) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'হাতে দু'বার ইঙ্গিত করেছিলেন, তাই আমি এক হাজার নিয়ে নিলাম। এরপর হযরত আবুবকর (রাঃ) ফাই এর সম্পদ থেকে সে সব লোককে দান করলেন, যাঁদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এরপরও কিছু ফাই অবশিষ্ট রইল। তখন তিনি নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন করেছিলেন এবং প্রত্যেকের অংশে পৌনে দশ দেরহাম বন্টিত হলো।

দ্বিতীয় বছর এর চেয়ে বেশী ফাই অর্জিত হলো, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তা-ও সকলের মাঝে বিতরণ করে দিলেন, এবার প্রত্যেকের অংশে বিশ দেরহাম করে পড়ল, এ সমবন্টনের কারণে কিছু লোক হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে বললেন, ইসলামের জন্যে যাঁদের অধিকতর অবদান রয়েছে, ফাই বন্টনের ক্ষেত্রে তাঁদের ফজিলতের প্রতি লক্ষ্য রাখলে ভাল হতো। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর জবাবে বললেন, আমি এ বিষয়টি অবগত, যাঁরা ইসলামের জন্যে অবদান রেখেছেন, আল্লাহ

পাক তাঁদেরকে আখেরাতে সওয়াব দান করবেন। আর এটি তো নিতান্ত অর্থনৈতিক বিষয়, এতে একজনের প্রতি আরেক জনকে প্রাধান্য দেয়ার স্থলে সমবন্টনই উত্তম।

ফাই বিতরণে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নীতি

যখন দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফতের পবিত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি ফাই বন্টন নীতিতে পরিবর্তন করেন, ইসলামের খেদমতে অবদানকে তিনি ফাই বন্টনের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বলেন, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আমি তাদেরকে সে সব লোকদের সমান দিতে পারবোনা, যাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে। তাই যে মোহাজের ও আনসারগণ ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ছিলেন তাঁদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, বিশেষতঃ যাঁরা বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন তাঁদেরকে পাঁচ হাজার করে দিয়েছেন, আর এমনিভাবে যাঁরা বিশেষ ফজিলতের অধিকারী ছিলেন, তাঁদেরকেও অন্যদের চেয়ে বেশী দিয়েছেন। তিনি উম্মাহাতুল মোমেনীনগণকে বার হাজার করে দিয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বার হাজার দিয়েছেন, হযরত উসামা এবনে যায়েদ (রাঃ)-কে চার হাজার দিয়েছেন এবং খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-কে তিন হাজার দিয়েছেন। তখন আবদুল্লাহ আরজ করলেন, আব্বাজান! উসামাকে এক হাজার বেশী কেন দিয়েছেন? আমার পিতার চেয়ে উসামার পিতার ফজিলত বেশী নয়, আর উসামার এমন কোন বিশেষ মর্যাদা নেই, যা আমার নেই।

হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে বললেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিলেন, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে উসামা তোমার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিলেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) ফাইয়ের সম্পদ থেকে হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হোসায়েন (রাঃ)-কে পাঁচ হাজার করে দিয়েছেন, কেননা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে তাঁদের মর্যাদা উচ্চে ছিল। এতদ্ব্যতীত আনসার এবং মোহাজেরগণের সন্তানদেরকে দু' হাজার করে দিয়েছেন। কিন্তু যখন হযরত আমর এবনে আবি সালমা সম্মুখে আসলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এঁকে এক হাজার বাড়িয়ে দাও। তখন মোহাম্মদ এবনে আবদুর রহমান এবনে জাহাশ বললেন, পিতা আবু সালমার এমন কোন ফজিলত নেই যা আমার পিতা অর্জন করেননি। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আবু সালমার পুত্র হিসেবে আমি তাকে দু'হাজার দিয়েছি, আর হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কারণে

আরো এক হাজার বাড়িয়ে দিয়েছি। যদি তোমার মায়ের মর্যাদা হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) সমান হতো, তবে তোমাকেও এক হাজার বাড়িয়ে দেব। অবশিষ্ট লোকদেরকে হযরত ওমর (রাঃ) আটশত করে দিয়েছেন।

ফা'ই ও গনিমতের মধ্যে পার্থক্য

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ফা'ই এবং গনিমতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায়, ফা'ই হল সে সম্পদ যা মুসলমানগণ জেহাদ ব্যতীত অর্জন করে, কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে, অথবা শান্তি চুক্তি করে মুসলমানদের নিকট তাদের অর্থ-সম্পদ এবং জায়গা জমা দেয়, এমন সম্পদকে ফাই বলা হয়।

আর গনিমত হল সে সম্পদ, যা মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে অর্জন করে। ফাই মুসলমানদের যুদ্ধ বা চেষ্টা ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের দানে অর্জিত হয়। এজন্যে ফাই হিসাবে যে সম্পদ আসে তা ব্যয় করার অধিকার আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। এর লক্ষ্য হতো জনকল্যাণ সাধন করা। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আসে। পক্ষান্তরে গনিমত হল সে সম্পদ যা মুজাহেদগণ জেহাদ করে, কঠোর পরিশ্রম করে কাফেরদের থেকে অর্জন করেন। এতে মুজাহেদদের জন্যে অংশ নিদৃষ্ট রয়েছে। আর এ কারণেই ফাই বিতরণের ব্যাপারে গ্রহীতা নিদৃষ্ট নেই, ধনী-দরিদ্র সকলকেই ফাই থেকে দেয়া যায়। জন কল্যাণের লক্ষ্যে এ সম্পদ ব্যয় করা হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

(হে রসূল!) আপনি কি সেই মুনাফেকদের অবস্থা দেখেননি, যারা তাদের কিতাব প্রাপ্ত কাফের ভাইদেরকে বলে, আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে পড়বো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মানবোনা। আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ হয়, তবে আমরা তোমাদেরকেই সাহায্য করবো। আর আল্লাহ পাক সাক্ষী রয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

পূর্ববর্তী আয়াতে ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদের হক্বদারদের বর্ণনা রয়েছে। যারা খালেছ মোমেন, যারা ঈমানী গুণে গুণান্বিত, যারা শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের অধিকারী, যারা ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ঈমানের দাবীতে সত্য প্রমাণিত, এমন মোহাজের ও আনসারগণের আলোচনা রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে।

আর আলোচ্য আয়াতে মুনাফেকদের মন্দ চরিত্র, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা ও চক্রান্ত এবং তাদের জীবন-সাধনার ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

"(হে রসূল!) আপনি কি সেই মুনাফেকদের অবস্থা দেখেননি"?

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল বনী নজীরের ইহুদীদেরকে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যেভাবে উত্তেজিত করেছিল তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আবদুল্লাহ এবনে উবাই ছিল ইসলামের শত্রু। সে সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। বনী নজীর যখন অবরুদ্ধ তখন সে গোপনে এই খবর দেয় যে, তোমরা নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ মনে করে নিরাশ হয়োনা, আমরাও তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। যদি তোমাদেরকে মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে নির্বাসিত করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে এখান থেকে বের হয়ে যাব। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তবে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো, তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কারো কোন কথা মানবো না।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"আল্লাহ পাক সাক্ষী রয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী"।

এরপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন,

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ

"যদি আহলে কিতাব কাফেররা বহিঃস্কৃত হয়, তবে এ মুনাফেকরা তাদের সাথে বের হবেনা, আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ হয় তবে মুনাফেকরা তাদেরকে সাহায্য করবে না। আর যদি তারা সাহায্য করতে যায়ও তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর তারা কোন সাহায্যই পাবেনা"।

কোরআনে করীমের এ ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটি ছিল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি মোজেযা, যখন বনী নজীর আক্রান্ত হয় তখন মুনাফেকদের একটি প্রাণীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তারা নিশ্চিন্ত মনে তাদের বাড়ী-ঘরে নিদ্রিত ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য করার জন্যে কোন মুনাফেক দুঃসাহস দেখায়নি। আর এভাবে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হয়। বণী নজীরের ইহুদীরা নির্বাসিত হয়ে বের হয়ে যায় এবং মুনাফেরা তা দেখতে থাকে।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً
فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (١٣)
لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ
جُدُرٍ ۭ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۭ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ
شَتّٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ (١٤) كَمَثَلِ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ (١٥) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ اِنِّيْ بَرِيْۗءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦)

তরজমা

(১৩) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে তোমাদের ভয় আল্লাহ পাকের ভয়ের চেয়েও অধিকতর, তা এজন্যে যে, নিশ্চয় তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

(১৪) তারা সকলে একত্রিত হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রচন্ড, (হে শ্রোতা!) তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছো কিন্তু তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন, কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই।

(১৫) এদের দৃষ্টান্ত তাদের সেই নিকট-পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায়ই, যারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করেছে, আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১৬) শয়তানের ন্যায়ই তাদের কথা, যেমন শয়তান মানুষকে বলে কুফরী কর, এরপর মানুষ যখন কুফরী করে বসে তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি ভয় করি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাককে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতেও তাদের অবস্থার আরো কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ۝ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاۤءِ جُدُرٍ ط بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ط تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ۝

অর্থাৎ এ মুনাফেকদের অবস্থা এই, তাদের অন্তরে হে মোমেনগণ! তোমাদের ভয় আল্লাহ্ পাকের ভয়ের চেয়েও অধিকতর, আর তাদের এ অবস্থার কারণ এই, নিশ্চয় তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের ঈমান নেই এবং আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তাদের কোন এলমও নেই। ফলে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয়ের চেয়েও তোমাদের ভয় অধিকতর। তারা কখনো একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে আসবেনা। তবে দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে, দেয়ালের আড়াল থেকে তারা যুদ্ধ করবে, আর তাদের পরস্পরের যুদ্ধ অত্যন্ত কঠিন। (হে শ্রোতা!) প্রকাশ্যে তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে তোমরা মনে কর, তারা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের অন্তর বিছিন্ন, আল্লাহ্ পাক তাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন। প্রকাশ্যে তারা ঈমানের দাবীদার হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়, তারা আল্লাহকে ভয় করে কম, হে মোমেনগণ! তোমাদেরকে ভয় করে অধিকতর, এর কারণ হলো, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়, আল্লাহ্ পাকের শান এবং মর্যাদা সম্পর্কে তারা অবগত নয়। এমনকি, এ সত্য সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ যে, উপকার বা অপকার শুধু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়। এজন্যে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাককে ভয় করা।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا

তারা সকলে একত্রিত হয়েও হে মোমেনগণ! তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা। তবে সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করে, কেননা তারা তোমাদেরকে ভয় করে। এজন্যে তোমাদের মোকাবেলায় তারা আসবেনা।

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ

তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রচন্ড, অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ না করার কারণ এই নয় যে, তারা সৃষ্টিগত ভাবে দুর্বল, ভীত, বরং তারা যখন পরস্পর লড়াই করে তখন অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। তাদের লড়াই না করার মূল কারণ হলো এই যে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এজন্যে তাদের বীর পুরুষরাও তোমাদের মোকাবেলায় আসতে প্রস্তুত হয়না।

تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا

তুমি মনে কর যে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়, বরং

وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى

তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন, যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভয় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, তাই তারা কোন একটি বিষয়ে ঐক্যমতে আসতে পারেনা। জাগতিক স্বার্থে কখনো তাদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই হয়, আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসলেও তারা পলায়নপর হবে। এর কারণ এই, তাদের বিবেক বুদ্ধি নেই, তারা কুফরী ও নাফরমানীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আর এ কারণেই তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারা তাদের স্বার্থের গোলাম, তাদের প্রবৃত্তির দাস, তারা সত্য থেকে অনেক দূরে, মিথ্যার কাছে আশ্রিত, তাদের মন বিদ্বেষে পূর্ণ, তাই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনা।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ

"এদের দৃষ্টান্ত তাদের সেই নিকট-পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায়ই, যারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করেছে"।

অর্থাৎ ইহুদী গোত্র বনী কোরায়জা এবং বদরের যুদ্ধে কাফেররা যেভাবে তাদের শোচনীয় পরিণাম ভোগ করেছে, ঠিক তেমনি বনী নজীরকেও তাদের কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করতে হলো,এ পরিণতিতো দুনিয়াতে হলো,

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

"তাদের সেই নিকট-পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায়ই" বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এর জবাবে মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, বদরের যুদ্ধে যে সব মুশরেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এর দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা ইহুদী বনী কিন্‌কা গোত্রকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বণী কিন্‌কা হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-এর গোত্র, এ গোত্রের লোকেরা মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের সঙ্গে চুক্তি করেছিল, যার পরিণতি তারা এ জীবনেই ভোগ করেছে।

ইহুদী গোত্র বণী কিন্‌কার বিশ্বাসঘাতকতা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করলেন, তখন ইহুদীদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, ঐ চুক্তিতে এ শর্ত ছিল যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের দুশমনকে সাহায্য করবেনা। কিন্তু বদরের যুদ্ধের সময় বনী কিন্‌কা গোত্র সর্ব প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করে চুক্তি ভঙ্গ করে, তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সে সময় একজন বেদুঈন মুসলিম মহিলা বনী কিন্‌কার বাজারে গিয়ে এক স্বর্ণকারের দোকানে অলংকার ক্রয়ের জন্যে বসেন, লোকেরা তাঁর চেহারার আবরণ সরাতে চায় কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি, ইহুদী স্বর্ণকার পেছন থেকে তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র কোন কিছুর সঙ্গে আটকে দেয়। ফলে তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর বস্ত্র স্থানচ্যুত হলো এবং ইহুদীরা অট্টহাসিতে মত্ত হলো, ঐ মহিলা চিৎকার দিলেন, তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে একজন মুসলমান ঐ ইহুদীর প্রতি আক্রমণ করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন, এরপর ইহুদীরা ঐ মুসলমানকে শহীদ করলো, এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কৃত চুক্তি তারা ভঙ্গ করলো, শহীদ মুসলমানের আত্মীয়-স্বজন অন্য মুসলমানদেরকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করলেন, এভাবে মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। তখন

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً

এ আয়াতখানি নাযিল হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি বণী কিন্‌কা গোত্র থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করছি, আর এ আয়াত নাযিল হবার পর তিনি বনী কিন্‌কা গোত্রের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত হামজা এবনে আবদুল মোত্তালেব (রাঃ)-এর নিকট পতাকা অর্পণ করলেন। মদীনা মোনাওয়্যারায় হযরত আবু লোবাবা (রাঃ)-কে স্থলাভিষিক্ত করলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী কিন্‌কা গোত্রের ইহুদীদেরকে অবরোধ করলেন, পনের দিন পর্যন্ত তারা অবরুদ্ধ রইল, অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী তারা বের হয়ে আসল এ শর্তে যে, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হস্তগত হবে, তবে তাদের

সন্তান-সন্ততীদেরকে মুসলমানদের গোলাম-বাঁদী করা হবেনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বেধে ফেলার নির্দেশ দিলেন, এর দায়িত্ব অর্পিত হলো মুনজের এবনে কোরামার প্রতি, হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললেন, আমার উদ্দেশ্য এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, তাই এ কাফের গোত্রের সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। তখন আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই এবনে সলুল আরজ করলো, আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার প্রতি আপনি এহসান করুন (তাদেরকে ক্ষমা করুন)।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ তাঁর চাদর মোবারকে হাত রেখে দিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ছেড়ে দে, তোর মন্দ হোক, সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি সে পর্যন্ত ছাড়বোনা, যে পর্যন্ত না আপনি আমার প্রতি এহসান করে আমার বন্ধুদের কোন ব্যবস্থা করেন। এদের মধ্যে সাতশত লোক রয়েছে। এর মধ্যে চারশ অস্ত্রধারী নয়, বাকী তিনশত সশস্ত্র। আপনি তো আগামী কাল সকালে তাদের মৃত্যুদন্ড দেবেন। আল্লাহর শপথ! আমি যুগের আবর্তন-বিবর্তনকে বড় ভয় করি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং তাদের সাথীদের প্রতিও আল্লাহর লা'নত।

যাহোক, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের মৃত্যুদন্ডের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং মদীনা শরীফ থেকে তাদেরকে বহিস্কারের আদেশ দিলেন। তিন দিনের মধ্যে তারা নির্বাসিত হলো। হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ)-কে তাদের বহিস্কারের আদেশ দিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের অস্ত্রাগার থেকে কয়েকটি অস্ত্র রেখে দিলেন, তাদের বাড়ী-ঘরে অনেক অস্ত্র এবং স্বর্ণকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। অর্জিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ছেড়ে দিয়ে বাকী চারভাগ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বদরের যুদ্ধের পর এই প্রথম মুসলমানগণ গনিমতের সম্পদ লাভ করলেন। হিজরতের বিশ মাস পর ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের পনের তারিখ এ ঘটনা ঘটে। তখন আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই এবনে সলুল এবং ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

(সূরা মায়েদা)

"হে মোমেনগণ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা"।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِیْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

"শয়তানের ন্যায়ই তাদের কথা, যেমন শয়তান মানুষকে বলে কুফরী কর, এরপর মানুষ যখন কুফরী করে বসে তখন শয়তান বলে, "তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি ভয় করি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাককে"।

অর্থাৎ শয়তান মানুষকে কুফরী ও নাফরমানীর জন্যে উস্কানি দেয়, মন্দ কাজের জন্যে প্ররোচনা দেয়, যখন মানুষ নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তথা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাককে ভয় করি। এভাবে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট এবং ধ্বংস করে। আলোচ্য আয়াতে মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার দলবল ইহুদীদেরকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানী দেয় এবং একথার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, তোমরা এ যুদ্ধে একা থাকবেনা, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু সংকটময় মুহূর্তে আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার দলবল তাদের সাহায্যে আসেনি, ইহুদীরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ভোগ করেছে। আবদুল্লাহ এবনে উবাইদের অবস্থা ইবলিস শয়তানের ন্যায়, সে মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, যখন মানুষ মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তখন সে পলায়ন করে এবং বলে, আমি তোমার সঙ্গে নেই।

শয়তানের প্রতারণার একটি দৃষ্টান্ত

এ পর্যায়ে আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার আতা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মধ্যে যে ছয়শত বছর অতিবাহিত হয়েছে, এ সময় বরসীসা নামক একজন ধর্মযাজক ছিল, সত্তর বছর যাবত এ ধর্মযাজক আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল ছিল, ক্ষণিকের জন্যেও সে কখনো আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেনি, ইবলিস শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে ইবলিস সকল শয়তানকে একত্রিত করে বলে, বরসীসা নামক এ ধর্ম যাজককে পথভ্রষ্ট করতে তোমরা কেউ আমাকে সাহায্য করোনি, তখন শয়তানদের মধ্যে একটি গোরা শয়তান ছিল, এ শয়তানই আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকটও হাযির হয়, একবার সে জীব্রাঈল (আঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিল, যাতে করে ওহী সম্পর্কে

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে ওয়াস ওয়াসা দিতে পারে, কিন্তু জীব্রাঈল (আঃ) তাকে সজোরে আঘাত করে অনেক দূরে সরিয়ে দেন। ঐ গোরা শয়তানই ইবলিসকে বলে, আমি আপনার কাজ করে দেব। তখন সে ধর্মযাজকের পোষাক পরিধান করে বরসীসার কাছে যায় এবং তাকে ডাকে, কিন্তু বরসীসা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। বরসীসা প্রতি দশ দিনে একদিন বিশ্রাম করতো। রোজা রাখত না, নামাযও পড়ত না, গোরা শয়তান যখন দেখল, বরসীসা তার ডাকে সাড়া দেয়না, তখন সে বরসীসার এবাদত খানার নীচেই এবাদতে মশগুল হয়ে গেল। দশদিন পর বরসীসা যখন বিশ্রাম করে তখন দেখল অন্য একজন ধর্মযাজক এবাদতে মশগুল রয়েছে। গোরা শয়তানই তখন ধর্মযাজকের ভূমিকা পালন করছিল কিন্তু তার এবাদতের অবস্থা দেখে বরসীসা লজ্জিত হলো এজন্যে যে, এমন এক ব্যক্তির ডাকে সে সাড়া দেয়নি। বরসীসা তখন বললো, আপনি আমাকে ডেকেছেন কিন্তু আমি আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, বলুন আমার কাছে আপনার কি কাজ? গোরা শয়তান বললো, আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই, যেন আপনার সঙ্গে মিলে এবাদত করতে পারি, যেন আপনার এলম এবং আমল দ্বারা উপকৃত হতে পারি। আমরা উভয়ে এবাদতে মশগুল থাকবো, আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন, আমি আপনার জন্যে দোয়া করবো।

বরসীসা বললো, আমি তোমার দিকে মনোনিবেশ করতে পারবোনা, যদি তুমি মোমেন হও, তবে আমি সাধারণত মোমেনদের জন্যে যা দোয়া করি, তাতে তুমি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একথা বলে বরসীসা পুনরায় নামাযে মনোনিবেশ করলো। এদিকে গোরা শয়তানও নামাযে মশগুল হয়ে গেল। বরসীসা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দিকে দৃষ্টিপাত করেনি (নামাযে মশগুল ছিল)। চল্লিশ দিন পর গোরা শয়তানের দিকে তাকিয়ে দেখল সে নামাযে রত রয়েছে। এ অবস্থা দেখে বরসীসা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি চাও? সে বললো, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি আপনার নিকটে থাকতে চাই। বরসীসা অনুমতি দিল। এভাবে গোরা শয়তান বরসীসার এবাদত গৃহে একটি বছর কাটিয়ে দিল এবং সারা বছর সে রোযা রাখল। চল্লিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে নামাযেও বিরতি দিতনা। এ পরিস্থিতিতে বরসীসা উপলব্ধি করলো যে তার এবাদত কম এবং নতুন ধর্মযাজকের (গোরা শয়তান) এবাদত অনেক বেশী। এক বছর পর গোরা শয়তান বললো, এবার আমি যাই, আপনি ব্যতীত আমার আরেকজন সাথী রয়েছে, আমি তার নিকট চলে যাব। আমি ইতিপূর্বে শ্রবণ করেছিলাম, আপনি সর্বাধিক এবাদতকারী কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, যা শুনেছি তা সঠিক নয়। একথা শ্রবণ করে বরসীসা অত্যন্ত ব্যথিত হলো এবং গোরা শয়তানের সাধনা সে দেখেছে, তাই তার বিরহও তার জন্যে আরও কষ্টদায়ক হলো। ঐ সময় গোরা শয়তান বরসীসাকে বললো, আমি কিছু দোয়া জানি, আমি সেগুলো আপনাকে শিখিয়ে দিতে চাই। আপনি যেভাবে এবাদত করছেন, তার চেয়ে দোয়াগুলো অতি উত্তম। আপনি যদি একথাগুলো পাঠ করে আল্লাহ পাকের

নিকট দোয়া করেন, তবে আল্লাহ পাক রুগ্ন ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করবেন। দুঃখী মানুষকে সুখী করে দেবেন। বরসীসা বললো, মর্যাদা অর্জন করা আমার পছন্দনীয় নয়, আমার কাজ আমার জন্যে যথেষ্ট, মানুষ যখন এসব কথার খবর পাবে তখন তারা আমাকে বিরক্ত করবে এবং আমার এবাদতের জন্যে ক্ষতিকর হবে। কিন্তু গোরা শয়তান বারংবার তাকে তার কথা বলতে থাকে, অবশেষে বরসীসা ঐ কথাগুলো শিখল, গোরা শয়তান চলে গেল। ইবলীসের নিকট গিয়ে বললো, আমি এ ব্যক্তিকে শেষ করে দিয়েছি। এরপর পথে ঐ গোরা শয়তান এক ব্যক্তিকে শারীরিক ভাবে কষ্ট দিল, লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, এরপর ঐ শয়তান চিকিৎসকের রূপ ধারণ করে তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট উপস্থিত হলো এবং বললো, এ ব্যক্তির উপর জ্বীনের আছর হয়েছে, তোমরা বললে আমি এর চিকিৎসা করতে পারি। এরপর রোগীর নিকট গিয়ে তাকে দেখল এবং বললো, এর উপর একটি পরীর প্রভাব রয়েছে, আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিনা, তবে আমি এক ব্যক্তির ঠিকানা দিতে পারি, যে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলে এ ব্যক্তি সুস্থ হতে পারে। সে তখন বরসীসার অবস্থান জানিয়ে দেয় এবং একথাও বলে, তোমরা তার নিকট যাও, সে এসমে আজম জানে, এসমে আজম পাঠ করে দোয়া করলে আল্লাহ পাক কবুল করেন। তখন তারা বরসীসার নিকট আসলে সে ঐকথাগুলো বলে দোয়া করে, যা গোরা শয়তান তাকে শিখিয়েছিল। ফলে যে শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা দূরীভূত হয় এবং রুগ্ন ব্যক্তিটি সুস্থ হয়।

একবার গোরা শয়তান বণী ইসরাঈলের এক রাজকন্যার উপর প্রভাব বিস্তার করে, এরপর চিকিৎসকের রূপ ধারণ করে তার ভাইদের নিকট হাযির হয়ে বলে, অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীন তার উপর সওয়ার হয়েছে, কাজেই এর চিকিৎসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমি একজন ধর্মযাজকের ঠিকানা দিচ্ছি, তোমরা তার নিকট হাযির হও, রাজকন্যাকে তার কাছে রেখে আস, সে অস্বীকার করলেও বল, তোমার নিকট তাকে আমানত হিসেবে রেখে যাই, তুমি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার দেখা-শুনা কর। গোরা শয়তান বরসীসাকে যে কথাগুলো শিখিয়েছিল, তা পাঠ করলে রাজকন্যা সুস্থ হলো। এভাবে ঐ রাজকন্যা একদিন তার অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো এবং ইবলিস শয়তান তাকে বললো, তুমি তাকে ব্যবহার করতে পার, পরে আল্লাহ্ পাকের নিকট গুনাহ্ মাফ চেয়ে নেবে। আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন। এভাবে বরসীসা রাজকন্যার সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হলো, রাজকন্যা অন্তস্বত্বা হলো, তখন শয়তান এসে তাকে বললো, এখন তো তুমি অপমানিত, রাজপুত্ররা এসে তোমাকে অপমান করবে। এক কাজ কর, মেয়েটিকে তুমি হত্যা করে সমাধিস্থ্ কর। বরসীসা তাই করলো। এরপর শয়তান মানব রূপ ধারণ করে রাজপুত্রদেরকে এ সম্পর্কে খবর দিল। অবশেষে বরসীসাকে রাজ দরবারে হাযির করা হলো। গোরা শয়তান এসে বললো, তুমি ঘটনা অস্বীকার করবেনা, কেননা যদি তা কর তবে তোমার বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ আসবে (১) হত্যার অভিযোগ (২) হত্যাকে অস্বীকার করা। তাই বরসীসা অপরাধ স্বীকার করলো এবং রাজা তাকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিল।

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্তে গোরা শয়তান হাযির হয়ে বললো, আমাকে চিনতে পেরেছ, তখন বরসীসা বললো, না। গোরা শয়তান তখন বললো, আমিই তো তোমাকে দোয়া শিখিয়েছিলাম, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। রাজকন্যা তোমার নিকট আমানত ছিল। তুমি আমানতে খেয়ানত করার সময় কেন আল্লাহ্ পাককে ভয় করলেনা? তখন বরসীসা বললো, এখন কি করণীয় তাই বলো। সে বললো, এখন একটি কাজ আছে যা করলে আমি তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবো, তাহলো তুমি আমাকে সেজদা কর। বরসীসা বললো, আমি তাই করছি, তবে তুমি আমাকে রক্ষা কর। যখন সে সেজদা করলো, তখন গোরা শয়তান বললো, হে বরসীসা! আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, তুমি এখন কাফের হয়ে গেছ, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রইলনা, আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাককে ভয় করি। আলোচ্য আয়াতে একথাই এরশাদ হয়েছে যে, ইবলিস শয়তান মানুষকে শয়তানী কাজে প্ররোচনা দেয়, কুফরী ও নাফরমানীতে উস্কানি দেয়, যখন মানুষ কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন সে বলে, নিশ্চয় আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাককে ভয় করি।

মূলতঃ ইবলিস শয়তান একথা দ্বারাও মানুষকে ধোকা দেয়, কেননা তার একথাটিও শয়তানী অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। শয়তান কেয়ামতের দিনও একথাই বলবে, বদরের যুদ্ধের দিন ইবলিস শয়তান কাফেরের আকৃতি ধারণ করে কাফেরদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতো, কিন্তু ফেরেশতাদেরকে দেখলে পলায়ন করতো। ইবলিস শয়তানের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই এবনে সলুল এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে, তারাও বনী নজীরকে এভাবে ধোকা দিয়েছিল। মুনাফেকরা বনী নজীরকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো, তোমাদের চিন্তার কোন কারণই নেই। কিন্তু যখন বনী নজীর বিপদগ্রস্ত হলো তখন মুনাফেকরা তাদের ধারে কাছেও ঘেষেনি।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দটি দ্বারা আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বদরের যুদ্ধের দিন ইবলিস শয়তান আবু জেহেলকে বলেছিল, "আজ কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি"। কিন্তু যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল, তখন ইবলিস বলেছিল, আমি যা দেখছি, তা তোমরা দেখনা, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ পাককে ভয় করি।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪১৪-১৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৩২
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২১-২২
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৫৭

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ؕ وَذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ
اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ
النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৭) ফলে উভয়ের পরিণাম হবে দোযখ, চির দিন তারা দোযখে থাকবে। এটি দূরাত্মা জালেমদের শাস্তি।

(১৮) হে মোমেনগণ! আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী দিনের জন্যে সে কি করে পাঠিয়েছে, আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

(১৯) আর (হে মোমেনগণ) তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা, যারা আল্লাহ্ পাককে ভুলে গেছে, পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আত্ম-বিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাইতো অবাধ্য নাফরমান।

(২০) দোযখের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী পরস্পর আদৌ সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীগণই সফলকাম।

তফসীরুল কোরআন

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۞

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত, ইহুদীদের ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছে, মুনাফেকরা হলো শয়তানের মত। শয়তান মানুষকে প্রতারণা করে পথভ্রষ্ট করে। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন শয়তান পিছটান

দেয়, সে বলে, তোমার সথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস শয়তান ও তার অনুসারী মানুষের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে যে, তারা চিরদিন দোযখে থাকবে, দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। অবাধ্য জালেমদের এটিই শাস্তি।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে عاقبتهما (তাদের উভয়ে) শব্দটির ব্যাখ্যা হল, মুনাফেক ও ইহুদী। ইহুদীদের পরিণতি হবে শয়তান ও তার অনুসারী মানুষের ন্যায়, অর্থাৎ তারা উভয়েই যাবে দোযখে।[১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۝

"হে মোমেনগণ! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী দিনের জন্যে সে কি করে পাঠিয়েছে, আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র, ইহুদীদের শত্রুতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদেরকে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক এবং প্রত্যেকেরই দেখা উচিত যে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সে কি প্রস্তুত করে পাঠিয়েছে, নেক আমল আখেরাতে নাজাতের কারণ হবে, আর বদ আমল আখেরাতে ধ্বংসের কারণ হবে। অতএব, মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সৎ কাজের জন্যে সচেষ্ট হওয়া মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। আর এ দু'টি কাজের জন্যে পূর্বশর্ত হল, আল্লাহ্ পাককে ভয় করা। আল্লাহ্ পাককে ভয় করার মাধ্যমেই এ দু'টি কাজ সহজ হয়, অর্থাৎ ভাল কাজ করা যায় এবং মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

لِغَدٍ

অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেয়ামতের দিনকে "আগামী দিন" বলার তাৎপর্য হল কেয়ামতের দিন অতি নিকটবর্তী। অথবা দুনিয়ার জীবন একদিন, আর আখেরাত দ্বিতীয় দিন। এরপর আল্লাহ্ পাকের ভয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্যে পুনরায় এরশাদ হয়েছে,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্টা-৩৯১

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আর আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে তাঁকে ভয় করতে থাক, আর একথাও স্মরণ রেখ যে, আল্লাহ পাকের নিকট কিছুই গোপন নেই, তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত।

মূলতঃ মানুষের এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, পৃথিবীতে মানুষের আগমন এবং এখান থেকে মানুষের গমন-এর কোনটিই তার ইচ্ছাধীন নয়। সবই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কেউ জানেনা যে, তাকে আর কতদিন পৃথিবীতে থাকতে দেয়া হবে, তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হলো এ জীবনেই পরজীবনের সম্বল সংগ্রহ করা, এ জীবনের মায়া মোহে মুগ্ধ হয়ে পর জীবনের কথা ভুলে না যাওয়া, কেননা কেয়ামত আসন্ন। আল্লাহ পাকই মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, আর তিনিই সকলকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। যে এ জীবনে সৎ কাজ করবে, সে পরজীবনে তার শুভ পরিণতি ভোগ করবে, পক্ষান্তরে, যে এ জীবনে মন্দ কাজে লিপ্ত হবে, পর জীবনে তাকে তার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতেই হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে, হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, কেননা সকল কল্যাণকর কাজের মূল উৎসই হলো তাকওয়া পরহেযগারী। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি মানুষের দেখা উচিত যে, আখেরাতের অনন্ত কালের জীবনের জন্যে সে কী সম্বল সংগ্রহ করেছে, কেননা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যই হলো একমাত্র সম্বল, যে যত বেশী তা সংগ্রহ করবে, সে তত বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত জরীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা একদিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির ছিলাম, কিছু লোক তখন উপস্থিত হলো, এমন অবস্থায় যে তারা সকলেই ছিল নগ্ন পদে, কারো কারো দেহও ছিল নগ্ন, শুধু চাদর বা জুব্বা দিয়ে দেহ আবৃত করে রেখেছিল, তবে তাদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল, তারা সকলেই মুজের গোত্রের লোক ছিল, তাদের দরিদ্রাবস্থা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের বর্ণ পরিবর্তন করে দিল, তখন তিনি তাঁর বাসগৃহে প্রবেশ করলেন এবং বের হয়ে আসলেন, এরপর হযরত বেলাল (রাঃ)-কে আজান দেয়ার হুকুম দিলেন, আযান হলো, একামত হলো, তিনি নামাযে ইমামতি করলেন, এরপর ভাষণ দান করলেনঃ প্রথমে পাঠ করলেনঃ

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

"হে মানব জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন"।

পরে তিনি আলোচ্য আয়াত وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, তেলাওয়াত করলেন এবং মানুষকে আল্লাহর রাহে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন, ফলে লোকেরা সদকা খয়রাত দিতে শুরু করলেন, এরই মধ্যে অনেক নগদ দেরহাম, দিনার, পোষাক-পরিচ্ছদ, গম, খেজুর প্রভৃতি জমা হলো, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণ অব্যাহত রাখলেন, তিনি বললেন, যদি অর্ধেক খেজুরও দিতে পার তবু নিয়ে আস, একজন আনসারী সাহাবী নগদ দেরহাম, দিনারে পরিপূর্ণ একটি থলে নিয়ে আসলেন, যা বহন করে আনাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। এরপর প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নিয়ে আসতে লাগলেন এমনকি, অনেক দ্রব্য সম্ভার একত্রিত হলো, তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সে আনন্দের ভাব তাঁর চেহারা মোবারকেও প্রকাশ পেল। তিনি এরশাদ করলেন, যে কেউ ইসলামে কোন ভাল কাজ শুরু করে সে তার আমলের সওয়াব পায়, এরপর যারা তার অনুসরণে ঐ কাজ করে, তাদের সকলের পক্ষ থেকেও সে সওয়াব পায় এবং তার অনুসারীদের সওয়াব কম করা হয় না। পক্ষান্তরে যে ইসলামে কোন মন্দ পন্থা প্রবর্তন করে, তবে এজন্যে তার গুনাহ হয়, এরপর যারা ঐ মন্দ কাজটি করে তাদের যে গুনাহ হয়, সে গুনাহ্ তারও হয়, তবে তার অনুসারীদের গুনাহ্ কম হয়না।

আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম আদেশ হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষা কর অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন কর, তাঁর নাফরমানী থেকে নিজেকে রক্ষা কর, এরপর এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণের সময় আসার পূর্বেই নিজের হিসাব গ্রহণ কর এবং দেখ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার পূর্বে নেক আমলের সম্বল কতখানি সংগ্রহ হয়েছে? কেননা নেক আমলই অবশেষে উপকারী হবে। এরপর পুনরায় তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ্ পাককে সর্বাবস্থায় ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন, ছোট-বড় কোন কাজই তাঁর নিকট গোপন নেই। অতএব, সতর্ক থাক, দুনিয়ার বাজার থেকে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সওদা ক্রয় কর।[১]

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

"আর (হে মোমেনগণ) তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা, যারা আল্লাহ্ পাককে ভুলে গেছে, পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই তো অবাধ্য, নাফরমান"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

এ আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সে সব লোকের ন্যায় হয়োনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনা, যা অবশ্য কর্তব্য তা করেনা, আর যা নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকেনা, নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দেন, তারা বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, ফলে নিজেদের উপকারের পথ ভুলে যায় এবং যা ক্ষতিকর, তা তারা ভুলে থাকে, এটিই হয় তাদের অনিবার্য পরিণতি, তারাই ফাসেক।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের فَسِقُوْنَ শব্দটি كَفِرُوْنَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) লিখেছেন,

الكاملون فى الفسوق

অর্থাৎ তারা নাফরমানীতে পরিপূর্ণ, আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করায় তারা বদ্ধ পরিকর, তাই তাদের শাস্তিও অবধারিত।

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে কথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

হে মোমেনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহ্ পাকের যিকর থেকে তোমাদেরকে গাফেল না করে, যদি কেউ তা করে তবে তারাই হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সর্বনাশ হবে অনিবার্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, হে মোমেনগণ! তোমরা মুনাফেকদের ন্যায় আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের কথা ভুলে যেওনা, কেননা মুনাফেকরা প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের উপর আমল করতো, কিন্তু গোপনে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

অথবা এর অর্থ হল, হে মোমেনগণ! তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, যেমন ইহুদীরা অথবা কাফেররা।[১]

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৬৫

"দোযখের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী পরস্পর আদৌ সমান নয়, জান্নাতের অধিবাসীগণই সফলকাম"।

যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তারাই হবে দোযখের অধিবাসী। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, তারা হবে জান্নাতবাসী, জান্নাতবাসীদের জন্যে অনন্ত-অসীম নেয়ামত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তারা হবে চিরশান্তি, চিরসুখের অধিকারী, তাদের জীবন হবে সার্থক, সুন্দর ও সফলকাম। তাই জান্নাতবাসী ও দোযখবাসী কখনও এক সমান হতে পারেনা।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২১) আমি যদি এই কোরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে যে, তা আল্লাহ পাকের ভয়ে ধ্বসে গেছে এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্যে, যেন তারা চিন্তা করে।

(২২) তিনিই আল্লাহ পাক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি গোপন প্রকাশ সবই জানেন, তিনি অনন্ত-অসীম দয়াবান, পরম দয়ালু।

(২৩) তিনিই আল্লাহ পাক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদই নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পবিত্র, নিষ্কলংক, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল প্রভাবশালী, তিনি অতীব মহিমান্বিত, তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ পাক তা থেকে পবিত্র, তিনি মহান।

(২৪) তিনিই আল্লাহ পাক, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল সুন্দর ও উত্তম নাম শুধু তাঁরই, আসমান সমূহ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনি মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসী ও দোযখবাসী কখনও এক সমান হতে পারেনা। যারা পবিত্র কোরআন মেনে চলে তারা হবে জান্নাতবাসী, আর যারা পবিত্র কোরআনকে অমান্য করবে তারা হবে দোযখবাসী, এতে পবিত্র কোরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম

পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত কেননা, কোরআন মজীদ স্বয়ং সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, এটি মানব জাতির শান্তি, মুক্তি এবং কল্যাণের প্রতীক। পবিত্র কোরআনের মহান বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সকল যুগের মানুষের জন্যে এতে রয়েছে হেদায়েত। পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের যথার্থ উপলব্ধির জন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

"যদি আমি কোরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহ পাকের ভয়ে ধ্বসে গেছে এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে"।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের এমনি মহিমা এবং এমনি অলৌকিক প্রভাব আছে বলেই যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্তর তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যদি কারো অন্তরে পবিত্র কোরআনের প্রভাব বিস্তার না হয়, তবে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, এ ব্যক্তির অন্তর পাহাড় পর্বতের চেয়েও কঠিনতর।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবং অন্যান্য তফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি পাহাড়-পর্বতকে তেমন অনুভূতি দান করা হয় যা মানুষকে দেয়া হয়েছে, তবে পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবে আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যেত অথচ মানুষ বুঝেও বোঝেনা, শুনেও শোনেনা, এর কারণ ব্যাখ্যা

করে আল্লামা ওসমানী (রঃ) তাঁর পিতার রচিত একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو

کان بہرے ہوگئے دل بدمزہ ہونے کو ہے

“গান বাজনা, বাজে কথা শ্রবণ করতে করতে শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, মন সত্য গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে”।

آو سنوآیں تمہیں وہ نغمۂ مشروع بھی

پارہ جس کے لحن سے طور ہدی ہونے کو ہے

“আস! আমি তোমাকে শোনাবো শরীয়তের সেই গজল, যার সুর লহরীতে তূর পর্বত বিদীর্ণ হয়েছিলো”।

حیف گرتاثیر اسکی تیرے دل پر کچھ نہ ہو

کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے

“শত আক্ষেপ! যদি তার প্রতিক্রিয়া তোমার অন্তরে না হয়, যার প্রভাবে পাহাড় পর্যন্ত দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায়”।

জড় পদার্থের উপর কোরআনে করীমের প্রভাব

এ আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জড় পদার্থের উপরও পবিত্র কোরআনের প্রভাব বিস্তার হয়। এদের অন্তরেও আল্লাহ পাকের ভয় বিদ্যমান রয়েছে যেমন সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ এমন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পরও হে বণী ইসরাঈল জাতি! তোমাদের অন্তর পাথরের ন্যায় কঠোর এবং তার চেয়েও অধিকতর কঠোর হয়ে গেছে।

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ......

কোন কোন পাথর এমনও রয়েছে যা আল্লাহর ভয়ে চৌচির হয়ে যায়, তা থেকে পানি বের হয়ে আসে। আর কোন কোন পাথর এমনও রয়েছে, যা আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উপর থেকে নীচে পড়ে যায়।[১]

এতদ্ব্যতীত, হাদীস শরীফে এ ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে যখন মিম্বর তৈরী করা হলো এবং তিনি সর্ব প্রথম তার উপর দন্ডায়মান হয়ে খোতবা প্রদান শুরু করলেন, তখন

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৭-৬৪

ইতিপূর্বে যে খেজুর বৃক্ষটির উপর হেলান দিয়ে তিনি খোতবা দান করতেন, তা অত্যন্ত অস্থির হয়ে মানব শিশুর ন্যায় ক্রন্দণ শুরু করলো, তার ক্রন্দণের আওয়াজ শ্রবণ করলেন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণ করে ঐ ক্রন্দণরত বৃক্ষটিকে স্পর্শ করে সান্ত্বনা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্ত্বনা দেয়াতে বৃক্ষটি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, হে মুসলিম জাতি! লক্ষ্য কর, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতে, তাঁর বিরহে একটি মৃত, শুস্ক বৃক্ষ পর্যন্ত ক্রন্দণরত হয়, তাহলে তোমাদের অন্তরে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত কত বেশী থাকা উচিত তা অনুধাবন কর।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেছেন, যদি পাহাড় পর্বতকে বোধ শক্তি প্রদান করা হতো, তবে তা পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর মহিমা ও অলৌকিক প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত। অতএব, হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! পবিত্র কোরআনের মহিমা উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, তার মর্মবাণী অনুধাবন করে তার উপর আমল করার প্রয়াসী হও।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

"মানুষ যাতে চিন্তা করে, এজন্যেই আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি"।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আয়াতে এ বিষয়ের উপর তাগিদ রয়েছে যে, মানুষ যেন আল্লাহ পাকের সৃষ্টির উপর চিন্তা ও গবেষণা করে স্রষ্টার পরিচয় লাভ করে। সৃষ্টিকে দেখেই স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করা যায়। এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

برگ درختان سبز درنظر ہو شیار
ہر طرف دفتر یست معرفت کردگار

"বৃক্ষের সবুজ পাতাগুলোতে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের মহিমা বিরাজমান রয়েে"ছ।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে, যেন মানুষ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সত্য গ্রহণ করে জীবন সাধনাকে সার্থক করতে পারে। এখানে যে কথাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, পবিত্র কোরআন স্বয়ং আল্লাহ পাকের মহান বাণী, আল্লাহ পাকের নিজস্ব পবিত্র কালাম, আল্লাহ পাক নিজেই তার বক্তা, পবিত্র কোরআনেরই যখন এত মহিমা, এত মাহাত্ম,

তখন স্বয়ং আল্লাহ পাকের গুণাবলী কেমন হবে তা জানার জন্যে স্বভাবতই পাঠক বা শ্রোতার মন উদগ্রীব হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۞ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

“তিনিই আল্লাহ পাক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদই নেই, তিনি রাজাধিরাজ. তিনি পবিত্র, নিঃস্কলংক, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, প্রভাবশালী, তিনি অতীব মহিমান্বিত, তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ পাক তা থেকে পবিত্র, তিনি মহান। তিনিই আল্লাহ পাক, স্রষ্টা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল সুন্দর ও উত্তম নাম তাঁরই, আসমান সমূহ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই মহাজ্ঞানী”।

এ আয়াত সমূহে পরম করুণাময় প্রেমময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কয়েকটি পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের গুণাবলী অনন্ত অসীম। মানুষের সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম গুণাবলীর সন্ধান করা আদৌ সম্ভব নয়। আর এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোনাজাতকালে এভাবে আরজী পেশ করেছেন,

اللهم انت كما اثنيت عليك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তেমনই, যেমন তোমার প্রশংসা তুমি নিজেই করেছ।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

তিনিই সেই আল্লাহ পাক, তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যে, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই।

“আল্লাহ” শব্দটি এসমে জাত। আল্লাহ পাকের খাস নাম, তিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সর্ব গুণাকর, যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি মহান, যিনি চিরন্তন,

যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, যিনি ব্যতীত কেউ বন্দেগীর যোগ্য নেই, তিনিই আল্লাহ্ পাক।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। নিখিল বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত এমনকি, মানুষ ভবিষ্যতে কি চিন্তা করবে, তা-ও তিনি জানেন।

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

"রহমান" পরম করুণাময়। "রহীম" অতিশয় দয়াবান।

"রহমান" ও "রহীম"- এ দু'টি শব্দই আল্লাহ্ পাকের গুণ প্রকাশক। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, দু'টি শব্দের অর্থের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। "রহমান" শব্দটি মুবালেগা, এতে রহমতের আধিক্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ পাক মোমেন কাফের ভাল মন্দ সকলের প্রতি অতীব দয়াবান, আল্লাহ্ পাকই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দয়ার মহা সমুদ্রে সকলেই নিমজ্জমান, আল্লাহ্ পাকের রহমত সকলের নিকট পৌছে, তবে মোমেনদের প্রতি তিনি বিশেষ দয়াবান, আল্লাহ্ পাকই দুনিয়াতে মোমেনদেরকে সরল সঠিক পথ দান করেন, আর আখেরাতে দান করবেন তাঁর বেহেশত এবং তাঁর দীদার দানে ধন্য করবেন। রহমান শব্দটি শুধু আল্লাহ্ পাকের জন্যে ব্যবহৃত হয়, আর কারো জন্যে নয়। পক্ষান্তরে "রহীম" শব্দটি অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা যায়, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দু'টি শব্দই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়। আর রহীম বলা হয় তাঁকে, যিনি আখেরাতে দয়া করবেন।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, যিনি আসমানবাসীর প্রতি দয়া করেন, তাঁকে রহমান বলা হয়, আর যিনি দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করেন, তাঁকে রহীম বলা হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাকের একশতটি রহমত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি রহমত পৃথিবীতে নাযিল করেছেন, যা সারা পৃথিবীতে বিতরণ করা হয়েছে। মানুষ একে অন্যের প্রতি যে দয়া করে, তা ঐ রহমতেরই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট ৯৯টি রহমত আল্লাহ্ পাক নিজের জন্যে সংরক্ষিত রেখেছেন, যা কেয়ামতের দিন স্বীয় বন্দার প্রতি নাযিল করবেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরও বলেছেন, রহ্মান তিনিই, যাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি স্বীয় বন্দার চাহিদা পূরণ করেন। আর রহীম তিনিই, যাঁর নিকট চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকট কিছু না চায়, তবে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। গওসুল আযম হযরত শাহ্ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেছেন, রহ্মানের অর্থ হল, আল্লাহ্ পাক সর্বাবস্থায় তোমার প্রতি দয়াবান। আর রহীমের অর্থ হল, তিনি সকল বালা-মসিবত থেকে বন্দার হেফাজতকারী।

রহ্মানের অর্থ হল, যিনি দোযখ থেকে নাজাত দানকারী আর রহীম এর অর্থ হল, যিনি বন্দাকে বেহেশত দানকারী, যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ "তোমরা নিরাপদে বেহেশতে প্রবেশ কর"।

রহীম তিনি যিনি মানুষের অন্তরে দয়া করেন। আর রহ্মান তিনি যিনি মানুষের দুঃখ দূর করেন। যিনি মানুষের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করেন, তিনি রহীম। যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তিনি রহ্মান। যিনি মানুষকে গুনাহ্ সমূহ থেকে রক্ষা করে এবাদতের তৌফিক দান করেন, তিনি রহীম। যিনি আখেরাতের বিষয়ে দয়া করেন, তিনি রহীম। যিনি দুনিয়ার জীবনের সকল বিপদাপদ দূর করেন, তিনি রহ্মান।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

তিনিই আল্লাহ্ পাক, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

اَلْمَلِكُ

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ্, যিনি সব কিছুর অধিকর্তা,

اَلْقُدُّوْسُ

পবিত্র, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিখুঁত, নিস্কলংক।

اَلسَّلٰمُ

যিনি শান্তি, সৃষ্টিকে শান্তি দানকারী, মানুষকে নিরাপত্তা দানকারী।

اَلْمُؤْمِنُ

যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে বালা মসিবত থেকে রক্ষা করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ

প্রত্যেকটি বস্তুর যিনি নেগাহবান বা হেফাজতকারী।

اَلْعَزِيْزُ

পরাক্রমশালী, কেউ যার মোকাবেলা করতে পারেনা, সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী।

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

প্রভাবশালী, সর্বোচ্চে অবস্থানকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী, যাঁর সম্মুখে সব কিছু অতি ক্ষুদ্র।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তাদের শরীক বর্ণনা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ

তিনি আল্লাহ পাক, যিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তাঁর ইচ্ছা, হেকমত এবং মর্জি মোতাবেক তিনি সৃষ্টি করেন।

الْبَارِئُ

যিনি কোন নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি নিখুঁত সৃষ্টিকর্তা।

الْمُصَوِّرُ

যিনি রকমারী আকৃতি প্রদানকারী।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

যাঁর জন্যে রয়েছে উত্তম নাম সমূহ।

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আসমান যমীনের সব কিছুই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি মহাজ্ঞানী।

তিরমিযী ও বায়হাকীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের ৯৯টি নাম রয়েছে, যে এ নাম সমূহ কণ্ঠস্থ করে রাখবে সে জান্নাতে যাবে।[১]

১। আল্লাহ পাকের ৯৯টি নাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৮৮-১৯২
পুনশ্চঃ আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম সমূহের বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেকটি নামের আমল সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন, এই লেখকের এনায়েতুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১১-৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুমতাহেনা

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ
وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ
اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (١) اِنْ
يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ
بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ (٢) لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٣)

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) হে মোমেনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য ধর্ম এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছ, যদি তোমরা আমার পথে জেহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের পথে বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ কথাবার্তা

বল? এবং তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, সে সম্পর্কে আমি সর্বাধিক অবগত। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন কাজ করে, সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথ থেকে সরে পড়ে।

(২) যদি তোমরা তাদের কবলে পড়ে যাও, তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে। আর তোমাদের ক্ষতিসাধনে তাদের হস্ত ও রসনা জঘন্যভাবে ব্যবহার করবে। আর তারা কামনা করবে যেন তোমরাও কুফরী কর।

(৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততী কেয়ামতের দিন কোন কাজেই আসবেনা, আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন, আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন।

সূরা মুমতাহেনা প্রসঙ্গে

মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ এ সূরায় ১৩ খানি আয়াত রয়েছে। এতে ৩৪৮টি বাক্য এবং ১,৫১০টি অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

সূরাতুল মুমতাহেনা , এ সূরার অন্য নাম হলো সূরাতুল এমতেহান এবং সূরাতুল মোয়াদ্দা।২

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবীদার হলেও কাফেরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। আর এ সূরায় মোমেনদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা কাফেরদের সঙ্গে কোন প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে।[১]

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা মুমতাহেনা পাঠ করছে, তবে তার শেষ বয়সে উত্তম তওবা নসীব হবে।

অথবা দুশমনের অনিষ্ট সাধন থেকে সে রক্ষা পাবে।

শানে নুযুল

এ সূরার শানে নুযুল হলো, বিখ্যাত সাহাবী হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ)-এর একটি ঘটনা। মক্কার কাফেরদের সঙ্গে ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়েছিল (যার আলোচনা সূরা ফাতহে হয়েছে) পরবর্তীতে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৬৫

কাফেররা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে, এমন অবস্থায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তবে মক্কার কাফেররা বিষয়টি যেন জানতে না পারে, এজন্যে তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই অভিপ্রায় ছিল যে, অতর্কিতে তিনি মক্কায় অভিযান করবেন, যাতে করে রক্তক্ষয় না হয়। আর এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন এভাবে, "হে আল্লাহ্! আমাদের প্রস্তুতির খবর যেন মক্কাবাসী জানতে না পারে"।

একদিকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, অন্যদিকে বিশেষ কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত সাধারণভাবে কেউ জানতেন না যে, এ অভিযান কোথায় হবে।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ) মক্কা অভিযান সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, তাঁর পরিবারবর্গ তখন মক্কায় ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, যদি মক্কার মুশরেকদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কা অভিযান সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তবে হয়তো তারা তাঁর পরিবারবর্গকে উৎপীড়ন-নির্যাতন থেকে রেহাই দেবে এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই প্রতিশ্রুত বিজয় দান করবেন, মক্কার মুশরেকরা পূর্বেই এ অভিযান সম্পর্কে অবগত হলেও মুসলমানদের তেমন কোন ক্ষতি হবেনা, একথা ভেবেই হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ) একজন স্ত্রীলোকের হস্তে মক্কার কাফেরদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, ঐ পত্রে তিনি মক্কার কাফেরদেরকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কা অভিযান সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন, আবু আমর এবনে সফী এবনে হাশেম এবনে আবদে মনাফের সারা নাম্নী বাঁদী মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মোনাওয়ারা এসেছিল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাঁদী সারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে বললো, না। তিনি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি হিজরত করে এসেছ? সে বললো, না। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তুমি কেন এখানে এসেছ? সে বললো, বদরের যুদ্ধে যেহেতু মক্কার বড় বড় নেতারা প্রায় সকলেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাই আমি অত্যন্ত বেশী অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, সারা নাম্নী এই বাঁদীটি ছিল গায়িকা, সুখ-দুঃখে তার ডাক পড়ত, আনন্দঘন

মুহূর্তে সে গান গাইত, কারো মৃত্যু হলে শোক গাঁথা বা মরসীয়া পাঠ করতো, তাই সে বললো, বদরের যুদ্ধের পর এখন আর কেউ আমাকে ডাকেনা, আমি এখানে এসেছি আবদুল মোত্তালেবের বংশধরদের সাহায্য প্রার্থী হয়ে। তখন তারা তাকে সর্ব প্রকার সাহায্য করলেন। এ সময় হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ (রাঃ) বাঁদী সারাকে দশটি দিনার এবং একটি চাদর এ শর্তে দান করলেন, যেন সে তার চিঠিটি মক্কাবাসীর নিকট পৌঁছে দেয়।

হযরত হাতেব এবনে বলতাআর (রাঃ) চিঠি

اما بعد يا معشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فو الله لو جاءكم وحده لنصره الله وانجز له وعده- فانظروا لانفسكم - والسلام

অর্থাৎ হে কোরায়শ গোত্র! হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ভয়াবহ সৈন্য বাহিনী নিয়ে অভিযান করবেন, যা রাতের অন্ধকারের ন্যায় এবং যা বন্যার ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হবে। আল্লাহর শপথ! যদি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন সৈন্যবাহিনী ব্যতীত একাকীও মক্কায় তশরিফ নিয়ে যান, তবু আল্লাহ পাক তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তাঁকে সাহায্য এবং বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অতএব, তোমরা নিজেদের জন্যে যা কল্যাণকর হয় তা চিন্তা কর।

এ পত্র নিয়ে বাদী সারা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করেন এবং হাতেব এবনে আবি বলতাআ (রাঃ) লিখিত পত্র সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত মেকদাদ (রাঃ) এবং হযরত আবু মারসাদ (রাঃ)-কে মক্কাগামী বাঁদী সারার কাছ থেকে ঐ পত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা অশ্বে আরোহন করে রওয়ানা হলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা মক্কার পথে "খাক" নামক বাগানে পৌঁছে যাও, সেখানে একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পাবে, যে উষ্ট্রের উপর আরোহী থাকবে, তার নিকট মুশরেকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হাতেব এবনে আবি বলতাআ'র (রাঃ) পত্র রয়েছে, তোমরা তা নিয়ে আস এবং তাকে যেতে দাও। যদি সে কোন ভাবেই ঐ পত্র প্রদানে সম্মত না হয় তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দাও, হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছেন এবং স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পান, তারা বলেন, তোমার নিকট যে পত্র রয়েছে তা দিয়ে দাও।

সারা শপথ করে বললো, আমার নিকট কোন পত্র নেই। তখন তাঁরা ঐ বাঁদীর মাল-পত্র তল্লাশী চালালেন, কিন্তু তা কোথাও পাওয়া গেলনা।

তখন পত্র ব্যতীতই তাঁদের প্রত্যাবর্তনের অবস্থা হলো। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা মিথ্যাবাদী নই এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও অসত্য কথা বলেননি। তার নিকট অবশ্যই পত্রটি রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) একথা বলে খাপ থেকে তরবারী বের করলেন এবং বললেন, এখনো সময় আছে পত্র বের কর, নচেৎ তোর দেহ তল্লাশী করবো এবং তোকে মৃত্যুদন্ড দেব। স্ত্রীলোকটি যখন দেখল, পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর, তাঁরা যা বলছেন তাই করবেন, তখন সে তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করে দেয়। তাঁরা পত্রটি তার কাছ থেকে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। তাকে আর কিছুই বললেন না এবং ঐ পত্র নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ)-কে তলব করলেন এবং তাঁকে এ পত্র প্রেরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

হযরত হাতেব এবনে বলতাআ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাক জানেন আমি কুফরী করিনি। আমার পরিবারবর্গ মক্কায় রয়েছে, আমি মনে করলাম, যদি আমি মক্কাবাসীর প্রতি একটু এহসান করি তবে তারা আমার পরিবারবর্গের প্রতি জুলুম করবেনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আপনার অভিযানের সাফল্য সুনিশ্চিত, আল্লাহ পাক মক্কাবাসীর প্রতি আযাব নাযিল করবেন, আর আমার পত্র দ্বারা তাদের তেমন কোন উপকার হবেনা।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ)-এর ওজর কবুল করলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তখন দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তাকে সমুচিত শাস্তি দেই। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ) সহ সকল উত্তেজিত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে হাতেব (রাঃ)-কে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন, হে ওমর! হাতেবের অন্তর মুনাফেকীর রোগ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, বরং গাফলতের কারণে তার দ্বারা এ ভুল হয়েছে। বদরের যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্যে সে পরীক্ষিত স্বর্ণ, তাতে কোন খাদ নেই, রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে সাহাবায়ে কেরামের সংশোধন করতেন। আর আল্লাহ পাক তাঁদের সম্পর্কে এ ঘোষণা করেছেনঃ "আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট"।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, এ ঘোষণা চিরন্তন।

যাহোক, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ)-কে ক্ষমা করলেন, কিন্তু ভুল যে হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই, আর এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য সূরা নাযিল হয়েছে। এতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যেন কোন কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে।[১]

তফসীরুল কোরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

কাফের মুশরেকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ

এ আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে একটি বিষয়ে তাগিদ করা হয়েছে যে, মোমেনগণ যেন কখনো মুশরেকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা আমার দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। কাফের ও মুশরেকদেরকে আল্লাহ পাকের দুশমন বলে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এর পাশাপাশি তারা যে মোমেনদেরও দুশমন একথাও আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, তারা সত্য ও ন্যায়ের দুশমন, তারা মানবতার দুশমন, অতএব কোন অবস্থাতেই তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, ঈমানের দাবী হলো, যারা আল্লাহ পাক ও মোমেনদের দুশমন, তাদের সাথে কোন ভাবেই বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যাবেনা, তোমরা কি এমন লোকদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করছো? যারা অস্বীকার করে সেই সত্য-ধর্মকে যা তোমাদের নিকট এসেছে।

আলোচ্য আয়াতের الحق। শব্দটি দ্বারা কোরআনে করীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ যে পবিত্র কোরআন তোমাদের নিকট নাযিল হয়েছে, তাকে তারা অবিশ্বাস করে, শুধু তাই নয়; তারা সত্য ও ন্যায়ের এত বড় দুশমন এবং তারা মানবতার এত জঘন্য শত্রু যে, তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৫-২৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪২৫-২৬
তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৯৬-৯৭

তোমাদেরকে বাড়ী-ঘর এমনকি, দেশ থেকে বহিঃস্কার করেছে। যে রসূল আগমন করেছেন রহমতুল্লিল আলামীন রূপে, যাঁর আবির্ভাব হয়েছে বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্যে, যারা তাঁকে এবং তোমাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে, এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রশ্নই ওঠেনা, আর তাদের এ মানবতা বিরোধী কাজের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছ যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

আর কাফেররা যে মোমেনদের প্রতি নির্যাতন করেছিল, তার কারণ এই যে, তারা পরাক্রমশালী স্বয়ং প্রশংসিত আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে। অতএব, সত্য ও ন্যায়ের এমন শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ, তাদের সাথে বন্ধুত্বের কথা চিন্তা করাও পীড়াদায়ক।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

যদি তোমরা সত্য সত্যই আমার রাহে জেহাদে বের হয়ে থাকে, আর যদি আমার সন্তুষ্টি লাভই তোমাদের কাম্য হয়, তবে কখনো কাফের মুশরেকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, তোমরা গোপনে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করে থাক, অথচ তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর, আমি তা সবচেয়ে বেশী জানি। যে কাফের মুশরেকদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে, সে নিঃসন্দেহে সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়ে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত হাতেব এবনে বলতাআ' (রাঃ) কাফেরদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অথবা মুনাফেকীর কারণে মক্কার কাফেরদেরকে এ চিঠি লিখেননি; বরং তিনি মনে করেছিলেন যে, তাদেরকে এ চিঠি দিলে তারা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি জুলুম অত্যাচার করবেনা। অথচ এ ছিল তাঁর ভুল ধারণা, এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ওজর কবুল করেছেন, তাঁকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু কাজটি যে ভুল এবং মারাত্মক ভুল হয়েছে, এজন্যে সমগ্র মুসলিম জাতিকে আলোচ্য আয়াতে এমন ভুল না করার তাগিদ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ' (রাঃ) গোপনে পত্র দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন গোপন বিষয়ই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন থাকেনা, সমগ্র বিশ্ব জগৎ আল্লাহ্ পাকের সম্মুখেই রয়েছে, অতএব আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন

কিছুই গোপন নেই। এতদসত্ত্বেও যদি কখনো কোন মুসলমান কাফের মুশরেকদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে, তবে নিঃসন্দেহে সে পথভ্রষ্ট, সে আদর্শচ্যুত, তাই পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

"আর তোমাদের মধ্যে যে তা করবে, সে নিঃসন্দেহে সরল-সঠিক পথ থেকে দূরে সড়ে পড়ল"।

কাফের ও মুশরেকদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করাও ভুল যে, তারা তোমাদের প্রতি নির্দয় নিষ্ঠুর হবেনা, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْآ اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ

যদি তোমরা তাদের কবলে পড়ে যাও তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে, আর তোমাদের ক্ষতি সাধনে তাদের হস্ত ও রসনা জঘন্য ভাবে ব্যবহার করবে অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে, তোমাদেরকে গাল মন্দ দেবে, তোমরা যতই বন্ধুত্ব প্রকাশ কর, তা দ্বারা তোমাদের কোন উপকার হবেনা। তারা তোমাদের শত্রুই থাকবে এবং তোমাদের ক্ষতি সাধনে সর্বদা থাকবে তৎপর। শুধু তাই নয়; বরং এ আকাঙ্ক্ষা করবে, যেন তোমরাও তাদের ন্যায় কাফের হয়ে যাও, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ

"তারা এ আকাঙ্ক্ষা করে যে তোমরাও কাফের হয়ে যাও"।

অর্থাৎ তারা যে শুধু দুনিয়াতে তোমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করবে তাই নয়; বরং আখেরাতে যেন তোমরা চির দিন দোযখের শাস্তি ভোগ কর, তাই তাদের কাম্য।

বস্তুতঃ এ আয়াতে মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ঘোষিত হয়েছে যে, পৃথিবীর অমুসলিম জাতি সমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অবলম্বন করতে হবে, তার দিক নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম জাতির সোনালী যুগে পবিত্র কোরআন ঘোষিত এ নীতিই অনুসৃত হয়েছিল।

যেহেতু নিজের পরিবারবর্গের, সন্তান-সন্ততির কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্টা করা হয়েছিল, তাই সে সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ আজ আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি রক্ষা করতে চাও? মনে রেখ! কেয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসবেনা, কাজে আসবে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য, অতএব আল্লাহ্ পাকের দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হওয়া, আর এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করেও লাভ হবেনা, কেননা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।

অতএব, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি কামনা কর, তাঁর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হও, আল্লাহ্ পাকই ঈমানদারকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর কাফেরদের দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। অতএব, সতর্ক হও! সাবধান থাক!!

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا
بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا
قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٤﴾

তরজমা

(৪) তোমাদের জন্যে রয়েছে ইব্রাহীম এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলে, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে যাদের বন্দেগী কর, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করেছি, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্যে রয়েছে সুস্পষ্ট শত্রুতা এবং বিদ্বেষ, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান

আন, তবে স্বীয় পিতার সাথে ইব্রাহীমের এতটুকুই কথা হয়েছিল যে, আমি তোমার জন্যে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, আর আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে তোমার কোন প্রকার উপকার লাভের অধিকার আমার নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরাতো আপনারই প্রতি ভরসা রাখি এবং আপনার দিকেই মনোনিবেশ করছি, আর আপনার দিকেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এ মর্মে যে, কোন মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ্ পাকের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করার অনুমতি নেই। আর এ আয়াত সমূহে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। প্রকৃত মোমেন কখনও কাফের মুশরেকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেনা। এ বিধান বিশেষ কোন যুগের জন্যে নয়; বরং সর্বকালের সকল দেশ ও পরিবেশের মানুষের জন্যে। এ পর্যায়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মহান আদর্শের অনুসরণ করা মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ তাদের জাতিকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, তোমাদের এবং তোমাদের উপাস্যদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, আর যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক ও তাঁর নাফরমানী পরিহার না কর, সে পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যেদিন তোমরা শেরক ও নাফরমানী পরিহার করবে, এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনবে, সেদিনই তোমাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব করা সম্ভব হবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা এবং তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন শুধু মূর্তি পূজাই করতো না; বরং মূর্তি নির্মাণ করতো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন দেখলেন, তাঁর পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবেনা, তখন তিনি তাদের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করলেন, তিনি ছিলেন ইরাকের অধিবাসী, তিনি দেশ ছেড়ে দিলেন, মিসর হয়ে সিরিয়া চলে গেলেন। যাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল, তারা যেহেতু কাফের ছিল, আল্লাহ পাকের দুশমন এবং মুসলমানদের দুশমন, তাই তিনি তাদেরকে

পরিত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেন না। যখন তিনি দেশ ছেড়ে দিচ্ছিলেন, তখনও তিনি একবারও পেছন ফিরে তাকাননি। এটি ছিল ঈমানের দাবী, ঈমানের মর্যাদা, আর এ মর্যাদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। অতএব, মুসলমান মাত্রকে তৌহীদ বিরোধী লোকের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করা কর্তব্য।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেনঃ

لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ

"আমি তোমার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তোমার জন্যে কোন প্রকার উপকার লাভের অধিকার আমার নেই"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে এর বেশী কিছু বলেননি। আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন, আমি শুধু দোয়া করতে পারি, এর বেশি কিছু নয়।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত অবগত হননি, ততক্ষণ পর্যন্তই তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু যখনই তিনি পিতার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, তখনই তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এরপর এভাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন,

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

হে পরওয়ারদেগার! তোমারই প্রতি আমাদের ভরসা, আর তোমারই দিকে আমরা মনোনিবেশ করি, হে পরওয়ারদেগার! মনে প্রাণে আমরা তোমাকেই চাই, আর অবশেষে তোমারই নিকট আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তি হলো ঈমান। যার মধ্যে ঈমান আছে, যে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, তার সাথেই হবে ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্ব। কিন্তু যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, কাফের মুশরেক, তার সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারেনা। যুগ যুগ ধরে এ নিয়মই কার্যকর রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ অতুলনীয় আদর্শই পেশ করেছেন। সে যুগে কোন কোন মোমেন তার মুশরেক পিতা মাতার জন্য দোয়া করতেন এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাদের এ কর্মের দলিল হিসেবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উল্লেখ করতেন, কেননা তিনি তাঁর পিতার জন্যে দোয়া করেছিলেন। তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের এ আয়াত নাযিল করেছেন।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

"কোন নবী এবং মোমেনদের জন্যে উচিত নয় মুশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা"।

এর দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে মুশরেক পিতা-মাতার জন্যে কোন মুসলমানের দোয়া করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), মোকাতেল এবনে হাইয়্যান (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করার পর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এভাবে আরজী পেশ করেছেন,

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

(হে আল্লাহ!) আমাদের যাবতীয় কর্মকান্ডে তোমারই প্রতি ভরসা রাখি, তোমারই সমীপে আশা রাখি, তোমারই দিকে মনোনিবেশ করি। পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে তোমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ
يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۗ
وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ
تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

তরজমা

(৫) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফেরদের উৎপীড়নের পাত্র করোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিও, নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬) নিশ্চয় তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে তথা এমন লোকদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাক এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর যারা বিমুখ হবে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ পাকের তাতে কিছুই যায় আসেনা, আল্লাহ্ পাক চির বেনিয়াজ (তিনি সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত), তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

(৭) যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ পাক তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন আর আল্লাহ্ পাক সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৮) যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি উদারতা মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ যেভাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন, তার উল্লেখ রয়েছে।

আর এ আয়াতেও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আরও কিছু দোয়া স্থান পেয়েছে, যাতে করে সকল যুগের মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এভাবে, এ ভাষায় দোয়া করতে পারে। এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে কাফেরদের উৎপীড়নের পাত্র করোনা"।

অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমাদের উপর বিজয় লাভের সুযোগ দিওনা, যেন তারা আমাদের প্রতি উৎপীড়ন-নির্যাতন করতে না পারে, তথা আমাদের উপর কাফেরদের পরীক্ষা নিওনা, কেননা তারা যদি আমাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে, তবে তা তাদের প্রতি কঠোর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ হবে।

তফসীরকার জুযায (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো কাফেরদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করোনা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো হে পরওয়ারদেগার! কাফেরদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দিওনা, এমন অবস্থায় তারা মনে করবে যে তারা সত্যের উপর রয়েছে।

আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! কাফেরদের দ্বারা আমাদেরকে আযাব দিওনা, এমন অবস্থায় কাফেররা বলবে, যদি মুসলমানগণ সত্যের উপর থাকতো, তবে তারা বিপদগ্রস্ত হতোনা, আর হে পরওয়ারদেগার! তোমার পক্ষ থেকেও আমাদের প্রতি আযাব নাযিল করোনা। আর কাফেরদেরকে আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দিওনা, এক কথায় কাফেরদের জুলুম অত্যাচার থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

وَاغْفِرْ لَنَا

আর আমাদের যাবতীয় গুনাহ দোষ-ক্রটি মাফ করে দিও, আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিও।

এর ব্যাখ্যায় হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) লিখেছেন, কখনও কখনও বাতিলপন্থীদের তরফ থেকে সত্যের অনুসারীদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হয়, আর তা হয় মোমেনদের দ্বারা সংঘঠিত পাপাচারের কারণে, তাদের জানা অজানা গুনাহ সমূহের কারণে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং বিপদমুক্ত হওয়াই হলো একমাত্র পথ।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اذا عصانى من يعرفنى سلطت عليهم من لا يعرفنى

যারা আমাকে চেনে, তথা আমার প্রতি ঈমান আনে, তারাই যখন আমার নাফরমান হয়, ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন আমি এমন লোকদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেই, যারা আমাকে চেনেনা।

অর্থাৎ কাফেরদেরকে পাপাচারী মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেই। বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলিম জাতি, অমুসলিমদের দ্বারা অত্যাচারিত উৎপীড়িত। এর বড় কারণ হলো মুসলমানদের পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, গুনাহর কাজে আকৃষ্ট হওয়া, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ কাফেরদের জুলুম থেকে রক্ষা করার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নিজেদের গুনাহ এবং যাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হওয়ার তা'লীম দেয়া হয়েছে।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী, যাকে তুমি পানাহ দাও, যাকে তুমি রক্ষা কর, তাকে কেউ কষ্ট দিতে পারেনা, কেননা তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তুমি বিজ্ঞানময়, তোমার প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। হে

পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে কাফেরদের জুলুমের শিকার হতে দিওনা, আর আমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিও, তোমার আযাব থেকেও আমাদেরকে রক্ষা কর।[১]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط
وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

"নিশ্চয় তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে তথা এমন লোকদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাক এবং কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে। আর যারা বিমুখ হবে তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ্ পাকের তাতে কিছুই যায় আসে না, আল্লাহ্ পাক চির বেনিয়াজ (তিনি সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত), তিনি স্বয়ং প্রশংসিত"।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের উত্তম আদর্শ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শ ছিল আল্লাহ্ পাকের দুশমনের বিরোধিতা, আর যে আল্লাহ্ পাককে ভালবাসে তার সাথে ভালবাসা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ নীতিতে অটল, অবিচল ছিলেন। তাঁর পিতা আজর মূর্তি নির্মাতা এবং মুশরেক ছিল এবং শেরক পরিহার করতে রাজি হয়নি বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তওহীদের প্রতি সুদৃঢ় ঈমানের কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনকেও বর্জন করেছিলেন, এমনকি তাঁর দেশ ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়া গমন করেছিলেন। সত্যের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা বা একীন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা করেছেন মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর তাঁর কবিতার একটি পংক্তিতেঃ

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا ہے میرے لئے

'তওহীদ হলো এই যে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন একথা ঘোষণা করবেন যে আমার এ বন্দা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের উপর শুধু আমার জন্যে অসন্তুষ্ট'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কোন কিছুই তাঁর নিকট আকর্ষণীয় নয়। এক আল্লাহ্ পাকের জন্যে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৩০২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৭৩
তফসীরে আল বাহরুল মুহীত খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৫৫

সব কিছু পরিত্যাগ করেছে, সকল আরামকে সে হারাম করেছে, বর্ণনাতীত ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। এ মর্মবাণীকে হযরত গওসুল আযম হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

نه خواہم خوبئ دنیا نه خواہم راحت عقبی
اگر خواہم ترا خواہم نه خواہم باغ رضوان را

"আমি দুনিয়ার সৌন্দর্য চাই না, আখেরাতের আরামও আমি চাই না, যদি কিছু চাই তবে শুধু তোমাকেই চাই, এমনকি বেহেশতের বাগানও আমার কাম্য নয়"।

আল্লাহ পাকের প্রেমের এবং তওহীদে বিশ্বাসের এ উচ্চতর মকামেই অবস্থান করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। আর এজন্যেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে মানব জাতির জন্যে আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এর জন্যে আলোচ্য আয়াতে একটি পূর্ব শর্তও রয়েছে, তা হলোঃ

لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবন ধারায়, আকীদা ও বিশ্বাসে উত্তম নমুনা রয়েছে তাদের জন্যে যারা বিশ্বাস করে যে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতেই হবে এবং প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ দিতে হবে। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, ঈমানের দাবী হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করা। যাঁরা তাঁর আদর্শের অনুসরণ করবে তাঁদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনন্ত অসীম নেয়ামত।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

এতদসত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয় তবে তাদের জানা উচিত যে আল্লাহ্ পাক চির বেনিয়াজ; কারো এবাদতের তাঁর প্রয়োজন নেই, কারো কাছে তাঁর কোন ঠেকা নেই, কারো প্রশংসারও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় রত রয়েছে এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আছে। আর যারা আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করে তারা নিজেদের উপকারার্থেই করে।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ

"যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, আর আল্লাহ্ পাক সবই করতে পারেন"।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন কাফেরদের সঙ্গে শত্রুতা রাখার আদেশ দিয়েছেন তখন মুসলমানগণ কাফের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছেন। কিন্তু আপনজনদের মায়া থেকে মন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধনের কারণে তাঁদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে কিছুটা আপনত্বের ভাব বর্তমান ছিল। তাই মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ্ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলে অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে দিতে পারেন। আল্লাহ পাকের জন্যে এটি কোন কঠিন কাজ নয় এবং বাস্তবেও তা হয়েছিল, যেমন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমন আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবার সঙ্গে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়েছিল। তিনি পূর্বেই মক্কা মোয়াজ্জমায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নির্যাতিত হয়ে তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ এবনে জাহাশসহ্ অবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তাঁর স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ অবস্থায় হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। ঐ সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর মাধ্যমে তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ নাজ্জাশী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। অবশেষে এ শুভ কাজ যথা সময়ে সুসম্পন্ন হয়। এ ঘটনাটি ঘটে সপ্তম হিজরীতে। আর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান সহ্ মক্কার সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই ইসলাম কবুল করেন। আর এভাবে আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁর ওয়াদা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণ করেন। যারা মুসলমানদের শত্রু ছিল তারাই অবশেষে বন্ধুতে পরিণত হন।

وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ

আর আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল"।

যারা বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মক্কার কাফেরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে বা যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তাদের সকল দোষ-ত্রুটি আল্লাহ্ পাক মাফ করে দিয়েছেন, কেননা তিনি অত্যন্ত দয়াবান। তাঁর অনন্ত অসীম দয়া থেকে কেউ মাহরূম হয় না।[১]

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা

এর আরো একটি অর্থ হতে পারে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে তের বছর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নির্যাতীত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন, হিজরতের পরও সুদীর্ঘ আটটি বছর যাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যারা ছিল শত্রু, তারা আজ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এত সুদীর্ঘ সময়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আজীবন ইসলামের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁর রহমত ও মাগফেরাত থেকে তাঁরাও বঞ্চিত হবেন না। মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুখ্য বিষয় হলো কে আন্তরিক ভাবে ইসলাম কবুল করেছে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ করেছে, অতীতে কে কি করেছে এবং কতদিন পর ইসলাম গ্রহণ করেছে সবই এখানে গৌণ, কেননা "আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

আল্লাহ্ পাকের দরবারের এ ঘোষণা চিরন্তন,

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(সূরা যুমার, পারা-২৪)

"হে আমার সেই বন্দাগণ! যারা পাপাচারের কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি অতীব দয়াবান"।

একটি সুসংবাদ

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সূরার শুরু থেকে একাধিক আয়াতে আল্লাহর দুশমন তথা কাফের মুশরেকদের প্রতি শত্রুতা পোষণের নির্দেশ ছিল। এ পর্যায়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শের অনুসরণের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এ বিষয়ে সুসংবাদ রয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানগণ বিরাট সাফল্য

লাভ করবে, দুশমনদের উপর তারা প্রাধান্য বিস্তার করবে। অনেক কাফের মুসলমানদের প্রাণের শত্রু, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে তাদের নিজেদের ভিটামাটি ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, তারাই ঈমান আনয়নের মাধ্যমে অচিরেই মুসলমানদের আপনজনে পরিণত হবে, এটি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং তাঁর মর্জির ব্যাপার যা মক্কা বিজয়ের সময় প্রকাশ পেয়েছে।

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি উদারতা মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নিষেধ করেন না"।

শানে নুযুল

হেশাম এবনে ওরওয়া ফাতেমা বিনতুল মুনজের থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) বলেছেন, হুদায়বিয়ার চুক্তির পর আমার মা যিনি মুশরেক ছিলেন, তিনি আমার নিকট আসলেন। তিনি আমার নিকট সাহায্য কামনা করছিলেন। তাই আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমীপে আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার মা এসেছেন, তিনি মুশরেক, তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমি তাঁকে সাহায্য করি, আমি কি তাঁর সাথে এভাবে ভাল ব্যবহার করবো? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি তার সাথে সেলায়ে রহমী কর, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ..... اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, বাড়ী-ঘর থেকে তোমাদের বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি উদারতা মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন"।

ইসলামে উদারতা ও মহানুভবতা:

এ ঘোষণা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, ইসলাম উদারতা ও মহানুভবতার মহান শিক্ষা দেয়। কাফের হলেই যে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, ইসলাম এমন শিক্ষা দেয় না; বরং সামাজিক ন্যায়-নীতি রক্ষা করা, পরস্পরের প্রতি ভাল ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যারা কাফের মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও অসহায়, নিরূপায়, নিরীহ, তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি সত্য, কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণও করেনি, মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে উচ্ছেদও করেনি, তাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করা অবৈধ নয়।

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা ইমাম আহমদ, বাজ্যার এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সূত্রে উপস্থাপন করেছেন। কাতীলা বিনতে আবদুল ওজ্জা জাহেলীয়াতের যুগে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) তারই কন্যা ছিলেন। কাতীলা তার কন্যা হযরত আসমার (রাঃ) নিকট আসে এবং কন্যার জন্যে কিছু তোহফাও নিয়ে আসে। হযরত আসমা (রাঃ) তোহ্ফা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এমনকি তাকে গৃহে প্রবেশ করারও অনুমতি দিলেন না। তখন হযরত আসমা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ খবর পাঠালেন যে, এ ব্যাপারে হযরত রসূলে করীম স্যাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে এ খবর দিলেন যে, কাতীলার তোহ্ফা গ্রহণ কর এবং তাকে স্বগৃহে স্থান দাও, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বণী খোজায়া গোত্র সম্পর্কে, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এ চুক্তি করেছিল যে, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন লোককে সাহায্যও করবো না। আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাদের সাথে উদার নীতি গ্রহণের অনুমতি দান করেন।

যারা মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেনি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র ধারণ করেনি, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় এমন লোকও ছিল, তাদের সাথে উদারতা মহানুভবতা প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

মূলতঃ ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। ন্যায় বিচার কায়েম করা ইসলামের শিক্ষা। যারা ইসলামের উত্থানকে বাধা দেয়না, তাদের সাথে উদার ব্যবহারের নির্দেশই দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন"।

إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ
الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى
اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ
اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ
اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ
اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ
وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ
اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

তরজমা

(৯) আল্লাহ পাক শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। আর যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাইতো নিঃসন্দেহে মহাপাপী।

(১০) হে মোমেনগণ! যখন তোমাদের নিকট মোমেন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তাদেরকে যাচাই করে নাও, আল্লাহ পাক তাদের ঈমান সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানেন। এরপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা প্রকৃত মোমেন, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মোমেন নারীগণ কাফেরদের জন্যে হালাল নয়, আর কাফেররাও তাদের জন্যে হালাল নয়। আর কাফেররা যা কিছু ব্যবহার করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা তাদেরকে তাদের দেন মোহর আদায় করে বিবাহ করতে পার, এতে কোন অপরাধ নেই। আর তোমরা কাফের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখোনা, তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চেয়ে নেবে, আর কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তারা ফেরত চেয়ে নেবে। এটি আল্লাহ পাকের হুকুম। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি, এমনকি মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন, উৎপীড়নকারীদেরকে সহযোগিতাও করেনি, এমন কাফেরদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেন না।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে অথবা যুদ্ধবাজ কাফেরদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে, এমন কাফেরদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করছেন। এ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যারা এমন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করে, নিঃসন্দেহে তারা মহাপাপী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ

"হে মোমেনগণ! যখন তোমাদের নিকট মোমেন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তাদেরকে যাচাই করে নাও, আল্লাহ্ পাক তাদের ঈমান সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানেন। এরপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা প্রকৃত মোমেন, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মোমেন নারীগণ কাফেরদের জন্যে হালাল নয়, আর কাফেররাও তাদের জন্যে হালাল নয়"।

শানে নুযুল

ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, যদি কাফেরদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের নিকট চলে যায়, তবে তাকে মক্কার কাফেরদের নিকট ফেরত দিতে হবে। এ শর্তের কারণেই হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন, তিনি অত্যন্ত মজলুম ছিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেন। এমনিভাবে আরও কিছু লোক কাফেরদের নিকট থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

খেদমতে হাযির হন, কিন্তু তিনি চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাদেরকেও ফেরত পাঠিয়ে দেন। ঐ চুক্তিতে শুধু পুরুষদের কথা ছিল, নারীদের কথা উল্লেখ হয়নি। কিন্তু সে সময় কয়েকজন নারীও হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারার উপস্থিত হন। তন্মধ্যে ছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা এবনে আবি মুয়ীত। তিনি হিজরত করে মদীনা শরীফ উপস্থিত হন। তাঁর দু' ভাই আম্মারা ও ওলীদ তাঁকে ফেরত নেয়ার জন্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, যদি কোন মুসলিম মহিলা মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করে আসে, তবে তাদেরকে যাচাই করে নাও, কি কারণে তারা এসেছে তা পরীক্ষা কর। আল্লাহ পাক তাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাধিক অবগত। যদি তোমাদের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, তারা প্রকৃত মোমেন, তবে এমন মহিলাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না।

فَامْتَحِنُوْهُنَّ

অর্থাৎ যারা হিজরত করে আসে, এমন মহিলাদেরকে তোমরা পরীক্ষা কর। এ পরীক্ষা হতো দু'টি বিষয়ের (১) যে হিজরত করে এসেছে সে প্রকৃত মোমেন কি-না, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাসী কি-না এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে কি-না? (২) হিজরতের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা, অর্থাৎ কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে? নাকি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যারা হিজরত করে মদীনার আসতেন, এমন মহিলাদেরকে কিভাবে পরীক্ষা করা হতো? তিনি বলেছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকের শপথ করে এ প্রশ্নের জবাব দিতে বলা হতো যে, স্বীয় স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে হিজরত করেনিতো? অথবা দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে কিংবা জাগতিক কোন উদ্দেশ্যে এ সফর করেনিতো? মোহাজের মহিলাদের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি। এর পাশাপাশি তাদের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া হতো, তৌহীদ ও রেসালাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে কি-না? যদি পরীক্ষা করে জানা যেত যে, ঈমান আনয়নের কারণেই হিজরত করতে হয়েছে, তবে এমন মহিলাদের জন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ

তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবেনা, কেননা মোমেন হওয়ার কারণে কাফেররা তাদের জন্যে হালাল নয়, তারাও কাফেরদের জন্যে হালাল নয়।[১]

১। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৭৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হোদায়বিয়া নামক স্থানে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সাবইয়া আসলামীয়া বিনতে হারেস নামক মহিলা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মুসলমান হয়ে হাযির হয়। তার কিছুক্ষণ পরই ঐ মহিলার কাফের স্বামী মাখজুমী বা সাঈফী এবনে রাহেব হাযির হয়ে আরজ করে যে, আমার স্ত্রীকে আমার নিকট ফেরত দিন, কেননা আপনি এ শর্ত মেনে নিয়েছেন, যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে আপনার নিকট যায়, আপনি তাকে ফেরত দেবেন, সে মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এভাবে মুসলিম মহিলাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত না দেয়ার নির্দেশ জারী হয়।

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, আমাকে এজিদ এবনে হাবিব বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত উমায়মা বিনতে বশর অথবা আবু হেসান এবনে ওয়াহদাহ সম্পর্কে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আলোচ্য আয়াতের কারণে ঐ মহিলাকে ফেরত দানের আবেদন মঞ্জুর করেননি।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি একজন কাফেরের দেশে, আরেক জন মুসলিম দেশে থাকে আর এমন অবস্থায় কাফের স্বামীর স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম দেশে আসে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মুসলমানগণ তাদের দেন মোহর আদায় করে যথারীতি তাদেরকে বিবাহ করতে পারে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ

এবং তোমরা তাদেরকে তাদের দেন মোহর আদায় করে বিবাহ করতে পার, এতে কোন অপরাধ নেই, এমন অবস্থায় সে স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামী তাকে যে দেনমোহর আদায় করেছিল, সেই পরিমাণ অর্থ তার বর্তমান স্বামী পূর্ববর্তী স্বামীকে আদায় করবে, আর বর্তমান বিয়েতে যে দেন মোহর ধার্য হবে তা স্ত্রীকেই দিতে হবে।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

"আর তোমরা কাফের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রেখোনা"।

অর্থাৎ কোন মুসলমানের স্ত্রী যদি কাফের থেকে যায়, তবে মুসলমানের কর্তব্য হল, ঐ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা। কাফের থাকার কারণে স্বামীর জন্যে ঐ স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। এমন অবস্থায় যদি কোন কাফের ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, তবে মুসলমান স্বামী ঐ স্ত্রীকে যে দেন মোহর আদায় করেছে তা তার কাফের স্বামী থেকে চেয়ে নেবে। ঐ পরিমাণ অর্থ মুসলমান স্বামীকে ফেরত দিতে কাফের স্বামী বাধ্য থাকবে।

اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

(যখন তোমরা তাদের দেন মোহর আদায় কর), অর্থাৎ হিজরতকারী মহিলাদের কাফের স্বামীদেরকে তাদের প্রদত্ত দেনমোহর ফেরত দিতে হবে, এরপর তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হলে নতুন করে তাদের দেনমোহর আদায় করা একান্ত জরুরী।

কালবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী মুশরেকদের সঙ্গেই থেকে যায়। তখন وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (আর তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখোনা) আয়াতখানি নাযিল হয়।

অর্থাৎ কোন মুসলমানের স্ত্রী যদি কাফের থেকে যায়, তবে ঐ মুসলমানের কর্তব্য হবে কাফের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা, কেননা কাফের হওয়ার কারণে ঐ স্ত্রীলোকটি মুসলমান স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়।

আল্লামা বগভী (রঃ) জুহরীর (রঃ) সূত্রে লিখেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর মুশরেক দু'জন স্ত্রীকেই তালাক দিয়ে দিলেন, তারা উভয়ে তখন মক্কাতেই রয়ে যায়। তন্মধ্যে একজন কারীনা বিনতে আবি উমাইয়া এবনে মগীরাকে মাবিয়া বিবাহ করেন, তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুম খাজাইয়া বিনতে আমর এবনে জারদাল ছিল হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর মাতা। তাকে আবু জোহায়েম এবনে হোজাফা এবনে গানেম নামক একজন মুশরেক বিবাহ করে।

আরদা বিনতে রবীয়া এবনে হারেস এবনে আবদুল মোত্তালেব ছিল হযরত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহর স্ত্রী। তালহা (রাঃ) হিজরত করে মদীনা শরীফ চলে আসেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তখন খালেদ এবনে সাদ এবনে আস এবনে উমাইয়া তাকে বিয়ে করে।

শা'বী বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নব আবুল আস এবনে রবীর স্ত্রী ছিলেন। মোমেন হওয়ার কারণে তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট চলে আসেন। আবুল আস মুশরেক অবস্থায় মক্কাতেই রয়ে যায়। অবশ্য কিছুদিন পর আবুল আস মুসলমান হন এবং মদীনা শরীফে আসেন।

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

এসবই আল্লাহ পাকের বিধান, যা অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ পাকই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আর আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি প্রজ্ঞাময়, তাই তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, মানব জাতির জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর, কেননা তিনি মানব জাতির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, যা তোমাদের জন্যে উপকারী হয়, তাঁরই নির্দেশ প্রদান করেন তিনি।

অতএব, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে, তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সফলকাম হয়।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করে, তাদের জীবন সাধনা শুধু যে ব্যর্থ হয় তাই নয়; বরং তারা হয় কোপগ্রস্ত।[১]

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا
الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ
اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ⑪ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا
يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ
اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑫ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ
الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ⑬

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৩৮-৩৯

তরজমা

(১১) আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফেরদের মাঝে থেকে যাওয়ার কারণে তোমাদের হস্তগত না হয় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তবে যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে এবং তোমরা সেই আল্লাহ্ পাককে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমাদের ঈমান রয়েছে।

(১২) হে নবী! মোমেন নারীগণ যখন এ মর্মে আপনার নিকট বয়আত করতে আসে যে, তারা কোন কিছুকেই আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হবেনা, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং শরীয়তের বিধান সমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তবে আপনি তাদের বয়আত গ্রহণ করুন, আর তাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৩) হে মোমেনগণ! যাদের উপর আল্লাহ্ পাকের গজব আপতিত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করোনা, তারা তো আখেরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন কাফেররা হতাশ হয়েছে সমাধিস্থ লোকদের সম্পর্কে।

তফসীরুল কোরআন

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ

পূর্ববর্তী আয়াতে এ আদেশ দেয়া হয় যে, কোন মুসলিম মহিলা যদি হিজরত করে চলে আসে, তবে মুসলমানগণ তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, এ শর্তে যে ঐ মহিলার পূর্ববর্তী স্বামী তাকে যে দেন মোহর দিয়েছিল, তা উক্ত স্বামীকে ফেরত দিতে হবে। আর বিবাহের সময় তাকে পুনরায় দেন মোহর দিতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোন মুসলিম মহিলা মুরতাদ হয়ে কাফেরদের নিকট চলে যায়, তবে ঐ মহিলাকে তার স্বামী যে দেন মোহর দিয়েছিল, তা তার নতুন কাফের স্বামী থেকে ফেরত নেবে। মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের এ হুকুম পালন করেন, আর যে সব মুসলিম মহিলা তাদের কাফের স্বামীদের পরিত্যাগ করে মুসলমানদের নিকট এসেছে, তাকে প্রদত্ত দেন মোহর কাফের স্বামীকে আদায় করেছেন। কিন্তু কাফেররা এ বিধান মানেনি, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এবনে আবি হাতেম, হাসান (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ানের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উম্মুল হাকাম মুরতাদ হয়ে যায় এবং একজন সাকাফী ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়। বর্ণিত আছে যে, উম্মুল হাকাম ব্যতীত ইসলাম গ্রহণের পর আর কোন স্ত্রীলোক মুরতাদ হয়নি।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যদি কোন মুসলমানের কাফের স্ত্রী কাফেরদের নিকট চলে যায় এবং কাফেররা সেই স্ত্রীর দেন মোহর বাবদ প্রদত্ত অর্থ তার মুসলিম স্বামীকে না দেয়, তবে যখন এমন সুযোগ আসে যে, কোন কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তবে ঐ স্ত্রীকে প্রদত্ত দেন মোহরের অর্থ কাফেরকে দেবেনা; বরং উক্ত স্বামীকে দিয়ে দেবে, যার স্ত্রী কাফেরের নিকট চলে গেছে এবং কাফের তার স্ত্রীকে দেয়া দেন মোহর ঐ স্ত্রীকে দেয়নি।

মানবিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট নমুনা

যদি কাফেরের প্রদত্ত দেন মোহরের পরিমাণ মুসলমানের প্রদত্ত দেন মোহরের অধিক হয়, তবে সে অতিরিক্ত অর্থ ঐ কাফেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এমনকি যদি তার সামর্থ না থাকে তবে বায়তুল মাল তথা মুসলমানদের সরকারী তহবিল থেকে ঐ বাড়তি অর্থ আদায় করতে হবে। এটি হল মুসলমানদের ন্যায়বিচার। শত্রুর সঙ্গেও ন্যায়বিচার করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম। মানবিক মূল্যবোধের এমন উৎকৃষ্ট নমুনা পৃথিবীর কোন ধর্মে বা কোন মতবাদে খুঁজেও পাওয়া যাবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ছয়জন মোহাজের স্ত্রীলোক মুশরেকদের নিকট চলে গিয়েছিল, অবশ্য পরে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের স্বামীদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাদের প্রদত্ত দেনমোহর আদায় করেন, কেননা আলোচ্য আয়াতে সরকারী তহবিল থেকে দেনমোহর আদায়ের নির্দেশ রয়েছে।

فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا

অর্থাৎ মুসলমানদের স্ত্রীরা যদি কাফেরদের নিকট চলে যায়, তবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে যে অর্থ-সম্পদ মালে গণিমত হিসাবে অর্জিত হয়, তা থেকে ঐ স্বামীদেরকে তাদের প্রদত্ত দেন মোহর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। আর এ কারণেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালে গণিমত থেকে ছয়জন স্ত্রীলোককে প্রদত্ত দেন মোহর তাদের স্বামীদেরকে আদায় করা বিধান দিয়েছেন। এ ছয়জন হলেনঃ

(১) উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান, এর স্বামী হল ইয়াজ এবনে সাদ্দাদ ফহরী,

(২) হযরত উম্মে সালমার ভগ্নি ফাতেমা বিনতে আবি উমাইয়া এবনে মুগীরা, যে হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন

হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন স্ত্রী হিজরত করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়।

(৩) বরোয় বিনতে আকাবা, তার স্বামী হল সাম্মাছ এবনে ওসমান,

(৪) আজ্জা বিনতে আবদুল ওজ্জা বিন ফোজলা, আমর এবনে আবদুদের স্ত্রী,

(৫) হিন্দা বিনতে আবু জেহেল বিনতে হেসাম, তার স্বামী ছিল হিসাম এবনে আস্ এবনে ওয়ায়েল,

(৬) উম্মে কুলসুম বিনতে খারদাল, সে হযরত ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিল,

যেহেতু কোন মুসলিম মহিলা যদি কাফের স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তবে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ

অর্থাৎ হিজরতকারিনী মুসলিম মহিলাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিওনা।

স্ত্রীকে কাফের স্বামীর নিকট ফেরত দেয়া নিষিদ্ধ হয়েছে, তাই ঐ স্ত্রীকে প্রদত্ত দেনমোহর ফেরত দেয়া অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হুদায়বিয়ার চুক্তির পর যদি কোন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে আসতো, তবে চুক্তি মোতাবেক তাকে ফেরত দেয়া হতো। কিন্তু কোন নারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করতো তবে তাকে ফেরত না দেয়ার নির্দেশ ছিল। নারী ও পুরুষের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণ এই, যদি কোন পুরুষকে ফেরত দেয়া হয়, তবে তাকে হুমকি ধমকী দিয়ে কাফের বানানো সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, নারীরা দুর্বল সৃষ্টি, তাদেরকে শারীরিক মানসিক কষ্ট দিয়ে পথভ্রষ্ট করা তথা মুরতাদ বানানো সহজ। এজন্যে এ বিধান প্রদান করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

"আর তোমরা সেই আল্লাহ পাককে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ"।

অর্থাৎ যখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছো, তখন তোমরা তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা কর, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁকে ভয় করতে থাক।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ

يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে নবী! মোমেন নারীগণ যখন এ মর্মে আপনার নিকট বয়আত করতে আসে যে, তারা কোন কিছুকেই আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হবেনা, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং শরীয়তের বিধান সমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে না, তবে আপনি তাদের বয়আত গ্রহণ করুন, আর তাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যে সব মহিলা হিজরত করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন, তখন তাদেরকে যাচাই করা হতো এসব কথা দ্বারা, যা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে। যখন তারা এসব কথা স্বীকার করে নিত, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করতেন, আমি তোমাদের বয়আত গ্রহণ করলাম। তিনি বয়আতের সময় কারো সঙ্গে হাত মেলাতেন না, আল্লাহর শপথ! বয়আত করার সময় তিনি কখনো কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেননি। শুধু মৌখিক ঘোষণা করতেন, আমি এসব কথার উপর তোমাদের বয়আত গ্রহণ করলাম।

তিরমিযী, নাসায়ী, এবনে মাজা, মসনদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হযরত উমাইমা এবনে রাকিকা বর্ণনা করেন, কয়েকজন স্ত্রীলোকের সাথে আমিও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বয়আতের উদ্দেশ্যে হাযির হই। তখন আমরা আলোচ্য আয়াত মোতাবেক তাঁর নিকট বয়আত করলাম এবং ভাল কাজে আমরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করবো না, একথারও অঙ্গীকার করি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা একথাটি সংযোজন কর, "আমাদের সাধ্য অনুযায়ী"। আমরা আরজ করলাম, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের চেয়ে আমাদের খেয়াল বেশী রাখেন এবং আমাদের চেয়ে আমাদের উপর অধিকতর দয়াবান। এরপর আমরা আরজ করলাম, হুজুর! আমাদের সাথে আপনি মোসাফেহা করেন না? তিনি এরশাদ করলেন না, আমি কোন পর নারীর সাথে মোসাফেহা করিনা। আর একজন স্ত্রীলোককে বয়আত করেছি বলা একশত জনের জন্যে যথেষ্ট।

বোখারী শরীফে সংকলিত, হযরত উম্মে আতীয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা এসব কথার উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বয়আত

করি এবং একথাও বলি, আমরা কখনও চিৎকার দিয়ে শোক প্রকাশ করবো না। এমন সময় একজন স্ত্রীলোক নিজের হাত টেনে নিয়ে বললো, আমি উচ্চস্বরে শোক প্রকাশের ব্যাপারে বয়আত করবো না, এজন্যে যে অমুক স্ত্রীলোক আমার অমুক মৃত ব্যক্তির উপর শোক প্রকাশে আমার সাথে সহযোগিতা করেছে, আমি তার বিনিময়ে সেভাবে শোক প্রকাশ করবো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা শ্রবণ করে নীরব রইলেন। সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বয়আত করলো।

মুসলিম শরীফে আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগের চারটি কথা রয়েছে, যা মানুষ বর্জন করবে না। (১) বংশ মর্যাদার উপর গৌরব করা, (২) অপরকে বংশ মর্যাদার দিক থেকে হেয় মনে করা। (৩) নক্ষত্রপুঞ্জের উদিত হবার মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা। (৪) মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি বিলাপকারিনীরা তওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তাদেরকে কাঁটা বিশিষ্ট জামা এবং ওড়না পরিয়ে উঠানো হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি (শোক প্রকাশ করতে গিয়ে) মুখে আঘাত করে, পোষাক ছিড়ে এবং জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় হায় হায় করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (অর্থাৎ আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই)।

فَبَايِعْهُنَّ

অর্থাৎ এসব কথার উপরে তাদের থেকে বয়আত গ্রহণ করুন, (এবং বলুন) তোমরা বয়আতের এসব শর্ত পূরণ কর, তবে আমি তোমাদের সওয়াবের নিশ্চয়তা বিধান করছি। আর (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যা গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তা ক্ষমা করেন।

رَّحِيْمٌ

তিনি অত্যন্ত দয়াবান, তিনি ভবিষ্যতে হেদায়েতের তৌফিক দান করবেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী থেকে বয়আত গ্রহণ করেছেন, তবে পুরুষদের থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এবং নারীদের থেকে বিস্তারিতভাবে। পুরুষদের থেকে শুধু ঈমান এবং জেহাদের ব্যাপারে বয়আত গ্রহণ করা হয়েছে, কেননা ঈমানই সর্ব প্রথম কথা, ঈমান ব্যতিরেকে কোন সৎ কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর জেহাদ পুরুষদের বিশেষ দায়িত্ব, তাই এ দু'টি বিষয়ের উপর পুরুষদের থেকে বয়আত গ্রহণ করা হয়েছে। আর নারীদের নিকট থেকে বিস্তারিত ভাবে এজন্যে বয়আত গ্রহণ করা হয়েছে, কেননা তারা এসব ব্যাপারে অধিক পরিমাণে জড়িত থাকে, যেমন ক্ষেত্রবিশেষে তারা শেরক মিশ্রিত বিশ্বাস পোষণ করে, স্বামীদের অর্থ চুরি করে (অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে), এজন্যে বলা হয়েছে, 'তোমরা চুরি করোনা'। যেমন অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারীদের থেকে বয়আত গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা চুরি করবেনা, ঐ মুহূর্তে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বললো, আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি, কখনো কখনো আমি তার অর্থ নিয়ে যাই, তা কি আমার জন্যে হালাল ছিল, না হারাম। তখন আবু সুফিয়ান নিজেই বললো, তুমি ইতিপূর্বে যা নিয়েছ এবং ভবিষ্যতে যা নেবে, সবই তোমার জন্যে হালাল (অর্থাৎ আমার তরফ থেকে মাফ)। তাদের কথোপকথন শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং এরশাদ করলেন, নিশ্চয় তুমি হিন্দ বিনতে ওতবা, সে বললো, জ্বী হ্যা, তবে ইতিপূর্বে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দিন। এমনিভাবে তখন নিজেদের সন্তানদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতো, আর ক্ষেত্রবিশেষে নারীরা স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং কারো মৃত্যু হলে তারা শরীয়ত বিরোধী পন্থায় বিলাপ করে, এজন্যে এ সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে নারীদের থেকে বয়আত গ্রহণ করা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ
كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ

"হে মোমেনগণ! যাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব আপতিত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করোনা, তারা তো আখেরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন কাফেররা হতাশ হয়েছে সমাধিস্থ লোকদের সম্পর্কে"।

এবনুল মুনজের মোহাম্মদ এবনে এসহাকের সূত্রে সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ এবনে হারেস (রাঃ) কোন

কোন ইহুদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতেন। তাই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ সূরার প্রথম আয়াতে যেভাবে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ ছিল, ঠিক তেমনি সূরার সর্বশেষ আয়াতেও এ সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে।

قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

যে জাতির প্রতি আল্লাহর গজব আপতিত হয়েছে, অর্থাৎ ইহুদী, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কিছু দরিদ্র মুসলমান ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতো, তাদের সম্বন্ধেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের নির্দেশ সাধারণ কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদিও তৌরাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদ ছিল, কিন্তু তারা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে শয়তানের প্ররোচনায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করতো। তারা আখেরাতের সওয়াব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে। যেভাবে কবর থেকে মৃত ব্যক্তির ফিরে আসা সম্পর্কে তারা নিরাশ হয়েছে, তেমনি এ ইহুদীরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকেও নিরাশ হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, কবরে যে সব কাফেরকে দাফন করা হয়েছে, তাদের সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কাফেররা যেমন নিরাশ, তেমনি এ ইহুদীরা আখেরাতের সাফল্য সম্পর্কেও সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে।

আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ)।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৪৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সফ্

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর তসবীহ পাঠে রত থাকে, আর তিনিই পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

(২) হে মোমেনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না।

(৩) যে কাজ তোমরা কর না, তা বলা আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

(৪) নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাককে ভালবাসে, তারা আল্লাহ পাকের পথে সারিবদ্ধভাবে জেহাদ করে, তারা যেন সীসা বিগলিত প্রাচীর।

সূরা সফ্ প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ। এতে ২ রুকু, ১৪ খানি আয়াত রয়েছে। এতে ২২১টি বাক্য ও ৯২৬টি অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরার অন্য নাম হলো সূরাতুল হাওয়ারিয়্যীন, আর এ সূরাকে সূরাতু ঈসা (আঃ)-ও বলা হয়।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, এ সূরা মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়, এ মত পোষণ করেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ), একরামা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ।

অবশ্য এবনে ইয়াসার বলেছেন, এ সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে।

এ সূরার আমল

কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমণরত অবস্থায় সূরা সফ্ পাঠ করে, তবে সে সর্ব প্রকার বালা-মসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পড়তে দেখবে, সে আল্লাহর রাহে জেহাদের মর্তবা এবং ফযিলত লাভের তওফিক পাবে।

তফসীরুল কোরআন

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর তসবীহ পাঠে রত থাকে, সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর আদেশ সর্বত্র কার্যকর হয়।

اَلْحَكِيْمُ

তাঁর আদেশ হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

এর দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হয় (১) আল্লাহ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা (২) আল্লাহ্ পাক এক, অদ্বিতীয়, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তফসীরকারগণ হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন সাহাবী একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ যেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে একথা জিজ্ঞাসা করে যে আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্টি? এ আলোচনা বৈঠক থেকে আমাদের কেউ দাঁড়ায়নি, এমন অবস্থায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরিত এক

ব্যক্তি এসে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে গেল। আমরা সকলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একত্রিত হলাম, তখন তিনি আলোচ্য সূরা তেলাওয়াত করলেন। (মসনদে আহমদ)

এ সূরায় একথা রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ করা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকারগণ বলেছেন, কয়েকজন মুসলমান একথা বলেছিলেন, যদি আমরা জানতে পারতাম যে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কোন্ কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়, তাহলে আমরা তাই করতাম এবং তাঁর জন্যে জান-মাল কোরবান করে দিতাম, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, সে সব লোককে যারা আল্লাহ্ পাকের রাহে জেহাদ করে সারিবদ্ধ অবস্থায়"।

আর ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা হয়, তখন কিছু লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাই নাযিল হয়েছে,

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(তোমরা কেন এমন কথা বল, যা কর না)

এবনে জরীর আবু সালেহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েকজন মুসলমান একথা বলেছিলেন, যদি আমরা জানতে পারতাম যে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কোন্ আমলটি উত্তম, তাহলে তাই আমরা করতাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

(হে মোমেনগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবো এমন ব্যবসায়ের, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত দেবে)।

কিন্তু আয়াতে যে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা মুসলমানদের কিছু লোক কঠিন মনে করলেন, তখন আলোচ্য আয়াত-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(হে মোমেনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর-না) নাযিল হয়েছে।

অর্থাৎ তোমরাই বলেছিলে, যদি আমরা জানতাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে উত্তম কাজ কি? তাহলে আমরা তা করতাম, অথচ তোমাদেরকে যখন জেহাদের জন্যে আহ্বান করা হলো, তখন তোমরা তাকে কঠিন মনে করলে!

এবনে জরীর হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত لِمَ تَقُوْلُوْنَ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে জেহাদে তরবারি বা কোন অস্ত্র ব্যবহার করেনি।

এবনে আবি হাতেম মোকাতেল (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ওহোদের যুদ্ধে যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিল, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সওয়াবের বিবরণ দান করেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, যদি ভবিষ্যতে জেহাদের সুযোগ আসে, তবে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। কিন্তু যখন ওহোদের যুদ্ধ শুরু হলো, তখন তারা পলায়ন করলো, আর তাই এ আয়াত নাযিল হলো।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত মুনাফেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিত, কিন্তু তারা ছিল মিথ্যাবাদী, তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করতোনা।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

"যে কাজ তোমরা কর না তা বলা আল্লাহ্ পাকের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়"।

অর্থাৎ এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন যে, তোমরা যা বল তা কর না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সে সব লোককে পছন্দ করেন, যারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করে, তারা যেন সীসা বিগলিত প্রাচীর।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য, যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে সে তাগিদ করুক বা না করুক।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুনাফেকের তিনটি অভ্যাস রয়েছে, ওয়াদা করলে তা খেলাফ করা, আর কথা বললে মিথ্যা কথা বলা, আর আমানত রাখলে তাতে খেয়ানত করা।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, চারটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে সে প্রকৃত মুনাফেক, যদি তার মধ্যে একটি থাকে তবে মুনাফেকীর একটি আলামত তার মধ্যে রয়েছে মনে করা হবে। এ চারটি আলামতের একটি হল, ওয়াদা ভঙ্গ করা। আলোচ্য

আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এমন কথা বলা যা তোমরা কর না, তা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়।[১]

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাককে ভালবাসে, তারা আল্লাহ্ পাকের পথে সারিবদ্ধভাবে জেহাদ করে, তারা যেন সীসা বিগলিত প্রাচীর'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বাধিক প্রিয় এবং পছন্দনীয় কাজ হল, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে জেহাদ করা, সারিবদ্ধভাবে সীসা বিগলিত, অতি সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় সত্যের উপর অনঢ় অবিচল থাকা, মুখে যা বলা হয় কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রমাণ করা। এসবই হলো আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রিয় কাজ এবং আল্লাহ্ পাকের রাহে জেহাদ হলো মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

তরজমা

(৫) এবং যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন নির্যাতন করছো? অথচ তোমরা খুব ভাল করেই জান যে আমি তোমাদের নিকট

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৫৪

আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল, তবুও যখন তারা ফিরে গেল তখন আল্লাহ পাক তাদের মনকে ফিরিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্ পাক নাফরমান জাতিকে হেদায়েত করেন না।

(৬) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন মরয়ম পুত্র ঈসা বলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের রসূল হয়ে এসেছি, আমার পূর্ববর্তী তওরাতকে আমি বিশ্বাস করি, আমার পরবর্তী আগমনকারী রসূল সম্পর্কে সুসংবাদ দান করি, তাঁর নাম হবে আহমদ। এরপর তিনি যখন তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলে, এটিতো সুস্পষ্ট যাদু।

(৭) যে আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় পাপীষ্ঠ আর কেউ নেই, অথচ তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আর আল্লাহ্ পাক জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(৮) আল্লাহ পাকের আলোকে তারা মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কাফেররা যতই অপ্রিয় মনে করুক না কেন আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাঁর আলো পূর্ণ করবেনই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার পাশাপাশি একটি অন্যায় বর্জন করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। সে অন্যায় হলো মানুষের কথা এবং কাজে পার্থক্য হওয়া। বিশেষ করে যারা মোমেন, তাদের ঈমানের দাবী হলো তাদের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকতে হবে, যা বলবে তাই করবে। সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় এ গুণটির গুরুত্ব অত্যধিক।

দ্বিতীয়তঃ ঈমানের আরও একটি দাবী হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ। যারা আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ পাকের রাহে জেহাদে মশগুল হয় এবং দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল থাকে। এটি মর্দে মোমেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গক্রমে বনী ইসরাঈলের আপত্তিকর আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে, যা তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে করেছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মত বনী ইসরাঈল জাতি মুখে অনেক বড় বড় কথা বলতো, কিন্তু কাজের সময় তারা থাকতো অনুপস্থিত। হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের গোলামী থেকে নাজাত দিয়েছেন এবং মূসা (আঃ)-এর মোজেযা স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতে বনী ইসরাঈল জাতি লোহিত সাগর পার হয়। এরপর বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে, কখনও তারা গো-বৎসের

পূজা করে আর তারাই তওরাত নাযিল করার জন্যে আবদার করে। যখন তওরাত নাযিল হলো এবং তার বিধি-নিষেধকে কঠিন মনে করে তারা বললো, আমরা এর উপর আমল করতে পারবো না। এমনকি যখন তাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলো, তখন তারা বললো, "(হে মূসা!) আপনি এবং আপনার খোদা গিয়ে জেহাদ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম"। এভাবে বনী ইসরাঈল জাতি জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করতো এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে কষ্ট দিত। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ

"এবং যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন নির্যাতন করছো? তোমরা খুব ভাল করেই জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রসূল"।

وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা খুব ভালভাবেই জান যে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূল হিসেবে এসেছি, তোমরা আমার মোজেযা সমূহ দেখেছো এবং এখনও দেখছো। ফেরাউন তোমাদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার করতো এবং তোমাদের প্রতি সে সর্বপ্রকার নির্যাতন, উৎপীড়ন চালাতো। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আমার মাধ্যমেই রক্ষা করেছেন, তারপরও তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দাও। নবীর শান হলো তাঁর তা'যীম করা, তাঁকে কষ্ট না দেয়া।

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন তারা ফিরে গেল, তখন আল্লাহ পাকও তাদের মনকে ফিরিয়ে দেন।

বস্তুতঃ যারা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে তাদের মন পাষাণ হয়ে যায়, তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সত্য-অসত্যের মধ্যকার পার্থক্য ভুলে যায়। আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতার অনিবার্য পরিণাম তারা ভোগ হবে। কখনও তারা আর সঠিক পথ পায়না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

'আল্লাহ পাক অবাধ্য নাফরমান জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না'।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

"আর স্মরণ কর সে সময়কে, যখন মরয়ম পুত্র ঈসা বলেন, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের রসূল হয়ে এসেছি, আমার পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ তওরাতকে আমি বিশ্বাস করি, আমার পরে আগমনকারী রসূল সম্পর্কে আমি সুসংবাদ দানকারী, তাঁর নাম হবে আহমদ। এরপর তিনি যখন তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বললো, এটি তো প্রকাশ্য যাদু"।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন কেননা, বনী ইসরাঈল জাতি সত্য-বিরোধিতার কারণে কোপগ্রস্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করে বললেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ....... هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

হে বনী ইসরাঈল জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল হয়ে এসেছি, আমার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতকে আমি বিশ্বাস করি, এভাবে যে ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান রাখে, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে তাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি বিশ্বাস করি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি, আমি সেই নিয়ম-কানুন এবং বিধি-বিধান মেনে চলারই আহ্বান জানাই, যা প্রবর্তন করে গেছেন হযরত মূসা (আঃ)। এতদ্ব্যতীত আমার পর যিনি নবী হিসেবে আগমন করবেন, যাঁর নাম হবে আহমদ, আমি তোমাদেরকে তাঁর সুসংবাদ প্রদান করি, অতএব তাঁর যুগে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা তোমাদের কর্তব্য হবে। যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবেনা, তাদের পরিণতি হবে শোচনীয়, তাদের অবস্থা হবে সে ইহুদীদের ন্যায়, যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতিকে হে বনী ইসরাঈল! বলে সম্বোধন করেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় "হে আমার কওম" বলেননি, এর কারণ এই যে, বনী ইসরাঈল জাতির সঙ্গে হযরত

ঈসা (আঃ)-এর কোন বংশীয় সম্পর্ক ছিলনা, কেননা বংশগত সম্পর্ক হয় পিতার মাধ্যমে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরত ও রহমতের প্রমাণ স্বরূপ পিতা ব্যতীতই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

اسْمُهُ أَحْمَدُ

নাম মুবারকের ব্যাখ্যা

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরো একটি নাম মোবারক হলো আহমদ, মোহাম্মদ এবং আহমদ- উভয় শব্দই 'হামদ' থেকে নিস্পন্ন। যার অর্থ হলো, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি, প্রতিদান, হক্ব আদায় করা। "মোহাম্মদ" শব্দটির অর্থ হলো, সর্বদা যাঁর প্রশংসা করা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ সে ব্যক্তি, যাঁর মধ্যে যাবতীয় গুণাবলীর বিপুল সমাবেশ ঘটেছে, কেননা প্রশংসার যোগ্য সে ব্যক্তিই হন, যিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, "মোহাম্মদ" শব্দটির অর্থ হলো, যাঁর প্রশংসা অধিক পরিমাণে করা হয়। আর "আহমদ" শব্দটির অর্থ হল, যিনি সর্বাধিক প্রশংসাকারী। সমস্ত নবী রসূলগণই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রশংসাকারী, তাই তাঁর নাম হয়েছে "আহমদ"। আর যেহেতু সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক প্রশংসা করা হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, তাই তিনি "মোহাম্মদ"। বোখারী শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার অনেক নাম রয়েছে, মোহাম্মদ, আহমদ, মাহী, যাঁর কারণে আল্লাহ্ পাক কুফর ও নাফরমানীকে দূরীভূত করেছেন, আকেব, অর্থাৎ যার পরে আর কোন নবী আসবে না। আর আবু দাউদ শরীফে সংকলিত, উপরোল্লিখিত নামগুলোর পর রয়েছে, আমি হাশের, আমি নবীয়ে রহমত, আমি নবীয়ে তওবা এবং আমি নবীউল মালহামা।

হযরত ঈসা (আঃ) নিজের রেসালতের দাবীর পাশাপাশি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ তওরাতের সত্যতার কথা ঘোষণা করেছেন। আর তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, নূরে মুজাস্সাম, ফখরে দোআলম, শাফেয়ে মাহশার, সাকীয়ে কাওসার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদও দিয়েছেন। উল্লেখ্য, তাঁর আগমনের সুসংবাদ অন্যান্য নবী রসূলগণও দিয়েছেন এবং তওরাত সহ সমস্ত আসমানী গ্রন্থে তাঁর সুসংবাদ স্থান পেয়েছে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

"যখন তিনি প্রকাশ্য দলিল প্রমাণ নিয়ে আসলেন, তখন তারা বললো, এটিতো সুস্পষ্ট যাদু"।

جاء শব্দটির সর্বনাম দ্বারা যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, যখন ঈসা (আঃ) রসূল হয়ে আগমন করলেন এবং তাঁকে প্রদত্ত মোযেজা সমূহ প্রদর্শন করলেন, যেমন তিনি মৃতকে জীবিত করলেন, জন্মান্ধকে করলেন চক্ষুস্মান এবং শ্বেত রোগগ্রস্ত লোককে করলেন সুস্থ, তখন বনী ইসরাঈল জাতি তাঁকে মানল না, তারা বললো, তাঁর নিকট রয়েছে সুস্পষ্ট যাদু।

আর যদি جاء শব্দটির সর্বনাম দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো, তিনি মোযেজা সমূহ প্রদর্শন করলেন, আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বি-খন্ডিত করলেন, কাফেররা কোরআনে করীমের অনুরূপ তিনটি আয়াত উপস্থাপন করতে অক্ষম হল, তখন বনী ইসরাঈলের কাফেররা বললো, অথবা কোরায়শের কাফেররা বললো, এটি সুস্পষ্ট যাদু।১

এখানে উল্লেখ্য, তৌরাত ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে আর কোন নবী নেই, সেজন্যে তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আর একথা ঐতিহাসিক সত্য যে আসল তৌরাত বা বাইবেল বর্তমানে দুনিয়াতে নেই, এই নামে যা কিছু আছে, তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিজেদের খেয়াল খুশি মোতাবেক পরিবর্তনের পর যা রয়েছে তারই প্রচার হচ্ছে। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানদের অপচেষ্টা সত্ত্বেও এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা স্বরূপ এখনও তৌরাত ইঞ্জিলে তাঁর আলোচনা রয়েছে, সম্পূর্ণরূপে তারা তা মুছে ফেলতে পারেনি।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ط

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৫০-৫১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৫৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮৬

"যে আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তার চেয়ে বড় পাপীষ্ঠ আর কে হবে? অথচ তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ পাক এমন জালেমদেরকে হেদায়েত করেন না"।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অর্থাৎ যারা সত্যকে গোপন করে তার স্থলে স্বরচিত মিথ্যা প্রচার করে, আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে, বা তাঁর সন্তান-সন্ততি আছে বলে মনে করে, অথবা একথা বলে, আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি কোন কিছু নাযিল করেননি, অথবা একথা বলে যে, আল্লাহ্ পাক আদেশ দিয়েছেন তোমরা কোন নবীকে মানবেনা, অথবা একথা বলে যে, মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, অথবা যারা আল্লাহ্ পাকের কিতাবে রদবদল করে, তাদের চেয়ে পাপীষ্ঠ দূরাত্মা আর কে হতে পারে?

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

এমন দুর্বৃত্ত পাপীষ্ঠদেরকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েত করেন না, কখনো তারা কল্যাণ লাভ করবেনা, নাজাত পাবেনা, তাদের জন্যে হেদায়েতের পথ রুদ্ধ, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ থেকে তারা থাকবে বঞ্চিত, তারা আসমানী গ্রন্থ তৌরাত ইঞ্জিলে যত রদবদল করুক না কেন এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীকে গোপন রাখার যত অপচেষ্টাই করুক না কেন, কখনও তারা সফলকাম হবেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের এলমে যাদের জালেম থাকা সাব্যস্ত হয়ে আছে, তাদের সম্পর্কে এ আয়াতের ঘোষণাঃ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হেদায়েত লাভের তৌফিক দেবেন না।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

"আল্লাহ্ পাকের নূরকে তারা মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কাফেররা যত অপছন্দই করুক না কেন, আল্লাহ্ পাক অবশ্য অবশ্যই তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেররা মিথ্যা কথা দ্বারা, অপবাদ দ্বারা দ্বীন ইসলামের আলোকে নিস্প্রভ করার অপচেষ্টা করে, যদি কেউ মুখের ফুঁৎকারে চন্দ্র সূর্যের আলোকে নিস্প্রভ করতে না পারে, আর অবশ্যই তা পারেনা, তবে এ কাফেররাও দ্বীন ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে পারবেনা। দ্বীন ইসলামের গতিকে শ্লথ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), এবনে যায়েদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কাফেররা আল্লাহ্ পাকের নূরকে নিস্প্রভ করতে চায়, এর অর্থ

হলো, তারা কোরআনে করীমের পয়গামকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, কোরআনে করীমের শিক্ষাকে তারা প্রতিরোধ করতে চায়।

আর যাহ্যাক (রঃ) এ বাক্যটির অর্থ বলেছেন, তারা চায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"(হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, চল্লিশ দিন যারত ওহী অবতরণ বন্ধ ছিল। তখন ইহুদী সর্দার কা'ব এবনে আশরাফ বলেছিল, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে নূর আল্লাহ পাক নাযিল করছিলেন, তা বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিন্তিত ছিলেন, আর তখনই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

কাফেররা যত অপছন্দই করুক না কেন, আল্লাহ পাক অবশ্য অবশ্যই তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন এবং কাফেরদেরকে করবেন ব্যর্থ মনোরথ।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮৮

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ
تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾
وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

তরজমা

(৯) তিনিই সেই আল্লাহ্ পাক, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন এ সত্য ধর্মকে সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।

(১০) হে মোমেনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

(১১) (তা হলো এই যে) তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে। এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

(১২) আল্লাহ্ পাক তোমাদের গুনাহ্ সমূহ মাফ করবেন, তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বেহেশতের উত্তম বাসগৃহে বসবাস করতে দেবেন। এটিই বিরাট সাফল্য।

(১৩) আর তিনি তোমাদের প্রিয় আরো একটি জিনিস দান করবেন (তা হলো) আল্লাহ্ পাকের সাহায্য এবং নিকট বিজয়। (হে রসূল!) মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান করুন।

তফসীরুল কোরআন

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবং দ্বীন ইসলামের সত্যতা ঘোষণা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ একথাও ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কোরআন হলো সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ, পবিত্র কোরআনই জান্নাত লাভের এবং দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশ করে।

তৃতীয়তঃ একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যত ধর্মই থাকুক না কেন, সবগুলোই বাতিল বলে প্রমাণিত হবে, দ্বীন ইসলামই তার নিজস্ব জৌলুষ নিয়ে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যান্য সকল ধর্মের এবং যাবতীয় মতবাদের বাতুলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হবে এবং ইসলামই প্রভাব বিস্তার করবে।

চতুর্থতঃ ইসলামকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়েই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে।

পঞ্চমতঃ ইসলামের বিজয়ে যাদের গাত্রদাহ হয়, যারা ইসলামের নূরকে মুখের ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়, তাদের সকল অপচেষ্টা অবশেষে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

বস্তুতঃ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ পাক তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন এবং বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন এবং পূর্ণ পরিণত যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত জীবন বিধান ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের প্রতীক হিসেবে দান করেছেন।

ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, অন্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের যে ঘোষণা রয়েছে এ আয়াতে, তার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বিগত চোদ্দশ' বছরের ইতিহাস, ইহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক এবং সমাজতন্ত্রী ও নাস্তিকরা ইসলামের ক্ষতি সাধনের কত অপচেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। খৃষ্টান মিশনারীরা সারা বিশ্বে প্রায় সকল যুগে অগণিত অর্থ ব্যয় করার পরও ইসলামের বিরোধিতায় তাদের মিশন ব্যর্থ হচ্ছে বলে তারা নিজেরাও স্বীকার করে। ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা সমাজতন্ত্রের ধুঁয়া তুলে ইসলামের বিরোধিতায় কম যায়নি, কিন্তু আজ সাবেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সমাজতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, আর আল্লাহ পাকের রহমতে ইসলাম স্বগৌরবে অগ্রসর হচ্ছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, ইসলামের সার্বিক প্রাধান্য বিস্তারের সময় হবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর, যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হয়ে পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন তখন ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার হতে এখনও অনেক বাকী। হযরত ঈসা (আঃ) যখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন ইসলামের বিজয়ের নব রূপ প্রকাশ পাবে।

এ বিজয়ের ধারা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধ থেকে, অষ্টম হিজরীতে অনুষ্ঠিত মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এক অবিস্মরণীয় বিজয়, আর এ বিজয়েরই একটি চিরস্মরণীয় দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায় দশম হিজরীতে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক দিনে, যখন এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হয়েছিলেন, আর এ বিজয় অব্যাহত থাকে খেলাফায়ে রাশেদ্বীনের যুগেও। বিশেষতঃ তদানীন্তন পৃথিবীতে বিদ্যমান দু'টি শক্তি- পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্য পরস্পর হাজার বছর যাবত যুদ্ধরত থেকেছে, কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান নেতৃত্বে যে ইসলামী শক্তির অভ্যুদয় ঘটলো, তার সম্মুখে সে যুগের এ দু' পরাশক্তির কোনটিই টিকতে পারেনি, নিঃসন্দেহে কোরআনে করীমের আলোচ্য আয়াতে এ সত্যেরই ঘোষণা রয়েছে।[১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"হে মোমেনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে পবিত্র কোরআন ও সত্য দ্বীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে মানব জাতি তার জীবন-সাধনাকে সার্থক করতে পারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে এ উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-ও প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর জাতি তাঁর অনুসরণ করেনি, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে

১। এ আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের জন্যে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৬-১৯

বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব? যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের নাজাতের কারণ হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই আরজী পেশ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে কোন্ আমল সর্বাধিক প্রিয়? তখন এ সূরা নাযিল হয় আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব? যাতে শুধু লাভই রয়েছে, কোন ক্ষতির আশংকা নেই, আর তা হলো, তোমরা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে, অর্থ-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে। এ ব্যবসা তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পার। যদি তোমরা খাঁটি মোমেন হও এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ কর, তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হয় এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে তোমাদেরকে বসবাসের জন্যে উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে।

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো জাগতিক ব্যবসায়ের ফলে মানুষের আর্থিক অভাব অনটন দূর হয়। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এমন ব্যবসার কথা বলা হয়েছে, যা দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

এবনে আবি হাতেম সায়ীদ এবনে যোবায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন এ আয়াত تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (এমন ব্যবসা, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে) নাযিল হয় তখন মুসলমানগণ বললেন, এমন কোন্ ব্যবসা রয়েছে যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাতের কারণ হবে, যদি আমরা জানতে পারি, তবে তার জন্যে আমরা জান-মাল কোরবান করতে বিলম্ব করবোনা, তখন পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্ পাকের রাহে জান মাল দিয়ে জেহাদ করবে।

ব্যবসা হলো লেন দেনের ব্যাপার, অর্থ-সম্পদ এবং প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে জেহাদ করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর আরাম-আনন্দ, সর্বোপরি আল্লাহ্ পাকের

সন্তুষ্টি লাভ করা, এটিও তেমনি লেন-দেনের ব্যাপার, আর এর চেয়ে লাভজনক ব্যবসা আর কিছুই হতে পারেনা। বাতিল বা ভিত্তিহীন বিশ্বাস বর্জন করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং ঈমানের ন্যায় মহা মূল্যবান সম্পদ আহরণ করা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তা তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা, যদি তোমরা এ সত্য অনুধাবন করতে পার।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

যদি তোমরা তা কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন।

অর্থাৎ যদি তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে জান মাল দিয়ে জেহাদ কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত।

فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ

"আদন" শব্দটির অর্থ হলো অবস্থান করা, ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, জান্নাত সাতটি, দারুল হালাল, দারুস সালাম, দারুল খোলদ, জান্নাতে আদন, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতু নায়ীম, জান্নাতুল ফেরদাউস।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু'টি জান্নাত রূপালী, আর দু'টি জান্নাত সোনালী, যার ইমারত এবং তার যাবতীয় আসবাবপত্র স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত।

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

এটি অর্থাৎ মাগফেরাত লাভ করা এবং জান্নাতে প্রবেশ করা নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য, এ সাফল্য চিরস্থায়ী আর তা এমন সাফল্য যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا

আর তিনি তোমাদের প্রিয় আরো একটি জিনিস দান করবেন যা তোমরা অত্যন্ত পছন্দ কর এবং যা অতি সত্বর তোমরা লাভ করবে, তাহলো

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ

আল্লাহ পাকের সাহায্য, অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য, মক্কা বিজয়, অথবা খায়বর বিজয়।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা রোম এবং পারশ্য সাম্রাজ্যের বিজয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা শুধু আল্লাহ্ পাকের রহমতেই তদানীন্তন পৃথিবীর দু' পরাশক্তি মুসলমানদের নিকট পরাভূত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য। তাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেনঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

"আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করে"।

وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

আর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই ঈমান এবং জেহাদ করার শুভ পরিণতি স্বরূপ মুসলিম জাতি লাভ করবে বিজয়, যা হবে অত্যন্ত নিকটবর্তী। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের তুলনায় এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সাফল্য নিঃসন্দেহে তুচ্ছ, কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার জীবনের সফল্য থেকে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে মাহরুম করবেন না, তাই আলোচ্য আয়াতে মুসলিম জাতিকে এমনি সাফল্য সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছেঃ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করুন"।

ইতিহাস সাক্ষী! বদরের রণাঙ্গণে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জনবল এবং অস্ত্রবল অতি অল্প থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক বিরাট সাফল্য দান করেছেন। এরপর পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে যখন সারা আরবের সমস্ত কাফেররা প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, তখনও আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। ষষ্ঠ হিজরীতে কাফেররা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছে। সপ্তম হিজরীতে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে খায়বরের বিজয় দান করেছেন এবং অষ্টম হিজরীতে হয়েছিল ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়, এর সঙ্গে সঙ্গে হোনায়নের রণাঙ্গনে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। দশম হিজরীতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি তাঁর এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে যে প্রশিক্ষণ দিয়ে ছিলেন, তার বরকতে সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন ইসলামের পয়গাম নিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন, আর খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। তদানীন্তন দু' পরাশক্তি পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের

হস্তে ভূলুণ্ঠিত হয়। স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর আজ সারা বিশ্বে একশত পচিশ কোটি মানুষ পাঠ করে কলেমায়ে তৈয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ, এছাড়া বর্তমান পৃথিবীর ৫২টি রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর সর্বাধিক স্বর্ণ এবং পেট্রোল আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে দিয়ে রেখেছেন। বলাবাহুল্য আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের এ ঐতিহাসিক সাফল্যেরই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ
ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ
فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১৪) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের সাহায্যকারী হও, মরয়ম-পুত্র ঈসা যেমন তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে? অনুসারীরা বললো, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, এরপর বনী ইসরাঈলের একদল লোক ঈমান আনে, আর একদল কাফের হয়, তাই আমি বনী ইসরাঈলের মোমেনদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করি, ফলে তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করে।

তফসীরুল কোরআন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা দ্বীন ইসলামের সাহায্যকারী হও, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দাও। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর, কথায় কাজে, অর্থ-সম্পদে এমনকি প্রাণের বিনিময়ে হলেও তোমরা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ কর। লক্ষ্য কর, ঈসা (আঃ) যখন তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছিলেন, কে আমাকে সাহায্য করবে? তখন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে একদল লোক অনতিবিলম্বে বললো, আমরাই আপনার সাহায্যকারী। আল্লাহর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমরাই আপনার অনুসারী এবং সাহায্যকারী।

আর এই একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায় মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হজ্জের মওসুমে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে ঘোষণা করতেন, "এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে স্থান দেবে? যেন আমি আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছাতে পারি, মক্কার কোরায়শরা এ ব্যাপারে আমাকে বাধা দিচ্ছে"। সেদিন মদীনাবাসী আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্ পাক এ সৌভাগ্য দান করেন যে, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেন, তাঁর দস্তে মোবারকে বয়আত করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মদীনা মোনাওয়্যারায় তশরীফ নিয়ে যাওয়ার আহ্বান করেন, তাঁরা একথাও বলেন, মদীনা মোনাওয়্যারায় কেউ আপনার ক্ষতি সাধন করতে সাহস করবেনা।

পরবর্তীকালে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেন, তখন মদীনাবাসী নির্যাতীত, উৎপীড়িত মোহাজেরগণকে সাহায্য করেন, এ সাহায্য ছিল অসাধারণ, এক কথায় মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসারে, প্রতিষ্ঠায়, এর হেফাজত ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম এ পর্যায়ে বিরাট, অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের পরিচয় দান করেন।

كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ

যেমন ঈসা এবনে মরয়ম তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেন, কে আমার সাহায্যকারী? তখন বনী ইসরাঈলের একদল লোক তাঁর সাহায্য করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। পক্ষান্তরে, বনী ইসরাঈলের আরেকটি দল তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারা তৌহীদের প্রতিও অবিশ্বাস করে, আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে কাফেরদের মোকাবেলায় সাহায্য করেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা হলো যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উত্তোলন করাবেন, তখন তিনি গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁর সাহাবীগণের নিকট এমন অবস্থায় আসলেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরছিল। তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে বার জন একটি ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি এসেই বললেন, তোমাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, কিন্তু এরপর আমার সাথে কুফরী করবে। একথাটি

একবার দু'বার নয়; বারো বার বললেন, এরপর বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে এজন্যে প্রস্তুত রয়েছে, যাকে আমার আকৃতি দেয়া হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে এবং জান্নাতে আমার মর্তবায় আমার সাথী হবে? তখন একজন জবাব দেয় যে তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল, সে নিজেকে এর জন্যে পেশ করলো।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তুমি বসে পড়, এরপর পুনরায় পূর্বোক্ত ঘোষণা করলেন। এবারও সেই নওজওয়ান সাহাবী দন্ডায়মান হলেন, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এবারও তাকে বসিয়ে দিলেন। এরপর তৃতীয়বার তিনি একই প্রশ্ন করলেন, এবারও ঐ যুবকই দন্ডায়মান হলেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, অতি উত্তম, আর তখনই ঐ ব্যক্তির আকৃতি অবিকল হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় হয়ে গেল এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-কে ঐ ঘর থেকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়। ক্ষণিকের মধ্যে ইহুদীরা দ্রুত সেখানে আসে এবং ঐ যুবককে হযরত ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে হত্যা করে শূলে চড়িয়ে দেয়। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা-ও সত্য প্রমাণিত হলো, কেননা অবশিষ্ট এগারজনের মধ্যে কয়েকজন বারো বার কুফরী করেছে, অথচ ইতিপূর্বে তারা ঈমানদার ছিল। এরপর বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসী ছিল, তারা তিন ফেরকায় বিভক্ত হলো। একদল বললো, স্বয়ং খোদা আমাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত ছিলেন। যতদিন ইচ্ছা তিনি ছিলেন, এখন আসমানে আরোহন করেছেন। এ ফেরকাকে ইয়াকুবীয়া বলা হয়।

অন্য একটি ফেরকা বলে, আমাদের মধ্যে আল্লাহর পুত্র ছিলেন, (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক) যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ততদিন তাকে আমাদের মধ্যে রেখেছেন, আর এখন ইচ্ছা হয়েছে, নিজের কাছে নিয়ে রেখেছেন। এদেরকে নেসতুরীয়া বলা হয়। এই দু'টি ফেরকা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ

অর্থাৎ তাদের একদল কুফরী করেছে। নাসারাদের তৃতীয় দলটি সত্যের উপর কায়েম ছিল, তাদের আকীদা ছিল হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের বন্দা এবং রসূল। যতদিন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল, তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। এখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয়েছে, তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। এটিই ছিল মুসলিম দল। এদিকে উপরোল্লিখিত কাফের দল দু'টি কিছু দিনের মধ্যেই শক্তি অর্জন করলো এবং মুসলমানদেরকে হত্যা এবং লুন্ঠন শুরু করলো। কাফেররা ছিল শক্তিশালী, আর মুসলমানগণ ছিলেন দুর্বল, এমনি অবস্থায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে, মুসলমানগণ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, আর কাফেরা ফেরকাগুলো তাঁর প্রতিও ঈমান আনেনি।

فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

(অতঃপর আমি মোমেনদেরকে তাদের দুশমনদের মোকাবিলায় সাহায্য করেছি, তাই তারা বিজয়ী হয়েছে।)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান নেতৃত্বে আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয়ী করেছেন, তাঁদেরকে কাফের, মুশরেক, ইহুদী নাসারাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করতে সাহায্য করেছেন।[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জুমআ

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ
الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৬২

পরম করুণাময় অসীম আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে, যিনি রাজাধিরাজ, পবিত্র, পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(২) তিনিই প্রেরণ করছেন (আরবের) নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাদের (আরবদের) একজনকে রসূল রূপে, যিনি তাদের সম্মুখে আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা প্রদান করেন, যদিও তারা ছিল ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

(৩) আর এই রসূলকে অন্য এমন লোকদের জন্যেও প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। আর তিনিই পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

(৪) এটি আল্লাহ পাকেরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা, তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ পাক মহান দাতা।

(৫) যাদেরকে (আসমানী গ্রন্থ) তওরাতের দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়েছিল, তারা তা বহন করেনি, (তার উপর আমল করেনি) তাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায়, যে নিজের পৃষ্ঠে গ্রন্থ-ভান্ডার বহন করে চলে, কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের লোকেরা, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আর আল্লাহ পাক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

(৬) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা মনে করে থাক যে, সকল মানুষের মধ্যে শুধু তোমরাই আল্লাহ পাকের বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও।

সূরা জুমআ প্রসঙ্গে

সূরা জুমআ মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াতের এ সূরায় ১৮০টি বাক্য ও ৭৪৮টি অক্ষর রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ), হাসান (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), একরামা (রঃ) সহ অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, সূরা জুমআ মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফেকুন পাঠ করেছেন।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় জুমআর নামায আদায়ের আদেশ রয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল জুমআ।

এ সূরার ফজিলত

যে ব্যক্তি সূরা জুমআ পাঠ করে, শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে তার হেফাজত করা হয় এবং দিনে রাতে যে সব গুনাহর কাজ হয় (সগীরা) তা এ সূরা পাঠের বরকতে মাফ করা হয়।

এ সূরার আমল

এ সূরার ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ থেকে الْعَظِيْمِ। পর্যন্ত জুমআর দিন লিপিবদ্ধ করে কোন দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে রাখা হলে তাতে বরকত হয় এবং তার হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে এ সূরা পাঠ করছে, তবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা সফে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ

(আমার পরবর্তী আগমনকারী রসূল সম্পর্কে সুসংবাদ দান করি, তাঁর নাম হবে আহমদ।)

আর এ সূরায় আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হওয়ার কথা এরশাদ হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

(তিনিই প্রেরণ করেছেন (আরবের) নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাদের (আরবদের) একজনকে রসূল রূপে।)

মূল বক্তব্য

এ সূরায় আল্লাহ পাকের তওহীদের বর্ণনার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের রেসালতের ঘোষণা রয়েছে। আর যে ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের শোচনীয় পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ সূরার উপসংহারে জাগতিক বিষয়ের লোভে-মোহে আকৃষ্ট না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

"আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে"।

الْمَلِكِ

যিনি রাজাধিরাজ, যাঁর ক্ষমতা এবং আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত,

الْقُدُّوْسِ

যিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, যা তাঁর শানের বরখেলাফ, এমন কিছু থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

الْعَزِيْزِ

যিনি পরাক্রমশালী, যিনি আসমান যমীনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সব কিছুই তাঁর অনুগত, কোন কিছুই তাঁর মোকাবেলায় আসতে পারেনা, তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য।

الْحَكِيْمِ

যাঁর প্রত্যেকটি কাজ হেকমতপূর্ণ, প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত তাৎপর্যবহ। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে রত নেই এবং সৃষ্টি মাত্রই সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

"তিনিই প্রেরণ করেছেন (আরবের) নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাদের (আরবদের) একজনকে রসূল রূপে"।

আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন, যারা ছিল উম্মী, যাদের শিক্ষা-দীক্ষা বলতে কিছুই ছিলনা, এমনকি তাদের অক্ষর জ্ঞানও ছিলনা। অজ্ঞতা এবং বর্বরতাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য, তারা আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়েছিল, তাই তারা হয়েছিল আত্মবিস্মৃত, আর এ কারণে তারা শত প্রকার কুসংস্কারে মত্ত ছিল, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, যুগ যুগ ধরে তারা দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত ছিল, সমগ্র জাতি পথভ্রষ্টতার সর্বনাশা আঁধারে নিমজ্জিত ছিল।

বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ছয়শত শতাব্দী ছিল মানবতার কলংক কাল। মানবতা ছিল তখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, মানব জাতির এমনি চরম দুর্দিনেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ

আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া

আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রথম দায়িত্ব ছিল, আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ তাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া, পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণের মাধ্যমেও মানব-মন সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়, মানুষের মনোজগতে পবিত্র কোরআন এক মহা বিপ্লব সৃষ্টি করে।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত যোবায়ের এবনে মুতএম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি যখন নিম্নোক্ত আয়াত শ্রবণ করি, তখন আমি অত্যন্ত বেশী অস্থির হয়ে পড়ি এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাস করা ব্যতীত আমার কোন গত্যন্তর ছিলনা।

আয়াত খানি হলো এই,

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ......اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ

(সূরা তূর)

"(অর্থাৎ) তারা কি নিজেই এমনি সৃষ্টি হয়েছে? অথবা তারাই কি স্রষ্টা? আসমানও যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? মূলতঃ তাদের অন্তরে ঈমান নেই। (হে রসূল!) তাদের নিকট কি আপনার প্রতিপালকের ধন-ভান্ডার রয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই কি কর্ম পরিচালক"?

এ আয়াত সমূহ হযরত যোবায়ের এবনে মুতএমের (রাঃ) অন্তরে এমন গভীর ভাবে রেখাপাত করে যে, তিনি ব্যাকুল হয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন এবং কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ) যখন পবিত্র কোরআনের এ আয়াত শ্রবণ করলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

(সূরা নাহল)

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সুবিচার ও পরোপকারের আদেশ দিচ্ছেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ-সম্পদ দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি অন্যায় অশ্লীল কাজ এবং জুলুম অত্যাচার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে"।

হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সমূহ শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে ঈমান সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, আমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতে লাগলাম।

বস্তুতঃ যখনই কেউ পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতো, তখনই সত্য-সন্ধানী মানুষের মনোজগতে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতো। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রথম কাজ ছিল পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনানো।

وَيُزَكِّيهِمْ

আত্মশুদ্ধি লাভের ব্যবস্থা করা

তিনি তাদেরকে সংশোধন করেন অর্থাৎ রসূলের দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো আল্লাহ পাকের কালাম পাঠ করে শোনাবার পর মানব-অন্তরকে সংশোধন করা, তথা বাতিল আকীদা বিশ্বাস এবং চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মানব অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা। ইসলামী পরিভাষায় একে "তাযকীয়া" বলা হয়। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম কাজ হলো কুফর, শেরককে দূরীভূত করা এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের খাঁটি বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ একীন দ্বারা মানব অন্তরকে শক্তিশালী করা। ঈমান ও একীনের গুণ অর্জনের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের সাথে বন্দার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর মানব অন্তরে যে সব চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে, যথা লোভ, মোহ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, স্বার্থপরতা, হীন মানসিকতা প্রভৃতি মানব অন্তরকে রুগ্ন ও পীড়িত করে রাখে। দক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসার মাধ্যমে এসব ব্যাধির নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হয়। অতএব নবী রসূলগণের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো মানবাত্মার সংশোধনের ব্যবস্থা করা। মানুষকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দেয়া। আর আত্ম সংশোধন ব্যতীত আত্মোন্নতি লাভ করা যায় না। আত্মসংশোধনের পথ-নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যদি কেউ ঈমানদার অবস্থায় দেখতে পেতেন, তথা কোন মোমেন যদি ক্ষণিকের জন্যে হলেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারতেন, তবে তাঁর অন্তরের চিকিৎসা হয়ে যেত তথা তিনি আত্ম সংশোধন লাভে ধন্য হতেন। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ঘোষণা

করেছেন ঃ আমার সাহাবাগণ তারকারাজির ন্যায়, তোমরা তাদের মধ্যে যার অনুসরণই করবে, হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।

স্বয়ং আল্লাহ পাকও কোরআনে করীমে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (তাদের নেক আমলের কারণে) আর তারাও আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট (অনন্ত অসীম সওয়াব লাভের কারণে)"।

আর এ কারণেই কোন ওলী আল্লাহ যত উচ্চ মর্তবার অধিকারীই হোন না কেন, মর্তবার দিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের কাছেও পৌঁছতে পারেন না, আর এজন্যেই পরবর্তী কালে সাহাবায়ে কেরামের কোন প্রকার সমালোচনা করা বৈধ নয়, কেননা তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে যে ফয়েজ ও বরকত পেয়েছেন, আধ্যাত্মিক জগতে যে উচ্চ মর্তবা হাসিল করেছেন, এক কথায় আল্লাহ পাকের যে নৈকট্য লাভ করেছেন, তা পরবর্তীতে আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আধুনিককালে দ্বীনি এলমের অভাবের কারণে বা জ্ঞানের দৈন্যের কারণে কোন কোন ফেরকা ইসলামের অতি বড় খাদেম হওয়ার মানসে সাহাবায়ে কেরামের শানে বেআদবী করার দুঃসাহস দেখায়, যা তাদের নিজেদের জন্যেই হয় ক্ষতিকর, আর তারা যে হক্কের উপর কায়েম নেই, তাদের এ আচরণই হয় তার প্রমাণ। সাধারণতঃ যারা নিজেরা আত্ম সংশোধন না করেই অন্যের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করে, তাদের দ্বারাই এমন গর্হিত কাজ হয়ে থাকে।

যাহোক, রসূলের অন্যতম দায়িত্ব হলো মানব মনকে সংশোধন করা, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের কথা শেখাবে, অর্থাৎ রসূলের দায়িত্ব শুধু পবিত্র কোরআন শুনিয়ে দেয়া এবং মানব অন্তরের সংশোধনের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং যারা তাঁর কথা শ্রবণ করে, তাদেরকে আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআনে করীমের অতি মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং কোরআনে করীমে যে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে এবং আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে হেকমত দান করেছেন, তার শিক্ষা দেয়াও রসূলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"যদিও তারা ইতিপূর্বে (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে) সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত নেই

এতে একথা প্রমাণিত হয়, মানুষ যে যুগেই বাস করুক না কেন এবং যে দেশ এবং পরিবেশেই থাকুক না কেন, এবং যত বড় জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত কেউ সত্যের সন্ধান পাবেনা। গোমরাহীর অন্ধকার থেকে নাজাত পাবেনা, কেননা হেদায়েত আসে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত লাভের বিকল্প কোন পথ নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের যে দায়িত্ব সমূহ উল্লেখ করেছেন তা সূরা বাকারার একখানি আয়াতে এভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য হতে এমন একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকট তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের কথা শেখাবে এবং তাদেরকে সংশোধন করবে"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের শুভ-পরিণতি

আরব জাতি যারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পবিত্র কোরআনে যাদেরকে উম্মী বা নিরক্ষর বলে অভিহিত করা হয়েছে, চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে যে যুগকে বর্বরতার যুগ বলা হয়, সে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, বর্বর লোকেরা যখন পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করলো, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করলো, তখন শুধু আরব নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের চেহারা বদলে গেল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাঁদেরকে সংশোধন করলেন, যাঁরা পবিত্র কোরআন পাঠ করে তার শিক্ষা গ্রহণ করলেন, তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ভদ্রতা-নম্রতা, উদারতা-মহানুভবতায়, সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনে বিরাট অবদান রাখলেন, বিশ্ব সভায় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন, মানব জাতির ইতিহাস নতুন করে রচিত হলো, পবিত্র কোরআনের শিক্ষার প্রচার প্রসার হলো, শুধু হেজাজেই নয়; খেলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের পর উমাইয়া বংশীয়দের নব্বই বছরের শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খৃষ্টাব্দ) দামেস্কে, এরপর আব্বাসীয় বংশের পাঁচশত আট বছর

(৭৫০-১২৫৮ খৃষ্টাব্দ) বাগদাদে এবং এরপর তুর্কী ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের ছয়শত বাইশ বছরে (১৩০০-১৯২২ খৃষ্টাব্দ) এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে মুসলমানদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। এদিকে উমাইয়া শাসনামলেই স্পেন মুসলিম অধিকারে আসে (৭১২ খৃষ্টাব্দ) এবং উপমহাদেশেও সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে (৭১২ খৃষ্টাব্দ) মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্পেনে মুসলমানগণ প্রায় আটশত বছর (৭১২-১৪৯২ খৃষ্টাব্দ) অবস্থান করেন। অন্যদিকে এই উপমহাদেশে (১১৯২-১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ) প্রায় পৌনে ছয়শত বছর নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম শাসন অটুট থাকে। মুসলিম জাতি সগৌরবে বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলিম জাতি যখন পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ভুলে গেল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ থেকে বিমুখ হলো, তখন থেকে মুসলিম জাতির ভাগ্য বিড়ম্বিত হলো, শুরু হলো এই জাতির দুর্দিন, এজন্যেই মরমী কবি বলেছেন,

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوے تارك قران ہو کر

'পূর্ব পুরুষরা সম্মানিত ছিলেন মুসলমান হয়ে আর তোমরা অপমানিত হয়েছ পবিত্র কোরআন বর্জনকারী হয়ে'।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

"অধিকন্তু এই রসূলকে অন্যান্য এমন লোকদের জন্যেও প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও এদের সঙ্গে মিলিত হয়নি"।

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালত, তাঁর মহান শিক্ষা ও আদর্শ শুধু আরব জাহান এবং তদানীন্তন যুগের জন্যেই ছিলনা, বরং তিনি আগমন করেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এবং সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে, তিনি শুধু সে যুগের জীবিত মানুষের জন্যেই আগমন করেননি, বরং যাঁরা সে যুগে জন্মগ্রহণ করেনি, অনাগত ভবিষ্যতের সকল মানুষের জন্যে তিনি আদর্শ হয়ে এসেছেন- যারা পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে। আরব-অনারব, সাদা-কালো, ভাল-মন্দ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ এক কথায় সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। ভূপৃষ্ঠে যত মানুষের পদচারণা হবে, সকলের জন্যে তিনি একমাত্র আদর্শ, তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষই পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য লাভ করতে পারবেনা, আলোচ্য আয়াতে একথা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরকার একরামা এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের آخرين শব্দটি দ্বারা তাবেয়ীনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে, সকলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এবনে নাজীহের সূত্রে বর্ণিত, মুজাহেদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

আমর এবনে সায়ীদ, এবনে যোবায়েরের সূত্রে বর্ণিত যে, এ শব্দ দ্বারা অনারবদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা আরবদের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) আমাদের মাঝেই ছিলেন, এই সময় সূরা জুমআ নাযিল হলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আলোচ্য) আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসূল্লাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম)! আলোচ্য আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, ঐ ব্যক্তি দু' বা তিনবার একই প্রশ্ন করলো, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উপর হাত রেখে এরশাদ করলেন, যদি ঈমান সুরাইয়া নামক নক্ষত্রের নিকটও থাকে (অর্থাৎ আসমানেও থাকে) তবে এ ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কিছু লোক তা অর্জন করবে।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পারশ্যের কিছু লোক এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদের কথা এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতি (রঃ) এবং হাদীস ও তফসীরের অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)-কে।[১]

لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে সব লোকদের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, যারা এখনও বর্তমান লোকদের সাথে মিলিত হয়নি, কেননা এখনও তাদের জন্মই হয়নি। এজন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত, তাঁর রসূল"।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৪৩

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

অর্থাৎ আমি প্রেরিত হয়েছি, যেন আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, আর সে ব্যক্তিকেও যার নিকট এই বাণী পৌঁছে।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআন সম্পর্কেও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থাৎ সকল দলের মধ্যে যে কেউ কোরআনে করীমকে অস্বীকার করবে, দোযখই হবে তার ঠিকানা।

এ সমস্ত আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। তিনি নবী ও রসূল সকলের জন্যে, তিনি শুধু রসূলই নন; বরং সকল নবী রসূলগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন, আর তিনি শুধু নবীই নন, বরং খাতেমুন নবিয়্যীনও, তথা তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ কথাটির অর্থ হলো, যারা পরবর্তীতে আসবে. তারা কোন অবস্থাতেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের সমান মর্তবা এবং সওয়াব পাবেনা। তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন বা অন্য কেউ সাহাবায়ে কেরামের মর্তবা পেতে পারেন না, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবাগণকে মন্দ বলোনা, যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহ পাকের রাহে ব্যয় করে, তবে সাহাবায়ে কেরাম এক সের বা আধা সের আল্লাহর রাহে দান করে যে সওয়াব পেয়েছে তার সমান সে পাবে না।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী বুজুর্গ হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারককে জিজ্ঞাসা করা হয়, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং হযরত ওমর এবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর মধ্যে কে উত্তম? তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) বলেছিলেন, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) অশ্বে আরোহন করে আল্লাহর রাহে যখন জেহাদ করেছেন, তখন যে ধূলা-বালি হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছে, তা আল্লাহ পাকের নিকট একশত ওমর এবনে আবদুল আযীযের থেকে উত্তম। হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে একতেদা করে নামায আদায়

করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সূরা ফাতেহার এ আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। (হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও) তেলাওয়াত করেছেন, তখন হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেছেন, আমীন।[১]

وَهُوَ الْعَزِيْزُ

তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তিনি একজন উম্মী ব্যক্তিকে সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাঁকে এর যোগ্যতা দান করেছেন।

الْحَكِيْمُ

তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালাতের জন্যে কে যোগ্যতর ব্যক্তি তা তিনি জানেন।

ذٰلِكَ

অর্থাৎ রসূল প্রেরণ করা, মানুষকে তাঁর দ্বারা শিক্ষা দেয়া এবং মানুষের আত্মশুদ্ধি লাভের ব্যবস্থা করা।

فَضْلُ اللّٰهِ

এসবই আল্লাহ পাকের দান।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে মনোনীত করা তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের দান এবং উম্মতের হেদায়েতের জন্যে তাঁকে প্রেরণ করা উম্মতের জন্যে দান কেননা, আল্লাহ পাকই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হেদায়েত লাভের তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত লাভের তৌফিক দান করেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"যাদেরকে আসমানী গ্রন্থ তওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায় যে নিজের পৃষ্ঠে গ্রন্থ-ভান্ডার বহন করে চলে, কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের লোকেরা! যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আর আল্লাহ পাক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৯৪

এ আয়াতে ইহুদীদের ঘৃণ্য আচরণের উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ আসমানী গ্রন্থ তওরাত দান করা হয়েছে, কিন্তু তারা তওরাতের উপর আমল করেনি। যারা জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ লাভ করা সত্ত্বেও তা দ্বারা উপকৃত হয়না, যাদের জীবন-ধারায় ঐ গ্রন্থের সুশিক্ষা বা আদর্শ বাস্তবায়িত হয়না, তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই গর্দভের ন্যায়, যার পৃষ্ঠদেশে জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থের বোঝা থাকে, এ অমূল্য সম্পদ থেকে সে উপকৃত হয়না, ঐ গ্রন্থ সমূহে কী মণি-মানিক্য রয়েছে তা জানার চেষ্টাও সে করেনা, ঐ গর্দভটি শুধু ঘাসের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়। বনী ইসরাঈল জাতির অবস্থাও তদ্রুপ, আল্লাহ পাক তাদেরকে আসমানী গ্রন্থ তওরাত দান করেছেন, কিন্তু এ অভিশপ্ত জাতি তওরাতের দিকে ফিরেও তাকায় না। তওরাতে যে জ্ঞান এবং উন্নত আদর্শের বিবরণ রয়েছে তা গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত হয়না, অতএব গ্রন্থ বহনকারী গর্দভই তাদের সঠিক দৃষ্টান্ত। কত নিকৃষ্ট এমন সম্প্রদায়! যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, কেননা ইহুদীরা পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং তওরাতের সে আয়াত সমূহকেও মিথ্যা জ্ঞান করেছে, যাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"আর আল্লাহ পাক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"।

যারা জুলুমে অভ্যস্ত, যারা জেদের বশীভূত হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে, এমন সীমা লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন না।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের এলমে যাদের জালেম হওয়া সাব্যস্ত হয়ে আছে, এমন লোকদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন না।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, যেহেতু ইহুদীরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে, আর এ অস্বীকৃতির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক এমন জালেমদেরকে হেদায়েত করেন না।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহের বিবরণ তওরাত সহ অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এমনকি, হযরত ঈসা (আঃ) নিজের রেসালতের ঘোষণার পাশাপাশি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন,

এতদসত্ত্বেও ইহুদীরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি; বরং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাই তাদের অবস্থা হলো সে গর্দভের ন্যায় যে জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থের বোঝা বহন করে, কিন্তু সে জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয়না।

এভাবে তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করে, আর এমন জালেমদের নসীবে হেদায়েত থাকেনা। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ পাক এমন জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, ইহুদীদেরকে গ্রন্থ বহনকারী গর্দভের দৃষ্টান্ত প্রদানে যে হেকমত রয়েছে তা হলো, মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতার জন্যে গর্দভ শব্দটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অযোগ্যতার পরিচয় দেয়, তাকে "গর্দভ" আখ্যা দেয়া হয়। গর্দভ শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে এক প্রকার অবমাননার ভাব রয়েছে, যার জন্যে এ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়, তাকে সমাজে খাটো করার প্রয়াস থাকে।

قُلْ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা এ ধারণা কর যে, সকল মানুষের মধ্যে শুধু তোমরাই আল্লাহ পাকের বন্ধু, তবে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক"।

ইহুদীরা আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অমান্য করতো, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থকেও অস্বীকার করতো, তাদের এত মূর্খতা এবং ধৃষ্টতা সত্ত্বেও তারা দাবী করতো, দুনিয়াতে তারাই আল্লাহ পাকের প্রিয়পাত্র, আর কেউ নয়। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ যদি একথা সত্য হয় যে, তোমরাই আল্লাহর ওলী, তাহলে এই কষ্টের দুনিয়াতে কেন বাস করছো? তোমরা মৃত্যু কামনা কর, মৃত্যুর সদর রাস্তা ধরে সরাসরি বেহেশতে চলে যাও, বেহেশতের সকল নেয়ামত তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

যারা আল্লাহ পাকের প্রিয়পাত্র, যারা আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ-মত্ত, তারা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যু কামনা করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা, যেমন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৫

لوددت انى اقتل فى سبيل الله ثم أحى ثم اقتل

"আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে, আল্লাহ্ পাকের রাহে শাহাদাত বরণ করি. এরপর পুনর্জীবন লাভ করি, পুনরায় আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করি"।

অর্থাৎ বারে বারে আল্লাহর রাহে মৃত্যু বরণ করি, এ আকাঙ্ক্ষা করেছেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

অতএব, এহ ইহুদীরা! যদি তোমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের প্রিয়পাত্র হও, যেমন তোমরা দাবী করছো, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, এভাবে তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন ঃ মৃত্যু হলো একটি সেতু, যা এক বন্ধুকে আরেক বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

এ জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করার এবং দ্রুত আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথই হলো মৃত্যু। অতএব, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ পাকের প্রিয়পাত্র হয়ে থাক, তবে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা কর।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۷﴾
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ
اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى
ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾ فَاِذَا
قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا
انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ
وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱﴾

তরজমা

(৭) কিন্তু তাদের পূর্বকৃত কীর্তিকলাপের কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ পাক জালেমদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর, তা তোমাদের সাথে অবশ্যই মোলাকাত করবে, এরপর তোমরা ফিরে যাবে সেই আল্লাহ

পাকের নিকট, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত, তিনি তখন তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন।

(৯) হে মোমেনগণ! জুমআর দিন যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্ পাকের জিকরের জন্যে দ্রুত বেগে ছুটে যেও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

(১০) যখন নামায সুসম্পন্ন হয়ে যায়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্ পাকের দানের অন্বেষণ কর, আর (তখনও) তোমরা অধিক পরিমাণ আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করতে থাক, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(১১) আর যখন তারা দেখতে পায় ব্যবসা বা খেল-তামাশা, তখন (হে রসূল!) তারা সেদিকে ছুটে যায় আর আপনাকে রেখে যায় দন্ডায়মান অবস্থায়, (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকের নিকট যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা এবং ব্যবসা থেকে অতি উত্তম, আর আল্লাহ্ পাক সর্বাপেক্ষা উত্তম রিয্ক দানকারী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ইহুদীরা এ অসার ও ভিত্তিহীন দাবী করতো যে, শুধু তারাই দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের প্রিয়পাত্র, তখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় যে, যদি তোমাদের এ দাবী সত্য হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, কিন্তু একথা চির সত্য যে, ইহুদীরা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা, তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ

তাদের পূর্বকৃত কীর্তিকলাপের কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা, কেননা তারা অন্যায়-অনাচার এবং সর্ব প্রকার পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তওরাতে পরিবর্তন করেছিল, তওরাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত সম্পর্কে যে সব কথা রয়েছে সেগুলো তারা পরিবর্তন করেছে, এসব অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি যে দোযখ, একথা তারা বিলক্ষণ জানে আর জানে বলেই তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতো তবে নিশ্চয় তাদের মৃত্যু হয়ে যেত এবং নিজেদেরকে দোযখে দেখতে পেত। যদি তারা মৃত্যু কামনার জন্যে ময়দানে আসত, তবে প্রত্যাবর্তন করে তাদের পরিবারবর্গকে আর দেখতে পেতনা।

এই হাদীস বোখারী শরীফ, তিরমিজী শরীফ এবং নাসায়ী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

মূলতঃ ইহুদীরা মৃত্যু-ভয়ে অধিক ভীত, কিন্তু মৃত্যুকে ভয় করলেই তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়না, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর, তা অবশ্য অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। এরপর তোমরা ফিরে যাবে সেই আল্লাহ পাকের দরবারে, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পূর্ণ অবগত। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে"।

মূলতঃ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষার কোন পথ নেই, আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতে এবং আদেশেই এ পৃথিবীতে মানুষ জীবন লাভ করে, আর তাঁরই নির্দেশক্রমে মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ পাকের অলংঘনীয় বিধান, এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা লৌহ নির্মিত সুরক্ষিত ইমারতে আত্মরক্ষার যত চেষ্টাই কর না কেন, যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমদেরকে পেয়ে যাবে"।

আর সূরা আর রাহমানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের মহান সত্ত্বা"।

কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে মানব জীবনের চির অবসান ঘটেনা; বরং এ জীবনেরই আরেকটি মঞ্জিল শুরু হয়, আর তা হলো আলেমে বরজখ বা মধ্যলোকের জীবন। এ জীবন দুনিয়ার জীবনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ তবু তা চিরস্থায়ী নয়; কেয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) কর্তৃক শিংগায় ফুঁক দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ মাত্রকে মধ্যলোকে থাকতে হবে। এরপর প্রত্যেকটি মানুষকে হাযির হতে হবে শেষ বিচারের দিনে হাশরের ময়দানে। তখনকার একদিন হবে দুনিয়ার জীবনের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সেখানে হবে ভাল-মন্দের, সত্য-অসত্যের, হক্ব-বাতিলের বিচার। এ বিচারের পর যারা ঈমানদার ও নেককার হবে, তাদেরকে চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতে স্থান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, যারা বেঈমান

ও পাপাচারী, স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে চির শাস্তির কেন্দ্র দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এরপর তোমরা ফিরে যাবে সেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন এবং কৃতকর্মের বদলা অবশ্যই তোমাদেরকে দেয়া হবে। আর এজন্যেই সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"আর তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যাবে। এরপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা"।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মোমেনগণ! জুমআর দিন যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ পাকের জিকরের জন্যে দ্রুত বেগে ছুটে যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর"।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে। ইহুদীরা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো যে, পৃথিবীতে তারাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আখেরাতের সমস্ত নেয়ামত তাদের জন্যেই সংরক্ষিত, তাই তাদের জবাবে এরশাদ হয়েছে, যদি একথাই সত্য হয় তবে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা কর এবং আখেরাতের নেয়ামত ভোগ করার জন্যে চলে যাও। এরপর এরশাদ হয়েছে, ইহুদীরা আদৌ মৃত্যু কামনা করবে না, কেননা তারা জানে তাদের পাপাচারের শাস্তি অবধারিত, তাই তারা মৃত্যুকে ভয় করে। এর পাশাপাশি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, মৃত্যুকে ভয় করলেও মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই নেই।

ইহুদীদের আরও একটি ভুল ধারণা ছিল, তাদের জন্যে রয়েছে, শনিবারের দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়, যার সম্মান করা তাদের কর্তব্য, এটি অত্যন্ত বরকতময় দিন। মুসলমানদের নিকট এমন দিন নেই। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে জুমআর দিনের ফজিলত ও গুরুত্ব ঘোষণা করে, জুমআর নামায আদায়ের জন্যে হাযির হওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং জুমআর আযানের পর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদীদের বিশেষ দিন শনিবার এবং নাসারাদের সাপ্তাহিক দিন রবিবারের চেয়ে জুমআর দিনের ফজিলত ও মাহাত্ম অধিকতর।

জুমআর দিনের ফজিলত

কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, মাত্র ছয় দিনে আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। এ ছয় দিনের সর্বশেষ দিনই হল জুমআর দিন। এ দিনেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি পরিপূর্ণ হয়। এই জুমআর দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। আর এ দিনই তাঁকে জান্নাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়। আর ঐ দিনই বেহেশত থেকে তাঁকে বের করা হয়। আর এ জুমআর দিনই কেয়ামত কায়েম হবে। জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন বন্দা আল্লাহ পাকের নিকট যা কিছু চায় আল্লাহ পাক তাই তাকে দান করেন।

جمعة শব্দটি جمع থেকে নিস্পন্ন, এর অর্থ একত্রিত হওয়া।

নামকরণের কারণ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর নবী! কি কারণে এ দিনের নামকরণ করা হয়েছে জুমআর দিন? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যেহেতু তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর মাটি সেদিনই একত্রিত করা হয়, আর এ দিনের শেষ ভাগে এমনি একটি মূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে যখন বন্দা যা কিছু চায়, তা আল্লাহ পাক দান করেন।

ইমাম আহমদ, নাসায়ী, এবনে খোজায়মা এবং এবনে হাব্বান হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তোমরা কি জান জুমআর দিনের তাৎপর্য কি? আমি আরজ করলাম, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল তা জানেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার এ প্রশ্নটি করলেন এবং তৃতীয়বার এরশাদ

করলেনঃ এ-তো সেদিন, যেদিন তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর দেহের উপকরণ একত্রিত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দিনে জুমআর নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, প্রাক-ইসলামী যুগে জুমআর দিনকে "আল আরূবা" (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের দিন) বলা হতো। কা'ব এবনে লুআই নামক এক ব্যক্তি এ দিনের "আল আরূবা" নামকরণ করে। কোরায়শরা কা'বের নিকট একত্রিত হতো। কা'ব তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিত এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিত এবং তাদেরকে হুকুম দিত, যখন তাঁর আবির্ভাব হবে তখন তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁর অনুসারী হবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, কা'ব এবনে লুআইয়ের মৃত্যুর পর লোকেরা তার প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের অপেক্ষা করতো এবং বছরের হিসাব করতো।

বর্ণিত আছে যে, কা'ব এবনে লুআইয়ের মৃত্যুর ৫৬০ বছর পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়।

আবদুর রাজ্জাক এবনে সিরীনের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ মদীনা তৈয়্যেবায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা আসআদ এবনে জোরারা (রাঃ)-এর নিকট জুমআর দিন একত্রিত হতেন। ঐ দিনকে তারা "ইয়াওমুল আরূবা" বলতেন। আসআদ এবনে জোরারা (রাঃ) তাঁদের নামাযে ইমামতি করতেন, উপদেশ দিতেন, যেহেতু আনসারগণ সেদিন একত্রিত হতেন, তাই তারা সেদিনের নামকরণ করলেন "ইয়াওমুল জুমআ"।

মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রথম জুমআ আদায়

বোখারী শরীফে সংকলিত, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসী যখন শ্রবণ করলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হয়েছেন, তখন তাঁরা প্রতি দিন সকালে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে "হাররা" নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর অপেক্ষা করতেন। সূর্যের তাপ প্রখর হলে তাঁরা শহরে ফিরে আসতেন। এটি ছিল গরম কাল। যেদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়েছে, সেদিনও তাঁরা অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করে নিজ নিজ ঘর-বাড়িতে ফিরে এসেছেন। ঘটনাক্রমে এক ইহুদী সর্বপ্রথম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন লক্ষ্য করলো, তখন সে চিৎকার দিয়ে বললো, "হে গোত্রবাসী! তিনি এসে গেছেন, তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে"। একথা শ্রবণ করা মাত্র মদীনাবাসী মুসলমানগণ ছুটে গেলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এস্তেকবাল করলেন। এটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ, সোমবার। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "কোবা" নামক স্থানে পৌঁছেন। তিনি বনী আমর এবনে আওফের মহল্লায় কুলসুম এবনে হাদাম এবং আবু বকর হাবীব এবনে আসাফের গৃহে উঠলেন। কুলুসম চিৎকার দিয়ে তার নাজীহ নামক গোলামকে ডাকল, নাজীহ শব্দটি শ্রবণ করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে আবু বকর (রাঃ)! আমি সফল হয়েছি (নাজীহ শব্দের অর্থ সাফল্য)।

কোবা নামক স্থানে কুলসুম এবনে হাদামের এ স্থানটিতে খেজুর ছড়িয়ে রাখা হতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুলসুমের কাছ থেকে স্থানটি নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করলেন। এ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

"যে মসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে তাকওয়া পরহেযগারীর উপর"।

বর্ণিত আছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী আমরের মহল্লায় দশ দিনের অধিক অবস্থান করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন।

এবনে এসহাক বলেছেন, পাঁচ দিন অবস্থান করেন।

এবনে হাব্বান বলেছেন, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার, তিন দিন তিনি ঐ মহল্লায় অবস্থান করেন। জুমআর দিন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসেন।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত এবনে আকাবা (রাঃ) বলেছেন, তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন।

মূলতঃ তাঁরা আগমন এবং গমনের দিনকে হিসেবে ধরেননি।

ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) এর সূত্রে এবং সায়ীদ এবনে মানসুর হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের লোকদেরকে খবর দিলেন, আত্মীয়তার দিক থেকে তারা তাঁর মামা হতেন, তারা তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় হাযির হলেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমাদের

এখানে তশরিফ নিয়ে চলুন, শান্তি এবং নিরাপত্তায় থাকবেন। আপনার হুকুম পালন করা হবে, এটি ছিল জুমআর দিন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর "কোসওয়া" নামক উষ্ট্রীতে আরোহন করলেন। অনেক লোক তাঁর ডানে বামে পেছনে সমবেত হলেন। কিছু লোক সওয়ারীর উপর আরোহন করলেন, আর কিছু লোক পদব্রজে চললেন, এ দৃশ্য দেখে বনী আমর এবনে আওফের লোকেরা একত্রিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আমাদের বাড়ী থেকে উত্তম বাড়ীতে তশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন? তিনি এরশাদ করলেন, আমাকে এমন স্থানে অবস্থানের হুকুম দেয়া হয়েছে যা সকল জনপদের কেন্দ্র হবে। তোমরা এ উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট রয়েছে, যেখানে হুকুম হবে, সেখানে সে থেমে যাবে।

যাহোক, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোবা থেকে মদীনা মোনাওয়্যারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অনেক লোক তাঁর এস্তেকবালের জন্যে এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহু আকবর বলে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তুললেন এবং বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নারী শিশু সকলে তখন খুশীতে কবিতা আবৃত্তি করছিল।

طلع البدر علينا = من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا = ما دعا لله داع

"সানিয়াতুল বেদা থেকে আমাদের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র উদিত হয়েছে, অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো শোকর আদায় করা"।

"যতদিন এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন দোয়া প্রার্থী দোয়া করতে থাকবে, ততদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য"।

মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রবেশের নয়নাভিরাম দৃশ্য

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত বরা (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, তিনি বলেছেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের কারণে মদীনাবাসী যত আনন্দিত হয়েছে, আমি তাদেরকে আর কখনো এত উৎফুল্ল হতে দেখিনি। আনসারগণের যে বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে তিনি অতিক্রম করতেন, সে বাড়ী থেকেই লোকেরা বলতো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তশরিফ নিয়ে আসুন, আপনার জন্যে হেফাজত এবং আরামের ব্যবস্থা আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে দোয়া করতেন এবং এরশাদ করতেন, এ উষ্ট্রীটি আদিষ্ট হয়ে আছে, তোমরা তার পথ ছেড়ে দাও।

বনী সালেম গোত্রের এলাকা অতিক্রম করার সময় ওতবা এবনে মালেক এবং নওফেল এবনে আবদুল্লাহ এবনে মালেক আসলেন এবং উটের রশি ধরে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের নিকট অবতরণ করুন, আমাদের জনসংখ্যা অধিক, আমাদের আসবাবপত্রও অনেক, আমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত, আমাদের বাগ-বাগিচা রয়েছে, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যে দুশমনের ভয়ে আমাদের নিকট আশ্রয়-প্রার্থী হতো, আমরাই তাকে আশ্রয় দিতাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং এরশাদ করলেন, এ উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট রয়েছে।

আবদুল্লাহ এবনে সামেত (রাঃ) এবং আব্বাস এবনে ফজলা (রাঃ) হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! দয়া করে আমাদের নিকট অবতরণ করুন, তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বরকত দান করুন, এ উষ্ট্রীটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট, তিনি বনী সালেমের এলাকায় পৌঁছলেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মসজিদে বনী সালেমের মহল্লায় তিনি আগমন করলেন, আর ঐ মসজিদে তিনি জুমআর নামায আদায় করলেন। বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম মদীনা মোনাওয়্যারায় জুমআর নামায আদায় করেন এবং মদীনা শরীফেই জুমআর প্রথম খোতবা দান করেন।[১]

এবনে সা'দ বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন জুমআর নামায আদায় করেন তখন তাঁর সঙ্গে একশত ব্যক্তি এই নামায আদায় করেন, এরপর তিনি ডান দিকে রওয়ানা হন, যখন বনী সা'দ গোত্রের এলাকা অতিক্রম করলেন তখন সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ), মুনজের এবনে আমর (রাঃ) এবং আবু দোজানা (রাঃ) হাযির হলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সম্পদ, বীরত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য, অনেক খেজুরের বাগান এবং কূপ আমার সম্প্রদায়ের চেয়ে অধিক কোন গোত্রের নেই। অতএব, আমাদের এ গোত্রেই দয়া করে অবতরণ করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট হয়ে রয়েছে। যেখানে অবতরণ করার নির্দেশ হবে, সে সেখানেই থেমে যাবে। এরপর তিনি আরো অগ্রসর হন, তখন হাযির হলেন সা'দ এবনে রবী (রাঃ), আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) এবং শেবর এবনে সা'দ (রাঃ)। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের ছেড়ে আর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৬৩-৬৭
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩৯-৪১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৯৮-১০১

অগ্রসর হবেন না। যিয়াদ এবনে লবীদ এবং ফরওয়া এবনে ওমরও এ আবেদনই করলেন, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই জবাব দিলেনঃ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও, সে আদিষ্ট।

এরপর তিনি বনী আদী নাজ্জারীর দিকে তশরীফ নিয়ে গেলেন (তাঁর পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতা এ গোত্রেরই ছিলেন)। আবু সালিতা এবং সারফা এবনে আবিয়ানিস আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে ছেড়ে আর অগ্রসর হবেন না, আমাদের সংখ্যা অনেক, আমাদের শক্তিও রয়েছে এবং রয়েছে আপনার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা। আপনার এ আত্মীয়তার কারণে আমরাই আপনার হক্বদার, আর কেউ নয়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও, সে হুকুমের গোলাম। যাহোক, উষ্ট্রী আরও অগ্রসর হলো, এমনকি বনী নাজ্জার গোত্রের এলাকা থেকেও সম্মুখে পৌঁছলো, এরপর মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে উষ্ট্রীটি বসে গেল। জাব্বার এবনে সখর নামক এক ব্যক্তি এই আশায় তার দেহে আঘাত করলো যে হয়তো সে উঠবে। কিন্তু উষ্ট্রীটি আর উঠলোনা। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবতরণ করলেন এবং এরশাদ করলেন, এখান থেকে কার গৃহ সবচেয়ে নিকটে? হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আরজ করলেন, আমার এ গৃহটি সবচেয়ে নিকটে। হযরত রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ গৃহেই অবস্থান করলেন এবং চারবার এ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে বরকতময় স্থানে অবতরণের তৌফিক দান কর, তুমি উত্তম অবতরণকারী"।

তেবরাণী হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়েরের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহে অবতরণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে হযরত যায়েদ এবনে হারেসাও (রাঃ) ছিলেন।

এবনে এসহাক 'আল মোবতাদা'য় এবং এবনে হিশাম আত্ তিযান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর যে গৃহে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন, তা নির্মাণ করেছিলেন তোব্বায়ুল আওয়ালুল হোমায়রী নামক একজন বাদশাহ। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে তদানীন্তন পৃথিবীতে পাঁচজন বাদশাহ ছিলেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন তোব্বাউল আওয়ালুল হোমায়রী।

বর্ণিত আছে যে, এ ব্যক্তিই সর্ব প্রথম কা'বা শরীফে গেলাফ পরিয়ে দেয়। সে একবার তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মক্কার অদূরে অবস্থান নিয়েছিল। তিন দিন যাবত অপেক্ষা করার পরও কোন মক্কাবাসী তার সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। সে রাগান্বিত

হয়ে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করে, মক্কাবাসীর তার নিকট হাযির না হওয়ার কারণ জানতে। তখন তাকে বলা হয় যে, তাদের নিকট একটি ঘর আছে, তারা সর্বক্ষণ ঐ ঘরের তওয়াফ করে, আর এ কারণে তারা আপনার নিকট আসেনি। তখন সে বললো, তাদের এ ঘরটি আমি ভেঙ্গে ফেলবো। এ বেআদবীপূর্ণ কথার কারণে তার প্রচন্ড মাথা ব্যথা আরম্ভ হলো। সে অসহায় অবস্থায় "হায়! আমার মাথা" বলে চিৎকার শুরু করলো এবং তার দেহ থেকে এত দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো যে, কেউ তার কাছে আসতে পারতো না, কেননা যে তার কাছে যেত তার দেহেও তেমন গন্ধ বের হতো। ঐ সময় সে যুগের যে সব আলেম তার সাথে ছিলেন, তাঁরা বললেন, হে বাদশাহ! তুমি আল্লাহর ঘরের শানে বেআদবী করেছ, তাই তোমার এ অবস্থা। তুমি তওবা কর, ক্ষমা প্রার্থী হও, হয়তো আল্লাহ পাক তোমাকে সুস্থ করবেন। তখন সে তওবা করলো এবং শপথ করে বললো, যদি আল্লাহ পাক আমার দেহ সুস্থ করে দেন তবে আমি তাঁর ঘর কা'বা শরীফের উপর গেলাফ পরাবো। তওবার পর আল্লাহ পাক তাকে সুস্বাস্থ্যের নেয়ামত দান করলেন এবং সে তার শপথ পূর্ণ করলো। কা'বা শরীফের উপর গেলাফ পরিয়ে দিল। এরপর সে মদীনা মোনাওয়্যারায় হাযির হলো। তার সঙ্গে চারশত ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। তাঁরা পরস্পর পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তাঁরা মদীনা শরীফেই অবস্থান করবেন। সেখান থেকে আর কোথাও যাবেন না। তাঁরা তাদের এ সিদ্ধান্ত বাদশাহকে জানিয়ে দিলেন। সে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের কিতাবে এ তথ্য পেয়েছি, সর্বশেষ নবী যাঁর নাম হবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর হিজরতের স্থান হবে এ শহরটি, তাই আমরা এখানে থাকতে চাই এ আশায় যে, হয়তো আমরা তাঁকে পেয়ে যাব। একথা শ্রবণ করে তোব্বাও ইচ্ছা করলো যে সে-ও এ শহরে অবস্থান করবে। পরে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো এবং প্রত্যেক আলেমকে একটি করে বাড়ী নির্মাণ করে দিল এবং তাদের প্রত্যেকের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিল এবং প্রত্যেককে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়ে গেল। একটি দলিল লিখে দিল, যাতে তার মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করলো। এ দলিলে সে একথাও লিখেছিল যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি, আহমদ আল্লাহর রসূল। যদি আমার জীবদ্দশায় আমি তাঁকে পাই তবে আমি তাঁর সাহায্যকারী হবো। তোব্বা এ দলিলকে মোহরাংকিত করলো এবং ইহুদী আলেমদের দলপতির নিকট অর্পণ করলো এবং তাঁর নিকট এই আবেদন করলো, যদি তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পেয়ে যান, তবে যেন তোব্বার পক্ষ থেকে এ দলিলটি তাঁকে দেন। যদি তিনি না পান তবে তাঁর পুত্র, এরপর তাঁর পৌত্র, এরপর যে-ই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পান, তিনি যেন এ দলিলটি হস্তান্তর করেন।

তোব্বা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে একটি বাড়িও নির্মাণ করেছিল, যখন তিনি মদীনা শরীফে আগমন করবেন, তখন যাতে তিনি এ বাড়িতে অবস্থান করতে পারেন। এ বাড়িটির মালিকানা হস্তান্তর হতে হতে হযরত আবু আইউব আনসারীর (রঃ) নিকট আসে। তিনি ঐ আলেমের বংশধর, যিনি ইহুদী আলেমগণের দলপতি ছিলেন। মদীনাবাসীগণের মধ্যে যে কেউ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী হয়েছেন, তিনি ঐ আলেমগণেরই বংশধর ছিলেন, যাঁদেরকে তোব্বা এ শহরে আবাদ করেছিল।[১]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ

(হে মোমেনগণ! যখন (জুমআর নামাযের জন্যে) আযান দেয়া হয়।)

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, তাই মৃত্যু অনিবার্য এবং আখেরাত অবধারিত। অতএব, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ একান্ত করণীয়, আর এতেই মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আখেরাতের প্রস্তুতি স্বরূপই আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া একান্ত জরুরী, আর আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নামায, এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে নামাযের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে বিশেষতঃ জুমআর দিন যাকে "সাইয়্যেদুল আইয়্যাম" (দিনগুলোর নেতা) বলা হয়, সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে যখন জুমআর নামাযের আযান হয় তখন যাবতীয় কর্মকান্ড ছেড়ে দিয়ে তোমরা আল্লাহ পাকের স্মরণে দ্রুত হাযির হও, এজন্যে ফেকাহবিদগণ বলেছেন, জুমআর আযানের পর ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম হয়ে যায়, কেননা এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেনঃ وذروا البيع (এবং তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর, আল্লাহ পাকের স্মরণের জন্যে তথা নামাজের জন্যে ছুটে যাও) জুমআর নামাযের জন্যে জামাআত শর্ত, যদি কেউ জুমআর নামাযের জামাআতে হাযির হতে না পারে, তবে তা একা আদায়ের কোন সুযোগ নেই।

জুমআ' সম্পর্কে আরও জ্ঞাতব্য

আলোচ্য আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে তা হলো সেই আযান, যা ইমাম মিম্বরে উপবিষ্ট হওয়ার পর দেয়া হয়, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে জুমআর আযান তখনই দেয়া হতো, যখন ইমাম মিম্বরে উপবিষ্ট হতেন, কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যুগে যখন মুসল্লীদের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৬৮

সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল, তখন পূর্বে আরো একটি আযানের ব্যবস্থা হলো, যা মিনার থেকে দেয়া হয়।

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যখন আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকরের দিকে ছুটে যাও। আল্লাহ পাকের জিকর তথা খোতবা শ্রবণ এবং নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে দ্রুত গমন কর, আর এক্ষেত্রে দ্রুত গমনের অর্থ হলো অন্য কোন কাজে মশগুল না হওয়া, আযান হওয়া মাত্র নামাযের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা, মনকে দরবারে এলাহীতে হাযির করার জন্যে তৈরী করা, জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক ঘণিষ্ঠতর করতে সচেষ্ট হওয়া, এজন্যে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, فاسعوا শব্দ দ্বারা এক্ষেত্রে দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়; বরং মনকে নামাযের জন্যে প্রস্তুত করা, দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিহার এবং মসজিদে হাযির হওয়া উদ্দেশ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন নামায কায়েম হয় তখন তোমরা দৌড়ে যেওনা, বরং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ধীর-স্থির ভাবে মসজিদে গমন করবে।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

এটি তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা, অর্থাৎ জুমআর আযানের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিত্যাগ করা এবং নামাযের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে উত্তম, কল্যাণকর, যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পার।

জুমআর নামাযের জন্যে তাগিদ

আলোচ্য আয়াত দ্বারা এবং এ সম্পর্কীয় হাদীস সমূহ দ্বারা জুমআর নামায ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমরা (দুনিয়াতে) পরে এসেছি, আর কেয়ামতের দিন আগে থাকবো, আর আসমানী কিতাব তাদেরকে আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে পরে। এরপর এ জুমআর দিনটি তাদেরকেও দেয়া হয়েছে, তাদের প্রতিও এ দিন এবাদত ফরজ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে জুমআর দিনের ব্যাপারে মতবিরোধ হলো, তাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে জুমআর ব্যাপারে পথ-প্রদর্শন করলেন, অন্য লোকেরা আমাদের পেছনে পড়ে গেল, ইহুদীরা পরের দিন (শনিবার), আর নাসারারা তার পরের দিন (রোববার) গ্রহণ করলো।

হযরত আবু ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে অথবা দন্ডায়মান হয়ে এরশাদ করেছেনঃ

জুমআর নামায পরিত্যাগকারীরা যেন বিরত হও, নতুবা আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহরাংকিত করে দেবেন এবং তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মুসলিম শরীফ)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিছু লোক জুমআর নামাযে হাযির হতোনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় আমার স্থলে কোন ব্যক্তিকে নামাযের ইমামতির জন্যে নিযুক্ত করে নিজে সে সব লোকদের ঘরে অগ্নি সংযোগ করি, যারা জুমআর নামাযে অনুপস্থিত থাকে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত তারেক এবনে শেহাব (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চারজন ব্যতীত জুমআ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। ঐ চারজন হলো (১) গোলাম, (২) স্ত্রীলোক, (৩) শিশু (৪) রুগ্ন। (আবু দাউদ শরীফ)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে তিন জুমআ বর্জন করবে, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে মোহরাংকিত করে দেবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী, এবনে খোজাইমা, এবনে হাব্বান)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ওজর ব্যতীত জুমআর নামাজ পরিত্যাগ করবে, তাকে মুনাফেক বলে লিপিবদ্ধ করা হবে। এ লেখাকে মুছে ফেলা হবেনা, এতে আর কোন পরিবর্তনও করা হবেনা।[১]

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপর ঈমান রাখে, তার উপর জুমআ পড়া ওয়াজিব। অসুস্থ, মুসাফির, স্ত্রীলোক বা গোলাম, তাদের প্রতি জুমআ ওয়াজিব নয়। যে ব্যক্তি খেলা-ধূলায় মত্ত থাকার কারণে অথবা ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকার কারণে জুমআর নামাজের পরোয়া করবে না, আল্লাহ পাক তার পরোয়া করবেন না, আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, সকল প্রশংসা তাঁরই। (দারে কুতনী)

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জুমআর নামায ফরজ, সকলের জন্যে অবশ্য কর্তব্য, যে মুসাফির, তার উপর জুমাআর নামায ফরজ নয়। যে অন্ধ ব্যক্তির পথ-প্রদর্শক নেই, তার উপরও জুমআর নামায ফরজ নয়। তবে যদি সে এমন কাউকে পায় যে তাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, তবে ইমাম মালেক

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৭১

(রঃ), ইমাম শাফেয়ী, (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, এমন অন্ধের উপর জুমআর নামায ফরজ। তাঁদের দলিল হলো হাদীস শরীফে জুমআর তাগিদ রয়েছে, তাতে অন্ধ ব্যক্তিকে বাদ দেয়া হয়নি। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, অন্ধ ব্যক্তির উপর জুমআ ওয়াজিব নয়, তার সাহায্যকারী থাকুক বা না থাকুক, কেননা হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, রুগ্ন ব্যক্তির উপর জুমআ ওয়াজিব নয়, আর অন্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে রুগ্ন।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদি গোলাম বা স্ত্রীলোক অথবা রুগ্ন ব্যক্তি জুমআর নামাযে হাযির হয় এবং জুমআর নামায আদায় করে তবে তা সঠিক হবে এবং যোহরের ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

জুমআর নামাযের জন্যে খোতবা শর্ত, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম সম্পূর্ণ একমত, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা জুমআর নামাযে খোতবা পাঠ করেছেন।

হযরত যাবের এবং আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হয়ে খোতবা দিয়েছেন, এরপর উপবিষ্ট হয়েছেন। পুনরায় দাঁড়িয়ে খোতবা দিয়েছেন, এরপর উপবিষ্ট হয়েছেন।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) আরও বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'টি খোতবা দিতেন এবং উভয় খোতবার মধ্যে বসতেন। খোতবায় তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করতেন এবং মানুষকে নসিহত করতেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকেও এমনি বর্ণনা রয়েছে।

এখানে আরও উল্লেখ্য, জুমআর খোতবায় পাঁচটি বিষয় থাকা সুন্নত (১) আল্লাহ পাকের হাম্‌দ, (২) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা, (৩) তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের উপদেশ দেয়া এবং (৪) মোমেনদের জন্যে দোয়া করা। (৫) এতদ্ব্যতীত, ইমাম যখন জুমআর খোতবা প্রদান করেন তখন কোন কথা বলা হারাম হয়ে যায়, এমনকি তখন নামায আদায় করাও বৈধ নয়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু তাই নয়; হযরত আবু হোবায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ইমাম খোতবা পাঠ করে, আর তোমার সাথী কথা বলে, তখন যদি তুমি তাকে বল নীরব থাক তবে তুমি অহেতুক কথা বললে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা "কথা বলোনা" একথাও বলোনা'।

জুমআর দিন গোসল করা সুন্নত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করতে আসে, তার কর্তব্য হলো গোসল করা।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জুমআর দিন প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির কর্তব্য হলো গোসল করা, মেসওয়াক করা এবং যদি সম্ভব হয় তবে খুশবু ব্যবহার করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে দিনগুলোর উপর সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সর্বাধিক উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এ দিনই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর ঐ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে আর ঐ দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, আর ঐ দিনই কেয়ামত কায়েম হবে।

দোয়া কবুল হবার বিশেষ সময়

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জুমআর দিন এমন একটি বিশেষ সময় আছে, যখন বন্দা আল্লাহ পাকের দরবারে যা চায়, আল্লাহ পাক দয়া করে তা দান করেন। কিন্তু তা কোন্ সময়?

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে সময়টি হলো ইমাম যখন মিম্বরে বসেন, তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, জুমআর দিন কোন্ বিশেষ সময়ে দোয় কবুল হয়? তখন তিনি বলেছেন, জুমআর দিনের শেষ সময়টিতে (তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ হলো জুমআর দিনের আছর থেকে মগরিবের মধ্যবর্তী সময়)। সে সময় যদি কোন মুসলমান বন্দা দোয়া করে, আল্লাহ পাক তা কবুল করেন। তখন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আছর এবং মগরিবের মধ্যে তো কোন নামায নেই। জবাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি একথা বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে নামাযের হুকুমেই থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন।

তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসের এটিই অর্থ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জুমআর দিন আসর এবং মগরিবের সময় অত্যন্ত বরকতময়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ জুমআর দিন যে সময়টিতে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করেন তা আমি আশা করি সে সময়টি হলো, যখন মোয়াজ্জেন জুমআর নামাযের আযান দেয়। অথবা যখন ইমাম মিম্বরে বসেন, অথবা যখন জুমআর নামাযের জন্যে একামত দেয়া হয়।

তাউস এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সে সময়টি হলো আসরের পর মগরিব পর্যন্ত।

তত্ত্বজ্ঞানীদের অনেকে বলেছেন, যেভাবে আল্লাহ্ পাক এসমে আজমকে গোপন রেখেছেন, লাইলাতুল কদরকে গোপন রেখেছেন, ঠিক তেমনি জুমআর দিনের এ সময়টিকেও গোপন রেখেছেন।[১]

এ বিশেষ মুহূর্তটি গোপন রাখার একটি হেকমত হলো, এর অন্বেষণে জুমআর দিন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাগণ আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে অতিবাহিত করবেন, আর এভাবে আশা করা যায় যে, বিশেষ সময়টি তারা পেয়ে যাবেন। যেমন শবে কদরের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা হলো রমজানের শেষ দশকের যে কোন বেজোড় রাত, যারা এ'তেকাফ করেন, তাঁদের সম্পর্কে এ আশা করা যায় যে, তাঁরা ঐ রাতটি পেয়ে যাবেন।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) "ফতহুল বারীতে" জুমআর দিনের ঐ সময়ের ব্যাপারে চল্লিশটি মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইমাম জযরী (রঃ), যিনি বিখ্যাত গ্রন্থ "হেসনে হাসীন"-এর লেখক, তিনি বলেছেন, খোতবার জন্যে ইমাম যখন আসেন তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।

এবনে খোযায়মা হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সে সময়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি জানতাম, কিন্তু এরপর আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন শবে কদরের কথা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০১

জুমআর দিনের বিশেষ আমল

জুমআর দিনের বিশেষ আমল হলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জুমআর দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পেশ কর, কেননা এটি এমনি মোবারক দিন যে সেদিন ফেরেশতাগণ হাযির থাকে। যে আমার প্রতি জুমআর দিন দরুদ শরীফ প্রেরণ করে, তা আমার সম্মুখে পেশ করা হয়। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার ইন্তেকালের পরও কি এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আমার ইন্তেকালের পরও এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ পাক যমীনের প্রতি নবীগণের দেহ মোবারক বিনষ্ট করা হারাম করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর রওজায়ে পাকে জীবিত আছেন, আর তাতেই তাঁকে রিয্‌ক দেয়া হয।

মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ্ পাক যমীনের প্রতি আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারক বিনষ্ট করা হারাম করে দিয়েছেন, তাই তাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তাঁদের জন্যে কোন পার্থক্য নেই। এই হাদীসে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক এবং রুহ মোবারক উভয়ের প্রতিই দরুদ শরীফ পেশ করা হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ পুলসেরাত অতিক্রম করার সময় নূর প্রাপ্তির কারণ হবে। আর যে জুমআর দিন ৮০ বার আমার প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ (সগীরা) মাফ হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন আছরের নামাযের পর নামাযের স্থান থেকে না উঠে নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ পাঠ করবেঃ

اللهم صل على محمدن النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما

তবে তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং আশি বছরের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

জুমআর দিনের ফজিলত সম্পর্কে আরো প্রনিধানযোগ্য, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মুসলমান জুমআর দিন রা রাতে এন্তেকাল করে, আল্লাহ পাক তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন।

একটি সতর্কবাণী

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (জুমআর নামাযের সময়) তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে নিজে না বসে; বরং যদি স্থানাভাব হয়) তবে বলবে, একটু স্থান দিন (মুসলিম শরীফ)।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি অহেতুক কথা-বার্তা বলে এবং মানুষের গর্দানের উপর দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয় তার জুমআর সওয়াব হয়না, তবে জোহরের নামায আদায় হয়ে যায় (আবু দাউদ শরীফ)।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"আর যখন নামায সুসম্পন্ন হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, এবং আল্লাহ্ পাকের দানের অন্বেষণ কর, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ কর। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আযান হলে অনতিবিলম্বে নামাযের জন্যে হাযির হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যখন নামায সুসম্পন্ন হয় তখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হও, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিয্কের অন্বেষণ কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো যখন নামায সুসম্পন্ন হয় তখন ইচ্ছা হলে তুমি ব্যবসা-বাণিজ্যে যেতে পার, ইচ্ছা হলে তুমি মসজিদেও থাকতে পার। মুজাহেদ (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো নামায সুসম্পন্ন হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া এবং আল্লাহ পাকের দানের অন্বেষণ করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হলো। তোমরা ইচ্ছা করলে এ কাজে যেতে পার।

আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অনুমতি রয়েছে, জুমআর নামাযের পর ব্যবসা-বাণিজ্যে শরীক হওয়ার।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হাসান বসরী (রঃ), সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং মকহুল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে فضل الله শব্দটির অর্থ আল্লাহর দান তথা রিযক নয়; বরং এলম, অর্থাৎ তোমরা জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে বের হতে পার।

এরাক এবনে মালেক (রাঃ) জুমআর নামাযের পর মসজিদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তোমার তরফ থেকে আরোপিত ফরজ নামায আদায় করেছি। এরপর তোমার আদেশ মোতাবেক মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছি, অতএব তুমি আমাকে রিয্ক দান কর আর তুমি উত্তম রিয্ক দাতা।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ইহুদীরা তাদের সাপ্তাহিক দিন শনিবারকে শুধু এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট মনে করতো, ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে রাখত। এমনিভাবে নাসারারা তাদের সাপ্তাহিক বিশেষ দিন রবিবারের ব্যাপারেও এ নীতিই অবলম্বন করত। কিন্তু এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে মুসলমানদের জন্যে যে বরকতময় দিন শুক্রবার রয়েছে তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা জীবিকার সন্ধানে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, এভাবে ইহুদী নাসারাদের অনুসরণ যেন না করা হয় তার তাগিদ করা হয়েছে।[১]

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান প্রযোজ্য। তাই জাগতিক বিষয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাককে ভুলে যাওয়া কাম্য নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেকই ব্যবসা-বাণিজ্য বা জীবনের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। সততা, সত্যবাদিতা, ঈমানদারী, আমানতদারী, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই নামাযের পর ইসলামের বিধান মোতাবেক ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হওয়া অনুচিত কাজ নয়, কিন্তু হতে পারে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে জীবন ও জীবিকার মালিক আল্লাহ পাককে কেউ ভুলে যেতে পারে, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ পাককে ভুলে যেওনা; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জাগতিক ব্যাপারে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ কর, আর এভাবেই তোমরা জীবন-সাধনায় সফলকাম হবে।

হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করেঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৯
তফসীরে মাজেদী খন্ড- পৃষ্ঠা-১১০৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৯৯

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت
وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير

তবে আল্লাহ পাক তার জন্যে তার আমলনামায় এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করাবেন। হাজার হাজার সগীরা গুনাহ মাফ করবেন এবং তার মর্তবা অনেক বৃদ্ধি করবেন। (তিরমিজী)

হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সোবহানাল্লাহ পাঠ করা। আমরা আরজ করলাম, এর ব্যাখ্যা কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ (মজলিসে) পরস্পর লোকেরা কথা বলে, কিন্তু এরই মধ্যে আরেক ব্যক্তি "সোবহানাল্লাহ" পাঠ করতে থাকে (এ আমল আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত প্রিয়)। আল্লাহ পাকের দরবারে শাস্তিযোগ্য কাজ হলো তাহরীফ, বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহরীফের অর্থ কি? তিনি এরশাদ করেন, লোকেরা ভাল অবস্থায় থাকে, সে মুহূর্তে তার প্রতিবেশী বা সাথী যদি এসে কিছু চায় তবে সে বলে, আমি নিজেই দুরবস্থায় আছি। (তেবরানী)

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ যদি তোমরা দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সঠিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ কর এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন কর, তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا

"আর যখন তারা দেখে ব্যবসা-বাণিজ্য বা খেল-তামাশা, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায়, আর আপনাকে রেখে যায় দন্ডায়মান অবস্থায়"।

শানে নুযুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে নব্বীতে জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় মদীনা মোনাওয়্যারায় অত্যন্ত খাদ্যাভাব ছিল, অথচ ঐ খোতবার সময়ই সিরিয়া থেকে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা হাযির হয়। এমন অবস্থায় বারো জন সাহাবী ব্যতীত অন্যরা মসজিদ থেকে বের হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলে যান।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তদানীন্তন কালে ঈদের খোতবার ন্যায় জুমআর খোতবাও নামাযের পর দেয়া হতো। তাই তারা মনে করেছেন, নামাযতো হয়েই গেছে, অতএব যেতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যারা মসজিদ ছেড়ে ব্যবসায়ের কাফেলার নিকট চলে গিয়েছিলেন, তারা ছিলেন নও মুসলিম, সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, ইসলামের বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না।

যেহেতু তখন খাদ্য দ্রব্যের অভাব ছিল, আর ঐ কাফেলা খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে এসেছিল, তাই তাঁরা ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে ছুটে যান। কিন্তু যাঁরা দক্ষ এবং অভিজ্ঞ, এমন সাহাবায়ে কেরাম যাননি, তাঁদের সংখ্যা ছিল বারো জন। (১) হযরত আবু বকর (রাঃ), (২) হযরত ওমর (রাঃ), (৩) হযরত ওসমান (রাঃ), (৪) হযরত আলী (রাঃ), (৫) হযরত তালহা (রাঃ), (৬) হযরত যোবায়ের (রাঃ), (৭) হযরত সা'দ (রাঃ), (৮) হযরত সায়ীদ (রাঃ), (৯) হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ), (১০) হযরত বেলাল (রাঃ), (১১) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং (১২) হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত যাবের (রাঃ)। এ বারো জন ব্যতীত অন্য সাহাবায়ে কেরাম ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলে যান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا

হাসান এবং আবু মালেক বলেছেন, প্রায় এক বছর ধরে মদীনায় দূর্ভিক্ষের মত অবস্থা ছিল।

দাহইয়া এবনে খলিফা সিরিয়া থেকে কিছু জয়তুনের তৈল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খোতবায় রত ছিলেন। উপস্থিত লোকদের আশংকা ছিল, অন্য লোকেরা আমাদের পূর্বে গিয়ে সব জরুরী মালপত্র ক্রয় করে ফেলবে। তাই তারা খোতবা শ্রবণ ছেড়ে দিয়ে জান্নাতুল বাকীর দিকে চলে যান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে প্রাণ রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, যদি খোতবার সময় তোমাদের কেউ না থাকতো, তবে এই এলাকা অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেত, আর তোমাদের সকলকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলতো। যেহেতু ঐ ব্যবসায়ী কাফেলা তাদের আগমনের খবর প্রচার করার জন্যে তবলা বাজাচ্ছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে (খেল-তামাশা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, আল্লাহ পাকের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা খেল-তামাশা এবং ব্যবসা থেকে অতি উত্তম, আর আল্লাহ পাক উত্তম রিয্‌ক দাতা"।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জুমআর খোতবা দন্ডায়মান অবস্থায় দিতে হয়, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

অর্থাৎ (হে রসূল!) তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেছে।

রিয্‌কের অন্বেষণে ব্যাকুল হওয়া অনুচিত

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রিয্‌কের জন্যে অস্থির ও ব্যাকুল হওয়া অনুচিত। যে বন্দার জন্যে যা আল্লাহ্ পাক লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা অবশ্যই তার নিকট আসবে। অবশ্য এর জন্যে সুন্দরভাবে চেষ্টা করা এবং যা হালাল তা গ্রহণ করা এবং যা হারাম তা বর্জন করা কর্তব্য।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রিয্‌ক বন্দার অনুসন্ধান করে, যেমন মৃত্যু মানুষের অনুসন্ধান করে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যদি রিয্‌ক থেকে পলায়নপর হয়, তবু সে তাকে পেয়ে যাবে, যেভাবে মানুষ রিয্‌কের অন্বেষণ করে তা পায়।

হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, উত্তম জিকর হলো যা গোপনে করা হয়, আর উত্তম রিয্‌ক হলো যা যথেষ্ট হয়।

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সকালে ওঠে যে তার উদ্দেশ্য হয় এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লাভ লোভ, তবে সে আল্লাহ্ পাকের দায়িত্বের আওতায় থাকেনা। যে মুসলমানদের পরোয়া করেনা সে তাদের মধ্যে নয়, আর যে নিজেকে অহেতুক অপমানিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তেবরানী)

হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন এলম থেকে যা উপকারী হয় না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত হয় না এবং এমন প্রবৃত্তি থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না। (নাসায়ী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট অর্থ-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি ময়দান থাকে, তবু সে তৃতীয় ময়দানের জন্যে প্রার্থী হবে, মানুষের পেট কবরের মাটি ব্যতীত আর কোন কিছু দ্বারা পরিপূর্ণ করা যায়না, আর যে ব্যক্তি লোভ থেকে তওবা করে আল্লাহ পাক তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫০৪-০৫
তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৪-৪৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা মুনাফেকুন

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا جَآءَكَ الۡمُنٰفِقُوۡنَ قَالُوۡا نَشۡهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوۡلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ

اِنَّكَ لَرَسُوۡلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشۡهَدُ اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ لَـكٰذِبُوۡنَ ۚ‏ ﴿۱﴾ اِتَّخَذُوۡۤا

اَيۡمَانَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا ثُمَّ كَفَرُوۡا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُوۡنَ ﴿۳﴾

তরজমা

(১) (হে রসূল!) আপনার নিকট যখন মুনাফেকরা আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ পাকের রসূল, আর আল্লাহ পাক জানেন যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহ পাক সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী।

(২) মুনাফেকরা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, আর তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজ করছে।

(৩) তা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, পরিণামে তাদের হৃদয় মোহরাংকিত করে দেয়া হয়েছে, তাই তারা এখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

সূরা মুনাফেকুন প্রসঙ্গে

সূরা মুনাফেকুন মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ, এর আয়াত সংখ্যা-১১, এতে ১৮০টি বাক্য ও ৭৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

এ সূরায় মুনাফেকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কপটতা, শঠতার বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই এ সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে।

স্বপ্নের তা'বীর

যে কেউ স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা মুনাফেকুন পাঠ করছে, তবে আল্লাহ পাক তাকে মুনাফেকীর ঘৃণ্য চরিত্র থেকে পবিত্র রাখবেন।

এ সূরার আমল

চক্ষু রোগে, ব্যথা এবং ফোঁড়ার জন্যে এ সূরা পাঠ করে ফুঁক দিলে উপকার হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এরপর যারা তাঁকে অন্তরে অবিশ্বাস করতো এবং প্রকাশ্যে সমালোচনা করতো, সেই অভিশপ্ত ইহুদীদের কথা আলোচিত হয়েছে, আর এ সূরায় মুনাফেকদের কথা বলা হয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবীদার হতো, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিলনা।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী সূরার শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তা'যীমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তা'যীম করলেও তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ছিলনা। এতে একথা প্রমাণিত হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক ভক্তি বা তা'যীম না করা মুনাফেকীর লক্ষণ, এমন গর্হিত কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।[১]

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

বোখারী শরীফ সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বলেছেন, মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বলছিল, "যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছেন, যে পর্যন্ত না তাঁরা তাঁর নিকট থেকে সরে না যায়, সে পর্যন্ত তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্য সহায়তা করোনা, আমরা যদি মদীনা প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিরা এ অপমানিত লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে"। হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি এ বিষয়টি আমার চাচাকে বলি, তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে তা আরজ করেন, তখন তিনি আমাকে তলব করেন, আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবং তার সাথীদেরকে তলব করলেন, সে এসে শপথ করে বললো, এরকম কোন কথা আমি বলিনি। তখন আমার চাচা বললেন, আমি চাইনি যে, কেউ তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করুক, কিন্তু এখনতো স্বয়ং হযরত রসূলে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১২

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছেন এবং তোমাকে অপছন্দ করেছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

اِذَا جَآءَ كَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

"(হে রসূল!) যখন আপনার নিকট মুনাফেকরা আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল, আর আল্লাহ পাক জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ পাক সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী"।

অর্থাৎ মুনাফেকরা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে তা সত্য কিন্তু তারা নিজেরা মিথ্যাবাদী, কেননা তারা এ সত্য কথাটি সত্য বলে স্বীকার করে সাক্ষ্য দিচ্ছেনা।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক এবং অন্যান্য ইতিহাস-বেত্তাগণ বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলো যে, বনীল মোস্তালেক গোত্র হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর তাদের সেনাপতি হলো উম্মুল মোমিনীন হযরত জোয়াইরীয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস এবনে জেরার। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ এবনে হারেস (রাঃ)-কে মদীনা মোনাওয়্যারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন (মোহাম্মদ এবনে ওমর ও এবনে সা'দের মতে)। আর এবনে হেশামের বর্ণনা মতে, হযরত আবুজর গেফারী (রাঃ)-কে মদীনা মোনাওয়্যারার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং এরপর তিনি মুসলমানদের একটি দল নিয়ে জেহাদের জন্যে রওয়ানা হয়ে যান। এ দলে মুসলমানদের ত্রিশটি অশ্ব ছিল। এর মধ্যে ১০টি ছিল মোহাজেরগণের, দু'টি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবং অবশিষ্টগুলো আনসারগণের ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে অর্থ সম্পদের লোভে কিছু সংখ্যক মুনাফেকও অংশগ্রহণ করে। বনীল মোস্তালেকের সাথে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলা হলো মরিসের ঝর্ণার পাশে, যা ছিল কাদীদ নামক উপকূলীয় এলাকা সংলগ্ন। হারেস যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশে মুসলিম বাহিনীও কাতারবন্দী হয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে এ ঘোষণা করলেন, তোমরা সকলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তাহলে তোমাদের জান ও মাল সংরক্ষিত থাকবে। এরপর উভয় পক্ষ থেকেই তীর নিক্ষেপ শুরু হলো। ঘোরতর যুদ্ধ হলো। বনীল মোস্তালেকের লোকদের মধ্যে যাদের

তকদীরে মৃত্যু ছিল তারা নিহত হয় এবং অন্যরা পরাস্থ হয়ে পলায়ন করে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক বনীল মোস্তালেকের স্ত্রীলোক ও শিশুরা মুসলমানদের কজায় এসে গেল। আল্লাহ্ পাক অনেক যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদও দান করলেন। মুসলমানগণ তখনও ঐ ঝর্ণার নিকটেই ছিলেন। এরই মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট বণী গেফার গোত্রের একজন মজদুর ছিল। সে তাঁর অশ্বের লাগাম নিয়ে চলতো। তার নাম ছিল যাহ্যাহ্ এবনে সায়ীদ। সেনান এবনে ওয়াবরা জোহানীর সঙ্গে এ ব্যক্তির বিবাদ হলো। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো। যাহ্যাহ্র হস্তে সেনান আহত হলো, তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। সেনান আনসারগণকে সাহায্যের জন্যে ডাকলো, আর গেফারী মোহাজেরদেরকে আহবান করলো। উভয় দলের বহু লোক একত্রিত হলো। জেয়াল নামক এক ব্যক্তি যাহ্যাহ্কে সাহায্য করলো। গুরুতর ফেতনা দেখা দিল। এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা বর্বরতার যুগের অবস্থা সৃষ্টি করছো। লোকেরা ঘটনা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা এরূপ ফেতনা বর্জন কর, এসব শরীয়তে নিষিদ্ধ, মানুষের কর্তব্য হলো নিজের ভাইকে সাহায্য করা, তার ভাই জালেম হোক কি মজলুম, যদি জালেম হয় তবে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখ, এটিই হলো তাকে সাহায্য করা, আর যে মজলুম তাকে সমর্থন কর। এরপর মোহাজেরগণের কিছু লোক হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) এবং আনসারগণের সাথে কথা বলেন এবং তারা সেনানের সাথে কথা বলেন। অবশেষে সেনান তার হক্ব ছেড়ে দেয়।

আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল তার জায়গায় বসেছিল, তার নিকট আরও দশজন মুনাফেক বসেছিল। হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ এবনে উবাই বললো, এরা এমন কাজ করলো এবং আমাদের জনপদে থেকে আমাদের সাথেই মোকাবেলা শুরু করে দিল, আল্লাহর শপথ! আমরা যখন মদীনাতে ফিরে যাব, তখন আমাদের মধ্যে যে অধিকতর সম্মানিত হবে, সে অপমানিত ব্যক্তিকে বের করে দেবে। সম্মানিত ব্যক্তি সে নিজেকে বলেছে, আর অপমানিত শব্দটি ব্যবহার করেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করে। এরপর সে তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললো, আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা জেয়ালকে সাহায্য না দিতে, তবে তারা তোমাদের ঘাড়ে চড়াও হতে পারত না এবং তোমাদের জনপদ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেত। এখনও বলছি তোমরা তাদের জন্যে কোন কিছু ব্যয় করোনা, যে পর্যন্ত না তাঁরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সরে না যায়। তখন হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি

তোমার সম্প্রদায়ে অপমানিত, ঘৃণ্য, হীন আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের মালিক, তিনি মুসলমানগণের অন্তরে সর্বাধিক প্রিয়। .

আবদুল্লাহ এবনে উবাই বললো, নীবর হও, আমি এমনিই বলেছি। হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবগত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথাটিকে অপছন্দ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মোবারকের বর্ণ পরিবর্তিত হলো। তিনি এরশাদ করলেন, বৎস! হয়তো তুমি তার উপর একটি মিথ্যা আরোপ করছো? হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, না আল্লাহর শপথ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আমি নিজে শ্রবণ করেছি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হয়তো তোমার শ্রবণে কোন ভুল হতে পারে।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, না, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার শ্রবণেও কোন ভুল হয়নি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হয়তো তোমার একটু সন্দেহ হয়েছে।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, না, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কোন সন্দেহ হয়নি।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের এ উক্তিটি ছড়িয়ে পড়লো, আবদুল্লাহ এবনে উবাই ব্যতীত সকলের নিকট এছাড়া কোন কথাই ছিলনা। কয়েকজন আনসারী সাহাবী হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে এই বলে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি নিজের সম্প্রদায়ের নেতার উপর অপবাদ দিলে, যে কথা সে বলেনি তাই তার নামে বললে। তুমি বড় অন্যায় কাজ করলে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে।

হযরত যায়েদ (রাঃ) তাঁদেরকে এই বলে জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যা তাকে বলতে শুনেছি, তাই বলেছি। আল্লাহর শপথ! খাজরাজ গোত্রে আবদুল্লাহর সাথে আমার পিতার চেয়ে অধিক ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক আর কারো নেই। যদি আমি আমার পিতার নিকট থেকে একথা শ্রবণ করতাম, তবে তখনও আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিকট তা জানিয়ে দিতাম।

আমি আশা করি যে, আল্লাহ পাক তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতি এমন কালাম অবশ্যই নাযিল করবেন, যা আমার বক্তব্যকে সত্যায়িত করবে।

তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তাকে হত্যা করি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, ওব্বাদ এবনে বশরকে আদেশ দিন যে, সে আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের শিরোচ্ছেদ করে তা আপনার নিকট নিয়ে আসে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি আমি এর অনুমতি দান করি, তবে লোকেরা বলবে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন। কিন্তু এখান থেকে রওয়ান হওয়ার কথা ঘোষণা কর। এ এমন একটি সময় ছিল, যখন সাধারণতঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফর করতেন না, তখন ছিল প্রচন্ড গরম, যাহোক, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের "কোসওয়া" নামক উষ্ট্রী অগ্রসর হলো, বাধ্য হয়ে অন্যরাও বের হলো, এরই মধ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে উবাইকে তলব করলেন, সে হাযির হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমার নিকট যে কথা পৌঁছেছে তা কি তুমি বলেছ? আবদুল্লাহ এবনে উবাই বললো, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, আমি এর কিছুই বলিনি, যায়েদ (রাঃ) সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী, আবদুল্লাহ এবনে উবাই তার গোত্রে সম্মানিত ব্যক্তি ছিল, তার সাথী তথা আনসারগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হয়তো, এ কিশোরের কিছু সন্দেহ হয়েছে। এবনে উবাই যা বলেছিল, তা সে মনে রাখতে পারেনি। যাহোক, এবনে উবাইয়ের কৈফিয়ত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন, আর আনসারগণ যায়েদ (রাঃ)-কে তিরস্কার করলেন। লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করলেন। যায়েদ (রাঃ) তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে থাকতেন। তিনি জায়েদকে বললেন, তোমাকে কেউ মিথ্যাবাদী বলুক তা আমার কাম্য ছিলনা, কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং লোকেরা তোমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করলেন এবং তোমাকে অপছন্দ করলেন।

যায়েদ (রাঃ) এর নিয়ম ছিল, ভ্রমণকালে তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থাকতেন। কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে বিরত রইলেন। কাফেলা রওয়ানা হবার পর সর্ব প্রথম হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন, হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, ওয়ালাইকাচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সা'দ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি এমন একটি অসময়ে রওয়ানা হয়েছেন যে, সাধারণত আপনি এ সময়ে সফরে রওয়ানা হন না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি সেকথা জানতে পারনি, যা তোমাদের সাথী বলেছে?

সা'দ (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সে কোন্ সাথী?

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এবনে উবাই বলে, যখন সে মদীনা প্রত্যাবর্তন করবে তখন সম্মানিত ব্যক্তি অপমানিত ব্যক্তিকে বের করে দেবে"।

সাদ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আপনি মর্জি করেন, তবে তাকে এখুনি বের করে দিন, সে অত্যন্ত অপমানিত লোক, আর আপনি সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। সম্মান তো আল্লাহ পাকের এবং আপনার এবং মোমেনদের।

এর কিছুক্ষণ পর তিনি আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তার প্রতি বিনম্র ব্যবহার করলে ভাল হয়। যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় আপনার শুভাগমন হয়, তার কিছু দিন পূর্বে তাকে এ এলাকার বাদশাহ হিসেবে বরণ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তার অভিষেকের প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক এমন সময় আল্লাহ পাক আপনাকে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রেরণ করেছেন, আর এজন্যেই সে আপনার আগমনকে তার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার হেতু মনে করে।

এদিকে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের পুত্র আবদুল্লাহ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা এবনে উবাইকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের অনুমতি প্রদানের জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করেছেন, তখন আবদুল্লাহ আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার নিকট এবনে উবাই সম্পর্কে যে কথা পৌঁছেছে তার জন্যে যদি আপনি তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক আপনার খেদমতে এনে হাযির করবো, আর তা এত সত্ত্বর করবো যে, আপনি এখান থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে এ কাজ শেষ হবে। আল্লাহর শপথ! খাজরাজ গোত্রের লোকেরা ভালভাবেই জানে যে, এ গোত্রের কেউ তার পিতা-মাতার এত অনুগত নয়, যতটা আমি। এজন্যে আমার একটি আশংকা হলো, আমি ব্যতীত অন্য কাউকে যদি আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়, তবে আমার নফস আমাকে এ অনুমতি দেবেনা যে, আমি আমার পিতার

ঘাতককে অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে দেব। তখন আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। অথচ কাফেরের হত্যার প্রতিশোধে কোন মোমেনকে হত্যা করলে আমি দোযখী হয়ে যাব। আর আপনার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং ঔদার্যই উত্তম।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আবদুল্লাহ, তোমার পিতাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমার নেই, আর এর কোন আদেশও নেই, যারা আমার নিকট আসে, আমি তো তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি।

হযরত আবদুল্লাহ আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ এলাকার অধিবাসীরা তাকে রাজমুকুট পরানোর জন্যে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক সে মুহূর্তে এখানে আপনাকে প্রেরণ করেছেন, এজন্যে তার রাজত্ব গ্রহণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি, আর আপনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে। এখনও কিছু লোক তার কাছে আসা-যাওয়া করে এবং পুরনো কথা উল্লেখ করে। আল্লাহ পাক তাদেরকে পরাজিত করেছেন।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সমস্ত দিন চলতে থাকলেন, এরপর সারা রাতও চলতে থাকলেন। এমনকি, সকাল হলো। দিনের অনেক সময় অতিবাহিত হলো। সূর্যের উত্তাপ মানুষের কষ্টের কারণ হলো, তখন এক স্থানে সকলে অবতরণ করলেন।

মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসময়ে কাফেলার রওয়ানা হওয়ার আদেশ এজন্যে দিয়েছিলেন, যেন আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের যে কথাটির চর্চা হচ্ছিল, তা থেকে লোকেরা বিরত হয় (অর্থাৎ একত্রিত হয়ে আলোচনার যেন কোন সুযোগই না থাকে)।

মুসলিম শরীফে হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারার নিকটবর্তী হন, তখন প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল, বাতাসের বেগ এত বেশী ছিল যেন কোন আরোহী বালুতে সমাধিস্থ হয়ে যায়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই ঝড়-তুফান এক মুনাফেক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছে। যখন আমরা মদীনা শরীফ পৌঁছলাম, তখন জানা গেল একজন বড় মুনাফেকের মৃত্যু হয়েছে। লোকেরা বললো, নিশ্চয় মদীনা মোনাওয়্যারায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমাদের পরিবারবর্গ সেখানে রয়েছে (আমরা তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন)।

উয়াইনা এবনে হাসান ফাজারী এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে "যুদ্ধ নয় শান্তি" চুক্তি হয়েছিল, ঐ চুক্তির মেয়াদ শেষ পর্যায়ে ছিল, এজন্যে লোকেরা মনে করেছে, হয়তো সে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে ফেলতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, মদীনা মোনাওয়্যারার প্রত্যেক উপকণ্ঠে একজন ফেরেশতা প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, কোন দুশমন প্রবেশ করতে পারবে না, তোমরাই প্রবেশ করবে। ঘটনা হলো এই, মদীনা মোনাওয়্যারায় একজন বড় মুনাফেকের মৃত্যু হয়েছে, এজন্যে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হয়েছে। এ মুনাফেকের মৃত্যুর কারণে অন্য মুনাফেকরা অত্যন্ত বেশী চিন্তিত রয়েছে। এ মৃত মুনাফেক হলো যায়েদ এবনে রোফায়া এবনে তাবুত।

মোহাম্মদ এবনে আমর হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাতাসের গতি অত্যন্ত বেশী ছিল, এরপর পরিবেশ শান্ত হয়।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) সেদিন এবনে উবাইকে বলেছিলেন, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু যায়েদ এবনে রোফায়া এবনে তাবুতের মৃত্যু হয়েছে, যার মৃত্যুতে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছে। এবনে উবাই বললো, অত্যন্ত আক্ষেপ! সে আমার বন্ধু ছিল। তখন এবনে উবাই বললো, হে আবুল অলীদ! তোমাকে যায়েদ এবনে রোফায়ার মৃত্যুর খবর সর্ব প্রথম কে দেয়? হযরত ওবাদা (রাঃ) বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম খবর দিয়েছেন। তখন এবনে উবাই অত্যন্ত লজ্জিত, ব্যাকুল এবং চিন্তিত হয়।

মোহাম্মদ এবনে ওমর হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোসওয়া নামক উষ্ট্রীটি হারিয়ে যায়। মুসলমানগণ চারিদিকে তার অনুসন্ধান করতে থাকেন। যায়েদ এবনে সলত নামক একজন মুনাফেক ছিল, সে আনসারদের দলভুক্ত হয়েছিল। সে বললো, উষ্ট্রীটি যেখানে আছে, আল্লাহ পাক সে স্থানের ঠিকানা কেন দেন না? মুসলমানদের নিকট উক্তিটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় হয়। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোর প্রতি আল্লাহর গজব হোক, তুই মুনাফেক হয়ে গেছিস। তখন এবনে হোজায়ের বললেন, আমি জানি না হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আমার কাজ পছন্দনীয় হবে কি-না? যদি একথা না হতো, তবে আল্লাহর শপথ করে বলি, বর্ষা দিয়ে তোকে শেষ করে দিতাম, যখন তোর অন্তরে এ মুনাফেকী ছিল, তখন আমাদের সঙ্গে কেন বের হয়ে এসেছিস? সে বললো, আমি তো অর্থ-সম্পদ লাভের আশায় এসেছিলাম। আল্লাহর শপথ! মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ উষ্ট্রীর চেয়ে অনেক বড় বড় আসমানী খবর আমাদেরকে প্রদান করেন

(অথচ উষ্ট্রীটির খবর নেই)। মুসলমানগণ বললেন, আল্লাহর শপথ! তোর সঙ্গে আমাদের কখনো মিল হবেনা, আর কখনো কোন উপত্যকার ছায়ায় আমরা তোর সঙ্গে একত্রে বসবো না, যদি ইতিপূর্বে তোর মনের অবস্থা আমরা জানতে পারতাম, তবে কখনো তোকে সঙ্গে রাখতাম না। একথা শ্রবণ করা মাত্র যায়েদ পলায়ন করলো, তার আশংকা হয়েছিল, হয়তো মুসলমানগণ তার প্রতি হামলা করবেন। মুসলমানগণ তার মাল-পত্র ফেলে দিলেন। এদিকে সে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর আশ্রয় নিল। এরপর জীব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে উষ্ট্রীটির খবর দিলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (একথা ঐ মুনাফেকও শ্রবণ করছিল) "মুনাফেকদের এক ব্যক্তি বলেছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে, আর আল্লাহ পাক তাঁকে তাঁর উষ্ট্রীর অবস্থানের কথা বলেননি, অথচ তিনি আমাদেরকে অনেক বড় বড় আসমানী খবর দেন"। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ গায়বের এলম আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো কাছে নেই। আল্লাহ পাক এইমাত্র উষ্ট্রীর অবস্থানের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সম্মুখে যে উপত্যকা রয়েছে তার মধ্যেই উষ্ট্রীটি রয়েছে, তার রশিটি একটি বৃক্ষে আটকে গেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরাম নির্দিষ্ট স্থান থেকে উষ্ট্রীটি নিয়ে আসলেন। ঐ মুনাফেক তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং মুসলমানদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যাদের সঙ্গে সে ইতিপূর্বে ছিল। এসে দেখে, তার মাল-পত্র ফেলে দেয়া হয়েছে, সাথীরা সকলে স্ব-স্ব স্থানে বসে আছেন, কেউ স্থান-ত্যাগ করেননি। যখন তাঁরা ঐ মুনাফেককে আসতে দেখলেন, তখন তারা বলবেন, আমাদের নিকটবর্তী হয়োনা, সে বললো, আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, একথা বলে সে নিকটবর্তী হলো এবং বললো, আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের এখান থেকে উঠে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়েছিলেন কি? যে আমার শপথের কথা বলে দিয়েছেন? তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! কেউ এখান থেকে ওঠেনি। তখন সে বললো, আমি যা এখানে বলেছিলাম, তিনি সবই বলে দিলেন। এরপর সে বললো, আমি তাঁর ব্যাপারে ইতিপূর্বে সন্দিহান ছিলাম, এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। একথার অর্থ হলো আমি ইতিপূর্বে প্রকৃত মুসলমান ছিলাম না, এখন ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তুমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার কর, সে তাই করলো। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ওয়াদিয়ে আক্বীকে পৌছলেন, তখন আবদুল্লাহ এবনে

উবাইয়ের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতার উষ্ট্রের সম্মুখের পা বেঁধে দিলেন, সে বললো হে আহমক কি করছো? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাব দিলেন, যে পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দেবেন, সে পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনি নিজেই জানতে পারবেন সম্মানিত কে, আর অপমানিত কে? তুমি অথবা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

অন্য মুসলমানদের উষ্ট্রকে তিনি যেতে দিতেন শুধু স্বীয় পিতার উষ্ট্রকে আটকে রাখতেন। পিতা বলতো, তুমি তোমার পিতার সঙ্গে এমন কাজ কর? এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে আগমন করেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে জানানো হয়, মুনাফেক নেতা এবনে উবাইয়ের উষ্ট্রের পা বেঁধে দেয়া হয়, যে পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রবেশের অনুমতি না দেবেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখলেন, তখন এবনে উবাই বলছিল, আমি শিশুদের চেয়েও দুর্বল, আমি স্ত্রীলোকদের চেয়েও দুর্বল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে আদেশ দিলেন, তোমার পিতাকে ছেড়ে দাও।

মোহাম্মদ এবনে ওমর হযরত রা'ফে এবনে খুদায়েজ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ এবনে উবাই সম্পর্কে কোরআনে করীমের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত ওবাদা এবনে ছামেত (রাঃ) এবনে উবাইকে বলেছিলেন, তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে যাও, তিনি তোমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবেন। কিন্তু সে তার ঘাড় নাড়া দিল, তখন হযরত ওবাদা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তোর ঘাড় নাড়ানো সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এখন আয়াত নাযিল হবে, যাতে তোর জন্যে অগ্নি থাকবে। আর ঐ অগ্নিতে জ্বলে তুই শেষ হয়ে যাবি।

বর্ণনাকারী বলেন, যেদিন এ আয়াত নাযিল হয় সেদিন যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছাকাছিই ছিলেন, তিনি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, আর সে অবস্থায়ই সূরা মুনাফেকনের এ আয়াত নাযিল হয়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার দু'টি কর্ণে হাত রেখে বললেন, বৎস! তোমার কথা প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক তোমার কথাকে সত্যায়িত করেছেন।

সূরা মুনাফেকুনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫০৬-১৪
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৬-৪৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০৮-০৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫৭-৫৮
তফসীরে হক্কানী পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ

"(হে রসূল!) আপনার নিকট যখন মুনাফেকরা আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ পাকের রসূল"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফেকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কপটতা, শঠতা, প্রতারণা এবং ধোকাবাজির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। মুনাফেকরা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়; কিন্তু ঈমানের দাবীদার, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا جَآءَكَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) এই মুনাফেকরা আপনার কাছে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ পাকের রসূল তাদের একথা স্ব-স্থানে সত্য, কিন্তু মুনাফেকরা একথাকে সত্য মনে করে বলছেনা, এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) মুনাফেকরা আপনার নিকট এসে শপথ করে বলে যে, আপনি আল্লাহ পাকের রসূল, কিন্তু আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না, আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন যে, আপনি আল্লাহর রসূল, অথচ মুনাফেকরা একথা মুখে বললেও মনে প্রাণে বিশ্বাস.করে না।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

আর আল্লাহ পাক সাক্ষ্য প্রদান করছেন, যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী, তারা প্রতারক, ধোঁকাবাজ, তারা নিজেদের মিথ্যা কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্যে শপথ করতে থাকে, যাতে করে মানুষ তাদেরকে মুসলমান মনে করে। মুনাফেকদের কথা নিছক ধোকাবাজি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

মুসলমানদের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যে মুনাফেকরা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

কোন অপরাধে ধরা পড়ার ভয়ে তাদের মিথ্যা পরিচয়, মিথ্যা কথা এসবই তারা আত্মরক্ষার্থেই বলে থাকে। শুধু তাই নয়; তারা মানুষকে প্রতারণা করে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তারা এভাবে মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, মানুষ তাদের কথায় বিশ্বাস করে বসে। এ মুনাফেকরা অত্যন্ত কৌশলে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে থাকে।

اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'নিশ্চয় তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজ করছে'।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় মুনাফেকী, প্রতারণা, ধোকাবাজি এবং আল্লাহ পাকের পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখা অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

এ অপরাধের কারণেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন, পরিণামে তারা আর কখনো সৎ কাজ করতে পারবেনা। এভাবে মুনাফেকরা সৎ কাজের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

"তা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, পরিণামে তাদের হৃদয় মোহরাংকিত করে দেয়া হয়েছে, তাই তারা এখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে"।

মুনাফেকী, প্রতারণা, ইসলাম থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আত্মরক্ষার অপপ্রয়াস– এসবই তাদের অমার্জনীয় অপরাধ, এ অপরাধ সমূহের শাস্তি অবধারিত। তারা প্রথমে মোমেনদের সম্মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো, এরপর মুনাফেক সঙ্গীদের কাছে গমন করে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতো।

অথবা এর অর্থ হলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন মোজেযা দেখে তারা ঈমান আনতো, কিন্তু শয়তান সঙ্গীদের নিকট যখন হাযির হতো তখন তারা সন্দেহ প্রকাশ করতো, এভাবে মুনাফেকরা কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হতো। তাদের এসব পাপাচারের কারণে তাদের মন সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তাই তারা ঈমানের সত্যতা অনুধাবনও করতে পারেনা।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ সূরার প্রথম আয়াতে মুনাফেকদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। তাদের মিথ্যাবাদীতা হলো, প্রকাশ্যে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবী করতো।

لَا يَفْقَهُوْنَ

অর্থাৎ তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা, এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তাদের লাগাতার পাপাচারের কারণে তাদের অন্তরকে আল্লাহ পাক মোহরাংকিত করে দিয়েছেন, পরিণামে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে।

আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তাদের অন্তর মোহরাংকিত হয়েছে, তাই তারা পবিত্র কোরআনের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারেনা, এমনিভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেনা, এমনকি তাঁর রেসালতেও বিশ্বাস করেনা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা মনে করতো যে, তারাই সত্যের উপর রয়েছে, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তাদের সত্যের উপর থাকা তো দূরের কথা সত্য কী, তা অনুধাবনের শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছে।[১]

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ
اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا
عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

তরজমা

(৪) আর (হে রসূল!) আপনি যখন তাদেরকে দেখবেন, তাদের দেহাকৃতি আপনাকে চমৎকৃত করবে, আর যদি তারা কথা বলে, তাদের কথা শ্রবণ করবেন, তারা যেন দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের ন্যায়, তারা প্রতিটি চিৎকারকে নিজেদের উপর বিপদ আসলো বলেই মনে করে, তারাই শত্রু, আপনি তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে।

(৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা আস, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর তাদেরকে দেখবেন, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৬) (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্যে সমান, আল্লাহ পাক তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৩

(৭) তারাই তো সে সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রসূলের নিকট যারা আছে, তাদের জন্যে কিছুই ব্যয় করোনা এমনকি, শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে ধন-ভান্ডার, কিন্তু মুনাফেকরা তা বোঝেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী সূরা সফ্ এবং সূরা জুমআয় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, বিজয় এবং মোমেনগণের বিশেষ অবস্থা এবং গুণাবলীর বিবরণ ছিল, আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে যত চক্রান্তই করা হোক না কেন, অবশেষে বিজয় হবে ইসলামের এবং কাফেররা ইসলামের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবেনা।

আর আলোচ্য সূরায় মুনাফেকদের ঘৃণ্য চরিত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তারা ইসলামের মুখোশ পরে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে ইসলামের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত রয়েছে। তাদের চক্রান্ত যত সুদূরপ্রসারীই হোক না কেন, কখনো তারা সফল হবেনা। মুনাফেকদের কিছু আলামত এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা সহজে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সূরার শুরুর কয়েকটি আয়াতে তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে মিথ্যা শপথ করে বলে যে, তারা মুসলমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী, মুনাফেক, তারা মুসলমান নয়।

আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে মুনাফেকদের আরো কিছু চিহ্ন বর্ণনা করেছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যখনই এ মুনাফেকদেরকে দেখবেন, তাদের বেশ-ভূষা, তাদের আচার-আচরণ আপনাকে চমৎকৃত করবে, যখন তারা কথা বলবে, তখন তাদের কথাও আপনাকে আকৃষ্ট করবে, কাজেই তাদের আচার-আচরণে মনে হবে তারা অতি ভদ্র, নম্র, তাদের মুখের বাচনভঙ্গি খুবই মিষ্ট, আকৃতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এক কথায় তাদের বাহ্যিক অবস্থা অন্তরের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা বাহ্যিক অবস্থাকে তারা সুন্দর ও মনোহর করে রেখেছে অথচ তাদের অন্তর মিথ্যা, ধোঁকা, শত্রুতা, কুফর ও নাফরমানী, শয়তানী অভিসন্ধির অপবিত্রতায় পূর্ণ, তাদের অবস্থা কাফেরদের কবরের ন্যায়, কাফেরদের কবরের উপরে ফুলের গাছ থাকে, আর কবরের অভ্যন্তরে থাকে দোযখের আগুন, মুনাফেকদের অবস্থাও তদ্রূপ।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই, মুগীস এবনে কায়েস এবং ওয়াজদ এবনে কায়েস দৈহিক গঠনে,

সৌন্দর্য্যে, মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল, বিশেষতঃ আবদুল্লাহ এবনে উবাই অত্যন্ত সুশ্রী, সুন্দর, সবল দেহের অধিকারী ছিল, তার ভাষা ছিল উন্নত, পরিমার্জিত, যখন সে কথা বলতো তখন শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করে ফেলত। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

যদি তারা কথা বলে, তখন আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন, কিন্তু তাদের অন্তর যেহেতু কুফর, নাফরমানী এবং শয়তানীতে ভরপুর, তাই তাদের এ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কোন গুরুত্ব নেই। তাদের অবস্থা হলো,

كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

(তারা যেন দেয়ালের সাথে ঠেকানো কাঠের মত।)

দেয়ালের গায়ে শুকনো, অকেজো কাঠ ঠেকিয়ে রাখলে দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু যদি ক্ষণিকের জন্যেও দেয়াল না থাকে তবে ঐ শুস্ক কাঠটি টিকে থাকতে পারেনা। ঠিক এমনিভাবে মুনাফেকদের বাহ্যিক আচরণ যতই ভাল লাগুক না কেন, ঈমানের অভাবে তা ক্ষণিকের জন্যেও টিকে থাকার মত নয়, দেয়ালের সাথে ঐ শুস্ক কাঠটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক না থাকার কারণে তা অনায়াসে পড়ে যায়। ঠিক তেমনি ঈমানের সাথে মুনাফেকদের কর্মকান্ডের কোন সম্পর্ক না থাকাতে তাদের জীবন-সাধনা হয় ব্যর্থ এবং অবশেষে তারা হয় বিপদগ্রস্ত। তাদের নিকট এলম, মা'রেফাত, বুদ্ধিমত্তা বলতে কিছুই থাকেনা। মুনাফেকদের এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। শুস্ক, অকেজো কাষ্ঠখন্ড দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখলে মোটা তাজা মনে হয়। কিন্তু দেয়াল থেকে একটু সরিয়ে নিলে তা যেমন অকেজো প্রমাণিত হয়, খুব বেশী হলে তা দোযখের ইন্ধন হতে পারে। ঠিক এ অবস্থা মুনাফেকদের, নাদুস-নুদুস দেহ, সুন্দর সুশ্রী চেহারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু ভেতরে ঈমান নেই, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার বহ্নিশিখা থাকে তাদের ভেতরে, তাই তারা দোযখের ইন্ধন হবারই যোগ্য।

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

"তারা প্রতিটি চিৎকারকে নিজেদের উপর বিপদ আসলো বলেই মনে করে, তারাই শত্রু, আপনি তাদের থেকে সর্তক থাকুন, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন, বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে"।

মুনাফেকদের আরও একটি অবস্থা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা সর্বদা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। যেহেতু তাদের ঈমান নেই, যেহেতু তারা সর্বদা প্রতারণা করেই চলে, তাই কখন ধরা পড়ে যায় এ আশংকায় তারা সর্বদা ভীত থাকে। সর্বক্ষণ তাদের মন দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তারা ভীরু এবং কাপুরুষ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না থাকার কারণে তারা সামান্য শোরগোল বা আওয়াজ শুনলেই ভীত হয়ে যায় এবং এ আশংকা করে, হয়তো বিপদ তাদের উপর এসেই পড়েছে। তারাই শত্রু, তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ

আরবী ভাষায় এটি একটি বদ দোয়া, অর্থাৎ "আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন"।

মুনাফেকরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে কষ্ট দিত, সে কারণে মুসলমান মাত্রেরই অন্তরে অনুরূপ ক্রোধ সৃষ্টি হওয়া অতি স্বাভাবিক। মোমেন মাত্রেরই অন্তর এমন হতভাগাদেরকে লানত দেবে। তাই মোমেনের অন্তরের কথাটিই এ বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু মুনাফেকরা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, তাই তাদের থেকে সতর্ক থাকা কর্তব্য।

اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

"তারা কোথা থেকে কোথায় চলে যায়"।

সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, অসত্যের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এতদসত্ত্বেও তারা কোথায় চলে যায়? তফসীরকার এবনে জরীর কাতাদা ও এবনে মুনজের আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আস আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর তাদেরকে দেখবেন, তারা অহংকার ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়"।

শানে নুযুল

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানগণ মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাইকে বলেছিলেন, তুমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হও, ক্ষমা করার জন্যে আরজী পেশ কর, তাহলে তিনি তোমার

জন্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন সে ঘাড় ঘুরিয়ে ফেললো। ঠিক সে মুহূর্তে এ আয়াত নাযিল হয়।

মুসলমানগণ মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাইকে অনেক নসিহত করেছেন। কিন্তু সে ঐ নসিহত গ্রহণ করেনি এমনকি, মানুষকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণে সে বাধা দিয়েছে, শুধু তাই নয়, বরং সে অহংকার করেছে। এরপর আল্লাহ পাক আবদুল্লাহ এবনে উবাই ও তার সঙ্গীদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেনঃ

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাদেরকে মাগফেরাত দান করা হবেনা। অন্যত্র আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে বলেছেন,

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً......

"(হে রসূল!) যদি আপনি তাদের জন্যে সত্তুর বারও দোয়া করেন, তবু আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন না"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি ৭০ বারের চেয়ে বেশি তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করবো। এরপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন উভয়ই সমান। সূরায়ে বারাআতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক এমন পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত কবুলের তওফিক দান করেন না"।

যারা কুফর ও নাফরমানীতে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, ঈমানের দিকে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই, যারা পাপাচারে পরিপূর্ণ, অন্যায়-অনাচারে সর্বদা লিপ্ত, ধোকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত, তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় এ ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ পাক এমন পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত গ্রহণের তওফিক দান করেন না।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১১৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৩

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ

"তারাই তো সে সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রসূলের নিকট যারা আছে, তাদের জন্যে কিছুই ব্যয় করোনা, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে ভান্ডার, কিন্তু মুনাফেকরা তা বোঝেনা"।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আংশিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বনীল মোস্তালেকের যুদ্ধের সময় আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে বিতর্ক হয়। এমন অবস্থায় প্রত্যেক দলই সাহায্যের জন্যে নিজেদের দলকে ডাকে। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের ফলে এই বিতর্ক শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফেকরা এর রেশ ধরে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই আনসারগণকে বলে, তোমাদের নির্বুদ্ধিতার কারণেই মোহাজেরদের এত সাহস, তোমরা যদি তাদেরকে সাহায্য না করতে তবে আজ তাদের এত সাহস হতো না। অতএব, ভবিষ্যতের জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর, আর তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করোনা। তোমরা দেখতে পাবে, দারিদ্র্যের কারণে তারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে চলে যাবে। মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই একথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সে আরও বলেছে, এবার আমরা যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় ফিরে যাব, তখন অভিজাত লোকেরা এ অপমানিত লোকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে।

এদিকে আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের এসব কটুক্তির সংবাদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে তলব করলে সে হাযির হয়ে মিথ্যা শপথ করে বললো, এ ধরণের কথা সে কখনও বলেনি। অবশেষে আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের আয়াত সমূহ নাযিল করে মুনাফেকদের মুখোশ খুলে দিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

এরাই সে সব লোক যারা বলেছিল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যারা রয়েছে, তাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করোনা, যেন তারা সরে পড়ে।

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অথচ (তারা জানেনা) আসমান জমীনের সমস্ত ধন-ভান্ডারের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক। জান্নাতের নেয়ামত সমূহ, বৃষ্টি, রিযক, যমীনের অভ্যন্তরে

সংরক্ষিত সকল সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ এর মালিক হতে পারেনা।

কিন্তু মুনাফেকরা আল্লাহ পাকের শান ও কুদরত সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেন সে-ই তা লাভ করে। যাকে আল্লাহ পাক বঞ্চিত করেন, কেউ তাকে দিতে পারেনা। আল্লাহ পাক যাকে সম্মানিত করেন, কেউ তাকে অপমানিত করতে পারেনা, আর যাকে তিনি অপমানিত করেন, কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারেনা। কিন্তু এ নির্জলা সত্য মুনাফেকরা বুঝতে পারেনা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

“আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা হল এই, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন সে সম্পর্কে বলেন, ‘হও’, আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়”।

মুনাফেকরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা। মুনাফেকরা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে ধরে নিয়েছে যে, মোহাজেরদের রিয্ক নির্ভর করছে আনসারদের দান-দক্ষিণার উপর অথচ একথা মোটেই সত্য নয়। মুনাফেকরা এ সত্য উপলব্ধি করেনা যে, আসমান যমীনের যিনি মালিক, সমস্ত ধন-ভান্ডার যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি আল্লাহ পাকের রসূলের নিকট যে সব মোহাজের রয়েছেন তাঁদেরকে সাহায্য করবেন না, এমন অবস্থা হতেই পারেনা।

বস্তুতঃ রিযকতো শুধু আল্লাহ পাকই দান করেন। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে দান করেন। এটি নিতান্ত তাঁর মর্জির ব্যাপার। যারা কাউকে সাহায্য করে, তাদের আদৌ একথা চিন্তা করা উচিত নয়, যে তাদের সাহায্যেই সব কিছু হচ্ছে, বরং তাদের আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার থাকা উচিত যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মানুষের সাহায্য করার তওফিক দান করেছেন। এ তওফিক আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত কখনও লাভ হতে পারেনা। দুবৃত্ত মুনাফেকরা কখনও এ সত্য উপলব্ধি করেনা।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا
إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

তরজমা

(৮) তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিরা সেখান থেকে অপমানিত ব্যক্তিদেরকে বের করে দেবে, অথচ ইজ্জত সম্মান আল্লাহ পাকের এবং আল্লাহর রসূলের এবং মোমেনদের, কিন্তু মুনাফেকরা তা জানেনা।

(৯) হে মোমেনগণ! তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল না করে, যারা এমন কাজ করবে তারাই সর্বস্বান্ত হবে।

(১০) আর তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে ব্যয় কর (যদি কেউ তা না করে) তবে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে সদকা খয়রাত করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

(১১) কিন্তু যখন কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে পড়ে, তখন আল্লাহ পাক তাকে কখনো অবকাশ দান করেন না। আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ

বনীল মোস্তালেকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মোহাজের ও আনসারগণের মধ্যে প্রথমে ভুল বোঝাবুঝি এবং পরে কিছুটা বিতর্ক হয়েছিল, সে সময় মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই এবনে সলুল বলেছিল, আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাব তখন সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিরা অপমানিত লোকদেরকে বের করে দেবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الاعز শব্দ দ্বারা আবদুল্লাহ এবনে উবাই নিজেকে উদ্দেশ করেছে, আর الاذل শব্দ সে উদ্দেশ্য করেছে তাঁকে, যাঁকে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সমগ্র মানব জাতির উপর, যাঁকে আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করেছেন, অথচ দূরাত্মা মুনাফেক الاذل শব্দটি তাঁর শানে ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল মনে করতো যে, মদীনা মোনাওয়্যারায় তার বিরাট প্রভাব রয়েছে, কাজেই সেখানে পৌঁছে দারিদ্র্য-পীড়িত, মোহাজের মুসলমানগণকে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেবে। আবদুল্লাহর এ কথাটি অহংকার প্রসূত, তার জবাবে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

আর ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, কেননা তিনিই আসমান যমীনের মালিক, তিনিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিই সর্বত্র কার্যকর হয়, তাঁর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, অতএব সকল ইজ্জত সম্মানের অধিকারী তিনিই। আর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য, তাই সারা পৃথিবীতে সর্বকালে মানব সমাজে সর্বাধিক ইজ্জত সম্মান হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই। আর যেহেতু মোমেনগণই এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনে তাঁর অনুসরণ করে, তাই ইজ্জত সম্মান মোমেনগণেরও।

ইতিহাস সাক্ষী! যখনই পৃথিবীতে কোন জাতি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনে আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং রসূলের অনুসারী হয়েছে, তখনই সে জাতি পৃথিবীতে সম্মানিত হয়েছে, কোরআনে করীমে এর বহু দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। যেমন বনী ইসরাঈল জাতি মিশরে চরম অবমাননাকর অবস্থায় ছিল, তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো হতো, তাদের পুত্র সন্তানদের জবেহ করা হতো এবং কন্যা

সন্তানদেরকে বাঁদীতে পরিণত করা হতো। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈল জাতি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর হেদায়েত গ্রহণ করলো, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করলো, তখন তাদেরকে আল্লাহ পাক ফেরাউনের দাসত্ব থেকে রক্ষা করলেন, তাদের মানবেতর জীবনের অবসান ঘটলো, অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা যায় খৃষ্টীয় ছয়শত শতাব্দীতে, যখন মানুষ আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুর সম্মুখেই মাথানত করতো। নিজেদের হাতে গড়া মূর্তি হোক, অথবা স্বনির্বাচিত প্রস্তর বা বড় ধরনের একটি বৃক্ষ কিংবা নিজেদের প্রজ্বলিত অগ্নিই হোক, এসব কিছুর সম্মুখে মানুষ অবনত মস্তকে হাযির হতো, আর এসবই ছিল তাদের নিকট পরম পূজনীয়, আর তখনই আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করলেন, তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তের বছর এবং এরপর দশ বছর মদীনা মোনাওয়্যারায় ঈমান ও নেক আমলের আহ্বান জানালেন, যখন সে যুগের মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল এবং তাঁর অনুসরণ করলো জীবনের সকল স্তরে, তখন আল্লাহ পাক পৃথিবীর চেহারা বদলে দিলেন, মাত্র এক যুগের মধ্যেই তদানীন্তন বিশ্বের এক চতুর্থাংশের উপর ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হলো এবং মোমেনগণের সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এ পৃথিবীতে মর্যাদা এবং সম্মান লাভের মানদন্ড হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান, ভক্তি-অনুরক্তি এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

(আর ইজ্জত শুধু আল্লাহ পাকের এবং তাঁর রসূলের এবং মোমেনদের।)

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের যে দুঃখ-কষ্ট বা অপমান লক্ষ্য করা যায়, তা শুধু আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের অভাবের কারণেই।

যাহোক, আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করেছিল, তাই সে হয়েছে চির-লাঞ্ছিত এবং চির অপমানিত, চির বঞ্চিত।

وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"কিন্তু মুনাফেকরা এ সত্য উপলব্ধি করেনা"।

বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের হোবাব নামক এক পুত্র ছিল, তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রাখলেন।[১]

মদীনা মোনাওয়্যারার কাছাকাছি যখন কাফেলা পৌঁছল, তখন এবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ তরবারি হস্তে তাঁর পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমি বলেছিলে যে, "মদীনা পৌঁছে সম্মানিত লোকেরা অপমানিত লোকদেরকে বের করে দেবে", আল্লাহর শপথ! হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান না করলে তোমাকে মদীনা শরীফ প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা।

হোমায়দী তাঁর মসনদে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এবনে উবাইর পুত্র তাঁর পিতার পথ রোধ করে বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তুমি একথা না বলবে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সম্মানিত এবং আমি সর্বাধিক অপমানিত, সে পর্যন্ত তোমাকে মদীনা মোনাওয়্যারা প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা।

হযরত উসামা এবনে জায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনীল মোস্তালেকের যুদ্ধ থেকে মদীনা মোনাওয়্যারা প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন এবনে উবাইয়ের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তরবারি হস্তে তাঁর পিতার গতিরোধ করে বললেন, যে পর্যন্ত তুমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বাধিক সম্মানিত এবং নিজেকে সর্বাধিক অপমানিত স্বীকার না করবে, সে পর্যন্ত তোমাকে মদীনা মোনাওয়্যারা প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা। তখন সে তাই বললোঃ

محمدﷺ الاعز وانا الاذل

(হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সম্মানিত এবং আমি সর্বাধিক অপমানিত।)[২]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল না করে"। যারা এমন কাজ করবে তারাই সর্বস্বান্ত হবে।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৭৩
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৯

মোমেনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুনাফেকদের ঘৃণ্য চরিত্রের বিবরণ এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ মর্মে যে, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তোমরা কখনো আল্লাহ্ পাককে ভুলে যেওনা, মুনাফেকরা এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনের লোভে মোহে মত্ত হওয়ার কারণেই সর্বস্বান্ত হয়েছে, তোমরা কখনো বিষয়-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহ্ পাককে ভুলে যেওনা। আল্লাহ্ পাককে ভুলে যাওয়ার পরিণতি হয় অত্যন্ত শোচনীয়, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অর্থই হলো নিজেকে ধ্বংস করা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল না করে"।

আল্লাহ্ পাকের স্মরণ তথা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালনই হলো জীবনী শক্তির লক্ষণ, যার মধ্যে এ গুণ থাকেনা, সে জীবন-মৃত, এটি শুধু ব্যক্তির ব্যাপারেই নয়, জাতীয় জীবনেও এই একই সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট; যে জাতির মধ্যে ঈমানী প্রেরণা নেই, সে জাতি প্রাণহীন। প্রাণের মালিক আল্লাহ্ পাক, তিনি আমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, তাই আমরা জীবন্ত, প্রাণবন্ত, অতএব আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফলত করার অর্থ হলো জীবন-বিমুখ হওয়া, যা কোন ভাবেই কল্যাণকর নয়।

যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে আল্লাহ্ পাককে ভুলে যায় এবং আখেরাতের সম্বল সংগ্রহে গাফলত করে, দুনিয়ার সম্পদ সংগ্রহে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তারা দুনিয়া থেকে নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব হয়ে চলে যায়, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে তাদের কিছুই থাকেনা, যা কিছু দুনিয়াতে আহরণ করে তা ভূ-পৃষ্ঠের উপর রেখে যায়। এমন ব্যক্তির সর্বনাশের ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা, আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশ্যে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

ذِكْرِ اللّٰهِ (আল্লাহর স্মরণ)

আলোচ্য আয়াতে ذِكْرِ اللّٰهِ কথাটির অর্থ হলো সর্বপ্রকার এবাদত, তবে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা বলা হয়েছে। যারা অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় বা সন্তান-সন্ততির মায়ায় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে

আরোপিত অবশ্য কর্তব্য পালন না করে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর নেয়ামত সম্পর্কে ভুলে যায় তথা আত্মবিস্মৃত হয়, এর দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের নিন্দনীয় চরিত্রের সমালোচনা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে মুনাফেকদের ঘৃণ্য কীর্তিকলাপের উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন অর্থ-সম্পদের লোভে মত্ত হয়ে নামায পরিত্যাগ করা, যাকাত আদায় না করা এবং মৃত্যুর কথা ভুলে থাকা, সুদীর্ঘ বয়সের আকাঙ্ক্ষা করা, এসবই মুনাফেকদের চারিত্রিক দুর্বলতা, মোমেনগণ যেন এমন দুর্বলতা পরিহার করে চলে।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ
لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

"আর তোমাদেরকে আমি যে রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে, (যদি কেউ তা না করে) তবে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে আমি সদকা খয়রাত করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহর রাহে দান করার যে হুকুম রয়েছে, তা হলো যাকাত আদায়ের নির্দেশ।

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমন অবস্থায় আসে যে, সে তার অর্থ-সম্পদের যাকাতও আদায় করেনি এবং হজ্বও করেনি, সে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসার জন্যে আকাঙ্ক্ষা করবে, সে বলবে, আমাকে একটু অবকাশ দিলে আমি এসব দায়িত্ব পালন করে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান এই, যার মৃত্যু উপস্থিত হয় তার মৃত্যুকে ঠেকানোর সাধ্য কারোই থাকেনা, অতএব মৃত্যুর ক্ষণ আসার পূর্বেই পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল স্বরূপ আল্লাহর রাহে দান কর, যা কিছু তোমাদের নিকট রয়েছে তা-তো আল্লাহ পাকেরই দান, অতএব যিনি মহান দাতা, যাঁর দানে তুমি ধন্য, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে দান করতে ইতস্ততঃ করা আদৌ উচিত নয়।

যারা সময় থাকতে সৎ কাজ করেনা, আল্লাহর রাহে দান করেনা, আখেরাতের জীবনের সম্বল সংগ্রহ করেনা, তাদের অবস্থা হলো এইঃ

لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

"তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে আমি সদকা খয়রাত করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম"।

এ পর্যায়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কোন্ খয়রাত সর্বোত্তম? তিনি এরশাদ করেনঃ এমন অবস্থায় দান খয়রাত করা উত্তম, যখন তুমি সুস্থ থাক, তোমার অন্তরে অর্থ সংগ্রহের আকর্ষণ থাকে এবং দরিদ্র হওয়ার আশংকাও থাকে এবং সম্পদশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। অতএব যাকাত আদায় করতে কিংবা আল্লাহর রাহে দান করতে এত বিলম্ব করোনা যে, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়ে আর তুমি বল, এত পরিমাণ অমুককে দাও।[১]

তফসীরকারগণের একটি দল এ মত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুনাফেকদের সম্পর্কে, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে আত্মসংশোধনে উদ্বুদ্ধ করা এবং পরকালীন জীবনের সম্বল সংগ্রহের জন্যে প্রস্তুত করা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যাহ্যাক এবং আতীয়্যা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করেনি, হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেনি, আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে পড়ে, তখন সে জীবনের আরো কিছু অবকাশের জন্যে আরজী পেশ করবে এবং আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি আমি নেককার হতাম! এবং আমি যদি হজ্ব করতাম!! হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এরপর এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا

"কিন্তু যখন কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে পড়ে, তখন আল্লাহ পাক তাকে কখনো অবকাশ দেননা"।

এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান, এতে কখনো কোন পরিবর্তন হয়না। অতএব, যারা এ জীবনে ঈমানদার ও নেককার হয়না, তাদের আক্ষেপ করা ছাড়া কোন গত্যন্তরও থাকেনা।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, অতএব, সতর্ক হওয়া একান্ত কর্তব্য।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪২২-২৩
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৭৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাগাবুন

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ
مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤

তরজমা

(১) আসমান সমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মোমেন, তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ পাক তা লক্ষ্য করছেন।

(৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান সমূহ এবং যমীনকে যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। এবং আল্লাহ পাকের নিকটই তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৪) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর, সে সবও তিনি জানেন। আর আল্লাহ পাক মানুষের মনের কথাও ভালভাবেই জানেন।

সূরা তাগাবুন প্রসঙ্গে

অধিকাংশ তফসীরকাগণের মতে, এ সূরা মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়েছে, তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আতা এবনে ইয়াসার বলেছেন, এর কিছু আয়াত মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় এবং শেষের কিছু আয়াত মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

অবশ্য এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা তাগাবুন মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেছেন, সূরা তাগাবুন মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা তাগাবুনে দু' রুকু এবং ১৮ খানি আয়াত রয়েছে। এতে ২৪১টি বাক্য ও ১,০৭০টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার আমল

যদি কেউ সূরা তাগাবুন পাঠ করে কোন জালেমের নিকট গমন করে, তবে তার জুলুম থেকে ঐ ব্যক্তি সংরক্ষিত থাকবে। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, প্লেগ ও কলেরা যখন মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এ সূরা পাঠ করা এবং পানিতে দম করে তা বাড়ীর চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া উপকারী হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ স্বপ্ন দেখে যে সে সূরা তাগাবুন পাঠ করছে, তবে সে নিজের স্ত্রী ও তার সতীনদের ব্যাপরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

এ সূরার মূল বক্তব্য

এ সূরায় তৌহীদ ও রেসালতের কথা রয়েছে। সূরার শুরুতেই আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের বিবরণ রয়েছে। এতে সমগ্র মানব জাতিকে দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একভাগ কাফের অন্য ভাগ মোমেন। পৃথিবীর যে স্থানেই বাস করুক না কেন মোমেনগণ একদল। আর যারা বেঈমান, কাফের তারা ভিন্ন একটি দল। ইসলামী শরীয়ত এ বিষয়টির উপর এত গুরুত্বারোপ করেছে যে, কোন কাফের মুসলমানের উত্তরাকিারী হয়না, আবার কোন মুসলমানও কাফেরের উত্তরাধিকারী হয়না। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এর জন্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। এরপর এই সূরায় মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১২৯

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, (لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ) দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তাদেরকে আল্লাহর জিকর থেকে বিরত না রাখে। আর এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ।

জীবনের এসব উপকরণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের দান। এর দ্বারা পরীক্ষা করা হয় যে কে আল্লাহ্ পাকের দান নিয়ে মুগ্ধ মত্ত হয়ে থাকে এবং স্বয়ং দাতাকে ভুলে থাকে? আর কে দানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে স্বয়ং দাতার স্মরণে তন্ময় থাকে? [১]

ইমাম রাজী (রঃ) উভয় সূরার সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন, সূরা মুনাফেকুনে মিথ্যুক মুনাফেকদের মিথ্যাবাদিতা এবং প্রতারণার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ সূরায় মুনাফেকদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ

অর্থাৎ আসমান যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ পাক সবই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন।

অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হল, আল্লাহ্ পাকের আযাবকে ভয় করা এবং পরকালীন জীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করা।[২]

তফসীরুল কোরআন

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

“আসমান সমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে”।

যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ্ পাকের তসবীহ্ পাঠে রত রয়েছে, তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

“আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর সকল প্রশংসাও তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতবান”।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১২৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২০

অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা এক আল্লাহ পাকেরই, আর কারোই নয়, আর প্রশংসা মাত্রই এক আল্লাহ পাকের জন্যে। যাবতীয় গুণাবলী তাঁরই। সব কিছুর উপর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, আর তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। আর তিনি যতখানি ইচ্ছা করেন, ততখানিই হয়।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মোমেন, তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ পাক তা লক্ষ্য করছেন"।

আল্লাহ পাকই মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই তার রিয্ক দাতা ও ভাগ্যনিয়ন্তা, এমন অবস্থায় প্রত্যেকেরই কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা।

কিন্তু এতদত্ত্বেও মানুষের একদল কাফের হয়ে গেল, আর এক দল মোমেন রয়ে গেল। এক দল আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ হল এবং তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য করলো, আর এক দল মোমেন রয়ে গেল।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন। সে ইচ্ছা করলে ভাল কাজ করতে পারে ইচ্ছা করলে মন্দ কাজও করতে পারে। যদি সে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ পাকের প্রতি আত্মসমর্পণ করে তবে তার জন্যে জান্নাতের চির পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে যে তার ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তার জন্যে চির শাস্তির কেন্দ্র দোযখ অপেক্ষা করছে। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। অতএব, প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া উচিত এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত।

মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক মায়ের উদরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। ফেরেশতা আরজ করে হে পরওয়ারদেগার! এখন এটি শুক্র। এরপর আরজ করে, এখন জমাট রক্ত, এরপর ফেরেশতা আরজ করে, এখন গোশ্‌ত খন্ড। এরপর ফেরেশতা আরজ করে, হে পরওয়ারদেগার! এটি নর হবে? না নারী? এটি নেককার হবে না বদকার? এর রিয্ক কি হবে এবং তার জীবনের মেয়াদ কতদিন হবে? (এসব প্রশ্নের জবাব যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়) তা মায়ের উদরে থাকতেই লিপিবদ্ধ করা হয় (বোখারী শরীফ)।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, পূর্বোল্লেখিত হাদীসের শেষে একথাটি সংযোজিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক সারা জীবন জান্নাতী আমল করে এমনকি, তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের তফাত থাকে, কিন্তু তার সম্পর্কে মায়ের উদরে যা লিপিবদ্ধ থাকে তা এগিয়ে আসে এবং সে দোযখে চলে যায়।

মুসলিম শরীফ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) থেকে এ মর্মে হাদীস সংকলিত রয়েছে, আল্লাহ পাক আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আর তখন তার আরশ ছিল পানির উপর।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান সমূহ এবং যমীনকে যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং আল্লাহ পাকের নিকটই তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সমগ্র সৃষ্টি জগতের তুলনায় মানুষের আকৃতি অসাধারণ সুন্দর এবং অতুলনীয়। এমনিভাবে মানুষকে আল্লাহ পাক বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছেন। অতএব মানুষের কর্তব্য হল, তার আকৃতির ন্যায় তার প্রকৃতিও যেন সুন্দর হয়, তার জন্য সাধনা করা। যদি কোন মানুষের আকৃতি সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কর্মকান্ড মন্দ ও ঘৃণ্য হয় তবে কেয়ামতের দিন তাকে মন্দ আকৃতি দিয়েই উঠানো হবে। এজন্যে সর্বদা সাবধান থাকা এবং সৎ কাজে মশগুল থাকা একান্ত কর্তব্য। কেননা, প্রত্যেককে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে।

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর সে সবও তিনি জানেন। আর আল্লাহ পাক মানুষের মনের কথাও ভালভাবেই জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের জ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যাপকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান যমীনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত আছেন। আর তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং প্রকাশ কর, তাও আল্লাহ পাক জানেন, এমনকি তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে কথা থাকে তাও আল্লাহ পাক পূর্বেই জানেন।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى
اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن
يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

তরজমা

(৫) পূর্বকালের কাফেরদের সংবাদ কি তোমাদের নিকট পৌছায়নি? তারা তো তাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করেছে। আর তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি।

(৬) তা এজন্যে যে, তাদের নিকট তাদের পয়গম্বরগণ উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ নিয়ে আসতেন, তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথ দেখাবে? এরপর তারা কুফরী ও নাফরমানী করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা, আর আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অভাব মুক্ত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

(৭) কাফেররা মনে করে তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা, (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্য অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে, আর আল্লাহ পাকের পক্ষে তা অতি সহজ।

(৮) আর তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াত সমূহে পূর্বকালের কাফেরদের শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, সে খবর কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়নি?

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা পূর্বকালের কাফেরদের যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি, সামুদ জাতি, আদ জাতি এবং অন্যান্য অবাধ্য জাতিগুলোর কথা স্মরণ করানো হয়েছে। তারা যুগে যুগে আল্লাহ্ পাকের নবী রসূলগণকে অস্বীকার করেছে, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আর মিথ্যাকে সত্য মনে করেছে। পরিণামে দুনিয়াতে তাদের কঠিন শাস্তি হয়েছে। তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর স্বাদ আস্বাদন করেছে এবং আখেরাতে তাদের জন্যে কঠোর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) একথাও লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীকে, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত কাফেরদের, কেননা কোরআনে করীম চিরন্তন সত্য, কোরআনে করীমের পয়গাম বিশ্ব-জনীন। এতে শিক্ষা রয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। কোরআনে করীমের পাঁচশত আয়াতে পূর্ববর্তী কাফেরদের ঘটনা বর্ণনা করে সকল যুগের মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে যে বা যারা যে দেশেই বাস করুক এবং যে পরিবেশেই থাকুক, যদি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ, আর এ পরিণতি ইতিপূর্বেও হয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১২২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫২৭

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

"তা এজন্যে যে তাদের নিকট তাদের পয়গম্বরগণ উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ নিয়ে আসতেন, তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথ দেখাবে? এরপর তারা কুফরী ও নাফরমানী করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা, আর আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত"।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, পূর্বকালের কাফেররা নবী-রসূলগণের হেদায়েতকে অস্বীকার করেছে এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, মানুষ কি আল্লাহর বাণী বাহক হতে পারে এবং আমাদেরকে আল্লাহর পথে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের পথ-নির্দেশ করতে পারে? তাদের এসব কথা ছিল অহংকার প্রসূত এবং চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। এজন্যেই তারা বলতো, যদি আমাদের হেদায়েতের জন্যে কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন হয়, তবে কোন ফেরেশতা এ উদ্দেশ্যে কেন প্রেরিত হলেন না? তাদের ধারণা ছিল মানুষ কখনও নবী হতে পারেনা, এজন্যে তারা নবী রসূলগণের হেদায়েত মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি।

وَتَوَلَّوْا

তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সমূহ যা নবী রসূলগণ যুগে যুগে উপস্থাপন করেছেন, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, নবী রসূলগণ তাদের নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ স্বরূপ যে উজ্জ্বল মোজেযা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের যুগের কাফেররা তাদের অহংকারের কারণে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। তাঁদের প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করতেও প্রস্তুত হয়নি।

وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ

এতে আল্লাহ পাকের কিছু যায় আসেনা, কেননা আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ পাকের কারো কোন এবাদতের প্রয়োজন নেই। কারো আনুগত্যে আল্লাহ পাকের কোন উপকার হয়না, কারো নাফরমানীতে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি হয়না। যে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর বন্দেগীতে মশগুল হয়, সে তা তার উপকারার্থেই করে। পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে।

وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির ঈমান ও আনুগত্যের প্রয়োজন থেকে মুক্ত, বেপরোয়া, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। সমগ্র সৃষ্টি সর্বক্ষণ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায় রত রয়েছে।[১]

তিনি সর্বগুণাকর এবং চির গুণান্বিত। এ কারণে কারো কুফর ও নাফরমানীর কারণে তাঁর কিছুই যায় আসেনা, কারো প্রশংসার তাঁর কোন প্রয়োজনই নেই।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا

"কাফেররা মনে করে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা"।

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

"(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে, আর আল্লাহ্ পাকের পক্ষে তা অতি সহজ"।

কাফেররা যেভাবে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করতো এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করতো, ঠিক তেমনি তারা আখেরাতের জীবনকেও অস্বীকার করতো। এ জীবনের পর আল্লাহ্ পাক মানুষকে পুনঃজীবন দান করবেন, একথাও তারা মেনে নিতে প্রস্তুত হতো না। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে زعم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফেরদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিছক ধারণা-প্রসূত। তারা মনে করে, তাদেরকে পুনর্জীবন দেয়া হবেনা, তাদের পুনরুত্থান হবেনা। অথচ যে আল্লাহ্ পাক প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা এবং একত্রিত করা আদৌ কঠিন নয়, বরং অত্যন্ত সহজ কাজ। এজন্যেই আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকের শপথ! অবশ্য অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থান করানো হবে এবং তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করানো হবে এবং তোমাদের ভাল-মন্দ কর্মের ফল অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করানো হবে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১২৯

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের মহান কুদরত হেকমত, সার্বভৌমত্বের কথা মনে থাকলে কেয়ামতের দিন সর্বকালের সকল মানুষকে একত্রিত করা কঠিন মনে হয়না, আর এ বিষয়কে তাগিদ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের পক্ষে অতি সহজ।

ঈমানই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ

যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে এবং প্রত্যেককে তার ভাল বা মন্দ কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে, কেননা পরকালীন চিরস্থায়ী জগতে ঈমানই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"আর তোমরা ঈমান আন আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল"।

অতএব, তোমরা মহান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁর রসূলের প্রতিও ঈমান আন, যে নূর আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি তার প্রতিও বিশ্বাস কর।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এই নূর হলো পবিত্র কোরআন। আর অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে একটি নূর এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ"।

এ আয়াতে نور শব্দটি দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে نور শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে লিখেছেনঃ যেভাবে অন্ধকারে পথ পেতে হলে আলোর প্রয়োজন, ঠিক তেমনি গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ পৃথিবীতে হেদায়েত বা সঠিক পথ পেতে হলে প্রয়োজন পবিত্র কোরআনের হেদায়েতের এবং

প্রয়োজন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার। হেদায়েত লাভের এ দু'টি মূল ভিত্তি থেকে দূরে থেকে হেদায়েত লাভ করার কথা কল্পনাতীত। এজন্যেই কোরআনে করীম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ চির সংরক্ষিত, চির আলোচিত।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। অতএব, ভাল কাজের সুফল এবং মন্দ কাজের কুফল যে অবশ্যম্ভাবী একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। আর এজন্যে প্রতিটি মানুষকে সর্বদা সাবধান থাকতে হবে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾

তরজমা

(৯) স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে একত্রিত করবেন সমাবেশ করার দিনে, আর তাই হবে লাভ-ক্ষতির দিন, যে কেউ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ সমূহ দূরীভূত করবেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে নির্ঝর-মালা, তারা তাতে চিরদিন থাকবে। এটি বিরাট সাফল্য।

(১০) আর যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে, তারা হবে দোযখবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে, আর তা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(১১) আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কোন মুসিবত আসেনা, আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাক তার মনকে (সবর অবলম্বন ও সন্তুষ্টি অর্জনের) পথ দেখিয়ে দেন। আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

(১২) আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের হুকুম মেনে চল এবং রসূলের নির্দেশও পালন কর, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও, তবে (জেনে রেখ) আমার রসূলের দায়িত্ব হলো সুস্পষ্টভাবে (তোমাদের নিকট) আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দূরাত্মা নাফরমানদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যারা নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং তাদেরকে যখন কেয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে, তখন তারা তার প্রতি বিদ্রুপ করেছে।

আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে কেয়ামতের ভয়াবহ দিনের কথা, আর কেয়ামতের দিনকে বলা হয়েছে লাভ-ক্ষতির দিন, হার-জিতের দিন, সেদিনই মোমেনগণ সত্যিকার অর্থে লাভবান হবে, আর কাফেররা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার সমগ্র জীবনের লাভ একত্রিত করলেও সেদিনের লাভের সমান হবেনা। সেদিন মোমেনগণ দেখতে পাবে কাফেরদের ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভয়াবহ দৃশ্য, দুনিয়ার জীবনে তাদের জয় এবং সাফল্য যতই হোক, সেদিনের পরাজয় এবং বিপদের তুলনায় তা কিছুই মনে হবেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সমবেত করবেন, যেদিন হবে সমাবেশের দিন, সেদিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর, ঈমান অর্জন কর, নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ কর, সত্য সাধনায় রত হও, অন্যায় অসত্য গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর, সেদিন হবে লাভ-ক্ষতির দিন, সত্যিকার অর্থে সেদিনই হবে জয়-পরাজয়ের দিন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিনকেই "তাগাবুনের দিন" বলা হয়েছে। যেভাবে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে হয় লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন মোমেনগণ লাভবান হবে, কাফেররা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। ঈমানদার ও নেককারগণ বিজয় লাভ করবে এবং বেঈমান ও পাপীষ্ঠরা পরাজিত হবে। মোমেনদের সাফল্য সেদিন হবে সুনিশ্চিত, আর কাফেরদের ভরাডুবি হবে অবধারিত।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর এবং হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেনঃ মোমেন (জান্নাতে)

তাদের মহলের মালিক হবে, আর হতভাগা কাফেরদের ঘরগুলোরও তারা উত্তরাধিকারী হবে, যদি কাফেররা দুনিয়ার জীবনে ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ করতো, তবে জান্নাতের এসব বাড়ী-ঘরের তারাই মালিক হতো।

এবনে মাজা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের (আখেরাতে) দু'টি ঘর থাকবে, একটি জান্নাতে, অপরটি দোযখে। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং সে দোযখে যায়, তখন তার জান্নাতের বাড়ীটির মালিক হয় জান্নাতীগণ, আর এটিই অর্থ হলো أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ আয়াতের।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, বন্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করে) বলে, তুমি তাঁর সম্পর্কে কি বলতে? তখন মোমেন জবাব দেয়, তিনি আল্লাহ পাকের বন্দা এবং তাঁর রসূল। তখন তাকে বলা হয়, দোযখে তোমার স্থানটি দেখ, আল্লাহ পাক দোযখের ঐ স্থানের পরিবর্তে তোমাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন।

এবনে মাজা শরীফ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার থেকে পলায়নপর হয়, আল্লাহ পাক তার জান্নাতের অধিকার কেটে দেন।

মুসলিম শরীফে এবং তিরমিজী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে) এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কি জান কাঙ্গাল কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ আমাদের নিকট তো কাঙ্গাল সে ব্যক্তিই, যার কোন অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং যার কোন দ্রব্য-সম্ভারও না থাকে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই কাঙ্গাল, যে কেয়ামতের দিন নামায, রোজা; যাকাত প্রভৃতি নেক আমল নিয়ে আসবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কোন লোককে গালি দিয়েছে বা কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়েছে বা কারো অর্থ-সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাত করেছে, অথবা কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে তথা কাউকে হত্যা করেছে, তবে তার নেকী সমূহ যদি হক্দারের হক্ব থেকে কম হয়, তাহলে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যার উপর তার ভাইয়ের কোন হক্ব থাকে, তবে তার কর্তব্য হলো দুনিয়াতেই সে যেন ঐ

হক্ব আদায় করে দেয়, কেননা আখেরাতে দেরহাম দীনার তথা কোন স্বর্ণমুদ্রা বা কোন মুদ্রাই থাকবেনা, আর যদি তার নেক আমল থাকে, আর যতখানি দরকার সে হক্ব অনুযায়ী থাকে, তবে তার নেক আমল নিয়ে নেয়া হবে এবং হক্বদারকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি ঐ দেনাদার ব্যক্তির কোন নেক আমল না থাকে, তবে হক্বদারের গুনাহ গুলো তার উপর চড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ সমূহ দূরীভূত করবেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হয় এবং তারা চিরদিন তাতে থাকবে। আর এটিই হলো সর্ব শ্রেষ্ঠ সাফল্য"।

অর্থাৎ এই ঈমান ও নেক আমলই হলো পরকালীন জীবনের সাফল্য লাভের মূল উৎস, কেননা ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই মানুষ উপকৃত হয় এবং তার গুনাহ মাফ হয়, জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা হয়।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

পক্ষান্তরে যারা কুফরী ও নাফরমানী করে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে তারা হয় দোযখবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে। আর দোযখ হলো অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য দু'টি আয়াতের মধ্যে কেয়ামতের দিন দু'দলের যে পরিণতি হবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং প্রত্যেকের পরিণতিকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে হার-জিতের সেই কঠিন দিনের জন্যে প্রত্যেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। মোকাতেল এবনে হাইয়ান বলেছেন, এর চেয়ে বড় হার-জিত আর কী হবে, কেয়ামতের দিন একদলকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আরেক দলকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামত হবে জুমআর দিন, আর এদিনেই আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষকে সমবেত করানো হবে। আর ঐ সমাবেশেই হক্ব ও বাতিল বা সত্য-অসত্যের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করা

হবে। যারা হবে হক্বপন্থী তথা ঈমানদার ও নেককার, তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছানো হবে। আর যারা কাফের ও পাপীষ্ঠ হবে, তাদেরকে জান্নাতীদের সম্মুখেই দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাই হবে লাভ-ক্ষতি বা হার-জিতের দিন।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

"আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন মুছিবত আসেনা"।

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য

মানুষকে এ জীবনে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা সবই ভোগ করতে হয়। এ জীবন যেমন ফুলশয্যা নয়; তেমনি দুঃখের সাগরও নয়। দিনের পর যেমন রাত রয়েছে, তেমনি রাতের পর দিনও রয়েছে, তথা সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এখানে চির বর্তমান। কোরআনের ভাষায়ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(সূরা ইনশিরাহ)

"নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি"।

এটিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান, আর এটিই জীবনের বাস্তবতা। জীবনের এ বাস্তবতাকে স্বীকার করেই মানুষকে এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু মানুষের চরিত্র বিচিত্র, আল্লাহ পাক যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়, আত্মবিস্মৃত হয়, এমনকি সে ভুলে যায় স্বয়ং আল্লাহ পাককে, যিনি দান করেছেন তাকে জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব, পক্ষান্তরে, যখন নেমে আসে তার উপর কোন বিপদাপদ, তখন সে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, এক্ষেত্রেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কোন মুছিবত আসেনা।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, যে, আনন্দ বা বিপদ উভয়ই আল্লাহ পাকের দু'টি হুকুমের নাম, অতএব বিপদ আপতিত হলে আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমানের সঙ্গে সবর অবলম্বন করতে হয়, সৎ সাহস নিয়ে বিপদের মোকাবেলা করতে হয়, কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে পড়তে নেই, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"কখনো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা"।

বিপদে সবর অবলম্বন করাই হলো মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাক তার মনকে (সবর অবলম্বনের ও সন্তুষ্টি অর্জনের) পথ দেখিয়ে দেন।

আ'মাশ আবু জেরিয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ আমরা হযরত আলকামার নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, যখন কোন ব্যক্তির উপর বিপদ আপতিত হয় তখন তার কর্তব্য হলো, এ বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, এটি আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই হয়েছে, এটিই তকদীর, আর এ তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং সবর অবলম্বন করাই মর্দে মোমেনের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, একথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্ধারিত তকদীর মোতাবেকই সব কিছু হচ্ছে, আর অন্তরকে হেদায়েত করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপতিত মছিবতকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা এবং এর জন্যে সওয়াবের আশা করা।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, একথাটির তাৎপর্য হলো "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পাঠ করা।

মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য

আর এজন্যেই কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য হলো,

(১) যে কোন কাজের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" পাঠ করা।

(২) কোন বিপদ দেখা দিলে "ইন্নালিল্লাহ" পাঠ করা।

(৩) কোন খুশীর বিষয় হলে "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করা।

(৪) কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করলে, তার উদ্দেশ্যে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" পাঠ করা।

(৫) ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন কথা বলতে হলে "ইনশাআল্লাহ" বলা।

(৬) কোন প্রশংসনীয় কিছু দেখলে বা শ্রবণ করলে "মা'শাআল্লাহ" বলা।

(৭) সর্বদা সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে থাকা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেন বন্দার অবস্থা

অত্যন্ত বিস্ময়কর, তকদীরের কারণে মোমেনের যে কোন অবস্থাই হোক না কেন, তাকে সওয়াব দান করা হয়। যদি তার কোন কষ্ট হয়, আর সে ঐ কষ্টের উপর সবর করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাকে সওয়াব দান করেন। আর যদি সে কোন নেয়ামত লাভ করে, আর ঐ নেয়ামতের জন্যে সে শোকর আদায় করে, তবে তার জন্যেও তাকে সওয়াব দান করা হয়।

একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করেছিলেনঃ

ذلنى الى رضاءك

হে পরওয়ারদেগার! তুমি কখন আমার প্রতি খুশী হও, তা আমাকে দয়া করে জানিয়ে দাও।

তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছিলেনঃ

رضاءى برضاءك فى قضاءى

অর্থাৎ আমার নির্ধারিত তকদীরে তুমি যদি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি।

যাহোক, মোমেন বন্দার বৈশিষ্ট্য হলো এই, যদি তার উপর কোন বিপদাপদ আপতিত হয় তবে সে একথা বিশ্বাস করে যে, তা আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই এসেছে। এ বিশ্বাসের বরকতে যা অর্জিত হয়, তা হলো يَهْدِ قَلْبَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাকে সবর অবলম্বনের এবং তকদীরে সন্তুষ্ট থাকার তওফিক দান করেন।

তকদীরের ব্যাপারে সন্দেহ নিরসন

এবনে দায়লামী বর্ণনা করেন, আমি হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর নিকট আরজ করলাম যে, আমার অন্তরে তকদীরের ব্যাপারে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, আপনি আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এমন কোন হাদীস শুনিয়ে দিন, যাতে আমার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। তখন হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বললেন, যদি আল্লাহ পাক আসমান এবং যমীনের সমস্ত অধিবাসীকে আযাব দেন তবে দিতে পারেন, তা তাঁর জুলুম হবেনা, আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহমত করেন তবে তাঁর রহমত তাদের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। যদি ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও তুমি আল্লাহর রাহে ব্যয় কর, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তকদীরের প্রতি তোমার ঈমান না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তোমার ঐ দান গ্রহণ করবেন না। জেনে রাখ, যা কিছু তোমার পাওয়ার আছে (তকদীর মোতাবেক) তা তুমি অবশ্যই পাবে, আর যা তোমার প্রাপ্য নয়, তা তুমি কখনো পাবেনা। যদি এ তকদীরের বরখেলাফ কোন প্রকার আকীদা পোষণ কর, আর সে অবস্থায় তুমি মৃত্যুবরণ কর,

তবে তুমি দোযখে যাবে। এবনে দায়লামী (রঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এই একই প্রশ্ন করি, তিনি হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর অনুরূপ জবাবই দিলেন। এরপর আমি হযরত হোজায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ)-এর নিকট একই প্রশ্ন উত্থাপন করলাম। তিনিও আমাকে অনুরূপ জবাবই দিলেন। এরপর আমি হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ)-এর নিকট হাযির হই এবং এই একই প্রশ্ন করি, তিনিও আমাকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়ে একই জবাব দিলেন।

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত এমনকি, তিনি মানুষের মনের নিভৃত কোণের সকল কথাও জানেন। আল্লাহ পাক মানুষকে তার জ্ঞান-বিবেচনা মোতাবেকই সুখ বা দুঃখ দিয়ে থাকেন, তাঁর নিকট সব কিছুই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, তিনিই সবজান্তা, তাঁর অজানা কিছুই নেই, কে বিপদে সবর অবলম্বন করলো, কে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপতিত বিপদকে বরণ করে নিল, বিপদ মুহূর্তে কার অন্তরে কী ভাবের উদ্রেক হলো, আল্লাহ পাক সবই জানেন।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

"আর তোমরা আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে চল এবং রসূলের নির্দেশও পালন কর, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও, তবে (জেনে রেখ) আমার রসূলের দায়িত্ব হলো সুস্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া"।

অর্থাৎ সুখ হোক কি দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই কর্তব্য। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে দান করাতেই রয়েছে সমূহ কল্যাণ, কিন্তু তবু যদি কেউ আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে বিমুখ হয়, তথা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুসরণে অপ্রস্তুত হয় তবে সে নিজেই তার ধ্বংস ডেকে আনে। এমন অবস্থায় আমার রসূলের কোন ক্ষতি হবেনা, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবে।

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَاۤ
اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِنْ
تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ ع

তরজমা

(১৩) আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আর আল্লাহ পাকের উপরই মোমেনদের ভরসা করা উচিত।

(১৪) হে মোমেনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু, অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি (তারা তওবা করে তবে) তোমরা ক্ষমা কর, এবং (শাস্তি বিধান না করে) তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর, আর তাদেরকে ক্ষমা কর, আর জেনে রাখ, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি একটি কঠিন পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

(১৬) অতএব, তোমাদের কল্যাণের জন্যে তোমরা আল্লাহ পাককে যথাসাধ্য ভয় করে চল, তাঁর কথা শ্রবণ কর, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। আর (আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

(১৭) যদি তোমরা আল্লাহ পাককে "করজে হাসানা" (উত্তম ঋণ) দান কর, তবে তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ পরিমাণে তা দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং অতীব সহিষ্ণু।

(১৮) তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু অত্যন্ত ভাল করেই জানেন, তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে এ আদেশের কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, এক আল্লাহ পাকই মা'বুদ বা উপাস্য, এবাদতের যোগ্য, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা এবং তিনিই ভাগ্য-নিয়ন্তা, তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই, অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই কর্তব্য, কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কিভাবে করবো, তা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাই মুসলমান মাত্রকে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। আল্লাহ পাক তাঁকেই সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অতএব, তাঁর অনুসরণেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ এবং পরিপূর্ণ সাফল্য।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"আর মোমেনদের এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত"।

যেহেতু ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তকদীর অনুযায়ীই হয়ে থাকে, তাই আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখা কর্তব্য।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু, অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর, যদি (তারা তওবা করে তবে) তোমরা তাদেরকে ক্ষমা কর এবং (শাস্তি বিধান না করে) তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর, আর তাদেরকে ক্ষমা কর, আর জেনে রাখ আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কার কিছু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে হিযরতের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিবারবর্গ হিযরতের ব্যাপারে তাঁদেরকে বাধা দেয়, আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তাঁদের পরিবারবর্গ বলে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ, আমরা সবর করেছি কিন্তু এখন তোমরা হিযরত করে চলে যাবে, তোমাদের এ বিরহ আমাদের জন্যে অসহনীয়, পরিবার-পরিজনের এ আবদারের কারণে তাঁরা হিযরতের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মোমেনদেরকে এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, হে মোমেনগণ! তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যেই তোমাদের শত্রু রয়েছে, যারা তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে বাধা দেয়। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধান পালনে বাধা দেবে, তারা মোমেনদের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হবে। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর, অর্থাৎ তাদের ক্ষতি-সাধন থেকে নিশ্চিন্ত হয়োনা, তাদের কথা মেনে চলোনা, তাদের কারণে তোমরা হিযরত পরিত্যাগ করেছ।

ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যখন তাঁরা মদীনা শরীফে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন তখন দেখলেন, ইতিপূর্বে যারা হিযরত করেছেন তাঁরা অনেক কিছুর এলম হাসিল করেছেন, এ অবস্থা দেখে নবাগত মুসলমানগণ তাঁদের পরিবার-পরিজনের প্রতি এজন্যে রাগান্বিত হলেন যে, তারা হিজরতের ব্যাপারে তাঁদেরকে বাধা দিয়েছিলেন। তখন নাযিল হলো وَاِنْ تَعْفُوْا অর্থাৎ যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের দোষ-ত্রুটিকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে মাফ কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকেও মাফ করবেন এবং তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কেননা আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

এবনে জরীর আতা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا থেকে সূরা তাগাবুনের শেষ আয়াত পর্যন্ত মদীনা মোনাওয়্যারায় হযরত আওফ এবনে মালেক আশযায়ী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত আওফ এবনে মালেক (রাঃ)-এর পরিবার বেশ বড় আকারের ছিল। তিনি যখনই জেহাদের ইচ্ছা করতেন তখনই তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিরা ক্রন্দণ করতে শুরু করতো এবং তারা বলতো, আপনি আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! এভাবে তাঁর অন্তর তাদের মায়ায় আপ্লুত হ'ত এবং জেহাদ থেকে তিনি বিরত থাকতেন। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ

পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি কঠিন পরীক্ষা মাত্র"।

অর্থাৎ তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে এক কঠিন পরীক্ষা স্বরূপ। যে ব্যক্তি চরম বাধা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করবে তাকে আল্লাহ পাক উচ্চ মরতবা দান করবেন। কেননা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর হয়েছেন।

আর এজন্যেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হলো, আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্তবা বিশেষ মর্তবা সম্পন্ন ফেরেশতার চেয়েও উচ্চে। আর আউলিয়ায়ে কেরামের মর্তবা সাধারণ ফেরেশতার চেয়েও উচ্চে, কেননা ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে কোন বাধা-বিপত্তি নেই।

আয়াতের মর্মকথা

মানুষের পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি অনেক সময় সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করে। ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার-পরিজনের মায়ায় মুগ্ধ থাকার কারণে মানুষ স্বয়ং আল্লাহ পাককে ভুলে যায়। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধ অমান্য করে, এমনকি গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়। এভাবে একান্ত আপন-জনেরা মানুষের চরম ক্ষতির কারণ হয়। দুনিয়ার জীবনে সুখ-সামগ্রীর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুখের কথা ভুলে যায়। এজন্যে মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো, এ ব্যাপারে সদা সতর্কতা অবলম্বন করা, কোনভাবেই যেন আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন গাফলত না হয়।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ নিঃসন্দেহে একটি পরীক্ষা স্বরূপ। এসবের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কে আল্লাহর রসূলের বিধানকে ভুলে যায়, আর কে এসব কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের বিধান পালনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে তৎপর থাকে।

আল্লাহ পাকের পথে থাকার অন্তরায়

আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের পথে থাকার কয়েকটি অন্তরায় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ রয়েছে।

(১) জীবন-সংগ্রামে কখনো কখনো মানুষকে বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। এমন অবস্থায় এ সত্য উপলব্ধি করা কর্তব্য যে, বিপদাপদ আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়েছে, তাঁর নির্ধারিত তকদীর মোতাবেকই হয়েছে। তাই তাঁর রহমতের আশা

রাখতে হবে এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখতে হবে, শুধু এভাবেই এ বাধা অতিক্রম করা যাবে।

(২) স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়ার কারণেও ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

(৩) অর্থ-সম্পদের লোভ এবং মোহ মানুষকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে, এক্ষেত্রেও আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাক ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে আয় ও ব্যয়ের যে পথ নির্ধারিত রয়েছে, তাঁর উপর সুদৃঢ় থাকা একান্ত কর্তব্য।

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে বিরাট প্রতিদান"।

অর্থাৎ যারা এসব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে এবং এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং আল্লাহ পাকের পথে থাকার অন্তরায় সমূহ অতিক্রম করবে, তাঁর বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রতিদান এবং বিশেষ শুভ-পরিণতি।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ

"অতএব, তোমাদের কল্যাণের জন্যে তোমরা আল্লাহ পাককে যথাসাধ্য ভয় করে চল, তাঁর কথা শ্রবণ কর, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। আর (আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর হবে"।

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম সায়ীদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ (তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, যতখানি ভয় করা উচিত) নাযিল হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম সারা রাত দরবারে এলাহীতে দন্ডায়মান থাকতেন, এরপরও তারা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন, কেননা যতখানি ভয় করা উচিত ততখানি ভয় করা সম্ভব হচ্ছেনা বলে অনুভূত হচ্ছে। আল্লাহ পাকের ভয়ের হক্ব আদায় করা সত্যিই সুকঠিন, এমন সময় আলোচ্য আয়াত فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ নাযিল হলো। অর্থাৎ তোমাদের সাধ্য মোতাবেক তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। এর পাশাপাশি আরও তিনটি আদেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَاسْمَعُوْا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পবিত্র কোরআনের উপদেশ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক।

وَاَطِيْعُوْا

এবং তাঁর বিধি-নিষেধের উপর আমল করতে থাক তথা পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে থাক।

وَاَنْفِقُوْا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাক।

خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহর রাহে দান করায় তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে আল্লাহর রাহে দান করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এ নির্দেশ পালনে সবচেয়ে বড় বাধা আসে মানুষের নিজের অন্তর থেকে, সেখানে মানুষের মধ্যে কার্পণ্য থাকে, সেখানে মানুষকে সৎ কর্ম করতে বাধা দেয়, এটি মানুষের অন্তরের একটি ব্যাধি। আলোচ্য আয়াতে এ ব্যাধি দূর করার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছে, যারা তাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই জীবনে সফলকাম হয়েছে।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

"যদি তোমরা আল্লাহ পাককে "করজে হাসানা" (উত্তম ঋণ) দান কর, তবে তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ পরিমাণে তা দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন"।

আল্লাহ পাকের রাহে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে আলোচ্য আয়াতে "করজে হাসানা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই দানের বদলা দ্বিগুণ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, যারা একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ পাকের রাহে দান করতে তারা মোটেই সংকোচ করেনা, আল্লাহ পাকই মানুষকে দান করেন, অতএব তাঁর দানকে তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করাই কর্তব্য। যারা সমাজের দুঃখী মানুষকে সাহায্য করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন, আর এ দানকে আল্লাহ পাক "করজে হাসানা" বলে আখ্যায়িত করে দান খয়রাতের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

قَرْضًا حَسَنًا

অর্থাৎ সওয়াবের আশায় সন্তুষ্ট চিত্তে দুঃখী মানুষকে আর্থিক সাহায্য করা, এজন্যে শর্ত হলোঃ

(১) লোক দেখানোর কোন উদ্দেশ্য থাকবেনা,

(২) দানবীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকবেনা।

(৩) দান গ্রহীতার কাছে দানের স্বীকৃতির আশা করবেনা।

(৪) দান গ্রহীতাকে এজন্যে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া হবেনা।

যারা এসব শর্ত মেনে আল্লাহ্ পাকের রাহে দান করবে, তাদের জন্যে সুসংবাদ হলোঃ

يُضٰعِفْهُ لَكُمْ

"তাদেরকে আল্লাহ্ পাক দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, সওয়াব দান করা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের মর্জির ব্যাপার, তিনি তা দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারেন; বরং এর চেয়ে বেশীও দিতে পারেন।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ

আর তিনি তোমাদের গুণাহ্ মাফ করে দেবেন, অর্থাৎ আল্লাহর রাহে দান করার কারণে তিনি তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন।

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

আর আল্লাহ্ পাক গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বন্দার দানের কদর করেন, সামান্য দানের অনেক বেশী সওয়াব দান করেন। তিনি সহিষ্ণু, অর্থাৎ অপরাধী বন্দার শাস্তি তিনি তরান্বিত করেন না, অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীকে শাস্তি দেন না।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পূর্ণ অবগত, তিনি মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন কিছুই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে, আল্লাহ্ পাকের অজানা নেই। তিনি সর্ব শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন বন্দাকে শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর জ্ঞান ব্যাপক এবং গভীর। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের দরবারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান। তাই তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ এবং বন্দা মাত্রই আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে তার আমলের বদলা অবশ্যই পাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তালাক

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا

الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ

حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ

اَمْرًا ①

তরজমা

(১) হে নবী! (লোকদেরকে বলে দিন যে) যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা কর, তখন (তাদেরকে ঋতু অবস্থায় নয়, বরং পবিত্র অবস্থায়) ইদ্দতের পূর্বে তালাক দিও আর (তালাক প্রদানের পর) ইদ্দতের হিসাব রেখ এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাককে ভয় কর। তাদেরকে বাসগৃহ থেকে বের করে দিওনা। আর তারা নিজেরাও যেন বের না হয়, তবে যদি কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ করে, তবে তার কথা স্বতন্ত্র। আর এসব হলো আল্লাহ পাকের নির্ধারিত বিধান। আর যে আল্লাহ পাকের বিধান সমূহ লংঘন করবে, সে নিঃসন্দেহে নিজের প্রতিই জুলুম করবে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ পাক (তোমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দেবেন এর (তালাক প্রদানের পর) কোন নতুন বিষয়।

সূরা তালাক প্রসঙ্গে

মদীনা তৈয়্যেবায় অবতীর্ণ এ সূরায় ২ রুকু ও ১২টি আয়াত রয়েছে। এ সূরার বাক্য সংখ্যা ২৪৭ এবং অক্ষর সংখ্যা ১,১৭০।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় তালাকের বিধি-নিষেধ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই এ নামকরণ করা হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, এ সূরাকে "আন নেসাউল কাসরী"ও বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ নামকরণ করেছেন।[১]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষার্ধে এরশাদ হয়েছে,

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

"নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর"।

আর এ আয়াতের শুরুতেই তালাকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা ক্ষেত্রবিশেষে শুধু সতর্কতা অবলম্বন নয়; বরং স্ত্রীকে তালাক দেয়ার মাধ্যমে তার কাছ থেকে আত্মরক্ষাও করতে হয়। এতদ্ব্যতীত, জাহেলিয়াতের যুগে তালাক সম্পর্কে অমানবিক প্রথা সমূহ প্রচলিত ছিল, সেগুলোরও সংশোধন করা হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, তার মৃত্যু হবে আমার সুন্নতের উপর।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে এ সূরা পাঠ করছে, তবে কোন কষ্টদায়ক স্ত্রী দ্বারা তাকে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশেষে ঐ স্ত্রীকে তালাক দেবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় তালাকের বিধান গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত আছে। সূরার শুরুতেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়ত তালাকের যে বিধান দিয়েছে, তা যেন পরিপূর্ণভাবে পালন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ তালাক দেয়ার পন্থা এমন হতে হবে, যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, অনন্যোপায় হয়েই এ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। এটি সাময়িক কোন পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া নয়। আর সে পন্থা হলো স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দেয়া, ঋতু অবস্থায় নয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১২৮
২। তফসীরে হক্কানী পারা-২৮, পৃষ্ঠা-১০৯

তৃতীয়তঃ ইদ্দতের বিধান এবং স্ত্রীর খোর-পোষের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

চতুর্থতঃ এসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার তথা আল্লাহ পাককে ভয় করার জন্যে বারে বারে তাগিদ করা হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

يَآأَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"হে নবী! (লোকদেরকে বলে দিন যে) যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা কর, তখন তাদেরকে ইদ্দতের পূর্বে তালাক দিও"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব-মুসলিমকে, ঋতুর সময়ের পূর্বে তথা পবিত্র অবস্থায় তালাক প্রদানের বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে করে ইদ্দত শুমার করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা না হয়, কেননা তালাকের ইদ্দত হলো পূর্ণ তিন হায়েজ, যদি স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া হয়, তবে পূর্ণ হায়েজ শুমার করা কঠিন হয়ে পরবে। অথচ ইদ্দত শুমার করার ব্যাপারে পরবর্তী বাক্যেই বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ

'আর ইদ্দতের হিসাব রেখ'।

আর এ দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পালন করতে হবে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ

"আর সকল অবস্থায় আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ পর্যায়ে আল্লাহকে ভয় করার তাৎপর্য হলো এই, ঋতুবতী অবস্থায় যেন তালাক দেয়া না হয়।

দ্বিতীয়তঃ এক সঙ্গে যেন তিন তালাক না দেয়া হয়।

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ

"আর তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিঃস্কার করোনা"।

স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ইদ্দত কালে ঘর থেকে বহিঃস্কার করা বৈধ নয়।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, স্বামীগৃহে ইদ্দত পালন করা শুধু যে স্ত্রীর অধিকার তাই নয়; বরং এটি শরীয়তের বিধান। আর এ বিধান পালন করেই স্ত্রীকে স্বামী গৃহে ইদ্দত কাল অতিবাহিত করতে হয়।

وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীরাও যেন স্বামী-গৃহ থেকে বের না হয়, তবে যদি স্ত্রীর অশ্লীল আচরণ অথবা অনবরত মন্দ কথা ও সুস্পষ্ট মন্দ আচরণে বাধ্য হয়ে স্বামী গৃহ থেকে স্ত্রীকে বের করতে হয়, সেক্ষেত্রে স্বামী দায়ী হবেনা।

শানে নুযুল

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ), আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ), আল্লামা সয়ুতি (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক শানে নুযুল বর্ণনা করেছেন।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিত্রালয়ে চলে এসেছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এরশাদ করা হয়, আপনি এ ব্যাপারে রুজু করে নিন, অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে তাকে পুনঃ গ্রহণ করুন, কেননা সে অনেক বেশী রোজা রাখে এবং অনেক বেশী নামায আদায় করে। আর সে এ পৃথিবীতে যেমন আপনার স্ত্রী, জান্নাতেও সে আপনার স্ত্রী হিসেবে থাকবে।

এবনে জরীর এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বোখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বিষয়টি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত করলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং এরশাদ করলেন, তার কর্তব্য হলো রুজু করে নেয়া, এরপর সে পবিত্র হলে যখন দ্বিতীয়বার ঋতু আসবে, আর সে ঋতু থেকেও পবিত্রতা অর্জন করবে, তখন ইচ্ছা করলে সে তার স্ত্রীকে রাখতে পারবে বা তালাক দিতে পারবে। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)- এর ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আদ দুররুল মানসুরে" এর উল্লেখ করেছেন।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ

আর এসব হলো আল্লাহ পাকের নির্ধারিত বিধান সমূহ, যারা এ বিধান সমূহ লংঘন করবে, তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের প্রতিই জুলুম করবে, কেননা মানুষ

মাত্রকেই তার যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে কেয়ামতের কঠিন দিনে জবাবদেহী করতে হবে। আর আল্লাহ পাক পূর্বেই ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ পাক বন্দার হক্ব মাফ করবেন না, তাঁর নিজের হক্ব ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন।

لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

"তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ পাক (তোমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দেবেন এর (তালাক প্রদানের পর) কোন নতুন বিষয়"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি কি তা কেউ জানতে পারেনা। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত অতিবাহিত করার স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে স্বামীর ঘর, স্বামীর ঘরে ইদ্দত অতিবাহিত করার পর হয়তো আল্লাহ পাক স্বামীর মনোভাব পরিবর্তন করে দেবেন, স্বামী তার প্রদত্ত তালাকের ব্যাপারে লজ্জিত অনুতপ্ত হবে এবং সে রুজুও করবে। নতুন করে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করবে।

জরুরী জ্ঞাতব্য

যে স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হয়, সে ইদ্দত কালে স্বামীর বাড়ী থেকে দিনের বেলা বের হতে পারে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে, দিন বা রাত সকল সময় এমন স্ত্রীলোক বের হতে পারে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধে যে মুসলমানগণ শাহাদাত বরণ করেছেন, তাদের সহধর্মিনীগণ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলেন, আমাদের ঘরে একা একা খুবই কষ্ট হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করেছিলেন যে, এমন বিধবাগণ কোন একজন বিধবার গৃহে একত্রিত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩
তফসীরে কবীর খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৯৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৩৭-৪১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫৪

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

তরজমা

(২) এরপর যখন তারা তাদের ইদ্দত অতিক্রান্ত করার নিকটবর্তী হয়, তখন নিয়ম মাফিক তাদেরকে (স্ত্রী হিসাবে) রেখে দাও অথবা তাদেরকে ভদ্রভাবে ছেড়ে দাও এবং (উভয় অবস্থায়) তোমাদের দু'জন সাক্ষী রাখ। তোমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সঠিক সাক্ষ্য দিও। যারা আল্লাহ্ পাক এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, এর দ্বারা তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহ্ পাককে ভয় করে, আল্লাহ্ পাক তার জন্যে নাজাতের পথ বের করে দেন।

(৩) এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিযক পৌছে দেন, যা হয় তার জন্যে কল্পনাতীত। আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবেন। আল্লাহ্ পাক বস্তু মত্রের জন্যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

(৪) আর তোমাদের (তালাক প্রাপ্তা) স্ত্রীদের মধ্য থেকে যারা তাদের ঋতু সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর যাদের ঋতু এখনো হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব হওয়া। যে কেউ আল্লাহ্ পাককে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজ করে দেন।

(৫) এটি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ, তিনি তোমাদের নিকট তা নাযিল করেছেন। যে কেউ আল্লাহ্ পাককে ভয় করে তিনি তার গুনাহ্ সমূহ মাফ করবেন, আর তাকে দান করবেন মহা পুরস্কার।

তফসীরুল কোরআন

রেজয়ী তালাক, তথা প্রত্যাহার যোগ্য তালাক দেয়ার পর যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় আসে তখন স্বামীকে দু'টি পথের যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়।

১. যথা নিয়মে তালাক প্রত্যাহার করে নিতান্ত ভদ্রভাবে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে, কোন প্রকার মন্দ কথা বলবে না।

২. অথবা যথারীতি তাকে পরিত্যাগ করবে। রাখা না রাখা উভয় অবস্থাই হতে হবে সুন্দর এবং শোভন। জাহেলিয়্যাতের যুগে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হ'ত। রাখার ইচ্ছা নেই, কিন্তু নির্যাতনের জন্যেই রেখে দেয়া হ'ত। পবিত্র কোরআন এসব কুপন্থা অবৈধ ঘোষণা করেছে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

অর্থাৎ কোন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে রাখা বা না রাখা তার স্বামীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করার অধিকার ইসলাম তাকে দেয় না; বরং নির্দেশ দেয় তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখলে ভদ্রভাবে রাখ। আর বিদায় করতে হলেও ভদ্রভাবে বিদায় কর। কোন অবস্থাতেই যেন স্ত্রীর প্রতি অবিচার না করা হয়, আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তার তাগিদ করা হয়েছে।

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে রাখা বা না রাখা উভয় সিদ্ধান্তের উপরই দু' জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ। যদি এ সম্পর্কে সাক্ষী না রাখা হয় তবে মানুষ ভুল ধারণা করবে এবং অপবাদ দেবে, আর সাক্ষীদের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর আদেশ পালনার্থে সত্য সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য প্রদানে ইতঃস্তত করবে না।

আবু দাউদ শরীফ ও এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এর পর সে রুজু করে তথা ঐ মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে। তালাকের সময়ও কোন সাক্ষী রাখেনি এবং রুজু করার সময়ও কোন সাক্ষী রাখেনি। তখন হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি সুন্নতের খেলাফ তালাক দিয়েছে এবং সুন্নতের খেলাফই রুজু করেছে।

হযরত আতা (রঃ) বর্ণনা করেন, তালাক দেয়া এবং রুজু করা, দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত বৈধ নয়। এটিই আল্লাহ্ পাকের ফরমান। তবে যদি এ সম্পর্কে কোন অসুবিধা থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতে, যদি ইদ্দত পার হওয়ার পর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, এমন অবস্থায় সাক্ষী রাখা ওয়াজিব, যেমন বিয়ের সময় সাক্ষী রাখা ওয়াজিব।[১]

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

আর আল্লাহ্ পাকের জন্যেই সাক্ষ্য প্রদান কর। অর্থাৎ কোন লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে নয় এবং কোন স্বার্থের খাতিরে নয়; বরং এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সাক্ষ্য প্রদান কর।

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

এর দ্বারা নসীহত করা হচ্ছে তাদেরকে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি, কেননা যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি শুধু তারাই উপদেশ মানে। কোরআনে করীমের বিধি-নিষেধের উপর তারাই আমল করে, তাই তাদের উদ্দেশ্যেই উপদেশ দেয়া হয়।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"যে কেউ আল্লাহ্ পাককে ভয় করে আল্লাহ্ পাক তার নাজাতের ব্যবস্থা করেন"।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারী জাতির প্রতি যে নির্যাতন করা হতো তা বিশ্ব মানবের ইতিহাসের এক কলংকময় অধ্যায়। ইসলাম এ কলংকের অন্ধকার দূরীভূত করেছে। মানবতার বিকাশ এবং উন্মেষ সাধন করেছে। জাহেলিয়্যাতের যুগের অন্যায় অনাচার দূরীভূত করেছে। এজন্যে আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাক বারে বারে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তাগিদ করেছেন।

বিপদ মুক্তির দোয়া

এবনে মরদবিয়া আবু সালেহ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হযরত আওফ এবনে মালেক আশযায়ী (রাঃ) হাযির হয়ে আরজ করলেন, আমার পুত্র সালেমকে দুশমনরা বন্দী করে রেখেছে। তার মাতা চরম অস্থির হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় আমাকে আপনি কি আদেশ করেন, আমি কি করবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে আদেশ প্রদান করি, তোমরা উভয়ে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৮৫

আলিয়্যিল আজীম" অধিক পরিমাণে পাঠ কর। একথা শ্রবণ করে আওফ (রাঃ)-এর স্ত্রী বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অত্যন্ত ভাল আদেশ দিয়েছেন। এরপর তাঁরা উভয়ে অধিক পরিমাণে দোয়াখানি পাঠ করতে লাগলেন। কিছুদিন পরই দেখা গেল, দুশমনরা তাঁর পুত্র সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে। তখন তাঁর পুত্র তাদের অনেকগুলো বকরী নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ঐ বকরীগুলোর সংখ্যা ছিল চার হাজার। তখন নাযিল হয়ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا............

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ পাক তার জন্যে পথ বের করে দেন। সম্পূর্ণ কল্পনাতীত উৎস থেকে তাকে রিযক প্রদান করেন।

সবর ও পরহেযগারীর সুফল

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদে সবর অবলম্বন করে, অধৈর্য হয়না এবং আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক স্বয়ং তার জন্যে বিপদমুক্তির পথ বের করে দেন এবং তার দারিদ্র্য দূর করে দেন এবং এমন উৎস থেকে তাকে রিয্ক দান করেন, যা থাকে তার জন্যে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উপকার লাভের জন্যে এবং বিপদ দূর করার জন্যে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) অধিক পরিমাণে লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম পাঠ করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু অধিক পরিমাণের সংখ্যা কত হওয়া উচিত? এর জবাবে তিনি বলেছেন, দৈনিক কমপক্ষে একশত বার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম পড়তে হবে এবং শুরু এবং শেষে একশত বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

তেবরানীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যাকে কোন নেয়ামত দান করেন, আর সে এ কামনা করে যে, ঐ নেয়ামত যেন স্থায়ী হয় তবে তার কর্তব্য হলো, অধিক পরিমাণে লা হাওলা. ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, এ দোয়াখানি জান্নাতের ভান্ডার থেকে উৎসারিত।

নেসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ নিরানব্বইটি রোগের মহৌষধ, তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম হলো দুশ্চিন্তা।

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামা (রঃ), শাবী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে অর্থাৎ সুন্নত মোতাবেক তালাক দেয়, আল্লাহ পাক তার জন্যে তালাক থেকে রুজু করার পথ বের করে দেন, অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি যে ঘৃণা রয়েছে তা দূর করে দেন এবং প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক ফিরিয়ে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مخرج শব্দটির অর্থ হলো, সে সব অসুবিধা থেকে বের হওয়ার পথ প্রশস্ত হওয়া, যা অন্যদের জন্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ।

তফসীরকার আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, مخرج কথাটির তাৎপর্য হলো সকল মুশকিল আসান হওয়া।

আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সকল বাধা-বিপত্তি দূর হওয়া।

তফসীরকারগণের অনেকে বলেছেন, এ আয়াতে শুধু মানুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যার সমাধানই নেই, বরং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বিপদ মুক্তির সন্ধান রয়েছে এ আয়াতে, আর তা হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা। পুরুষ হোক কী নারী সকলের জন্যেই এ বিধান কার্যকর। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি এমন একখানি আয়াত জানি, যদি লোকেরা তার উপর আমল করে, তবে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হাকেমের বর্ণনায় এতটুকু সংযোজিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়াতখানি বারবার পাঠ করতেন।[১]

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

এরপর এরশাদ করলেন, হে আবু জর! যদি সকল লোক এ আয়াত খানিই গ্রহণ করে, তবে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বার বার এ আয়াতের তেলাওয়াত করতে থাকেন, এমনকি আমার একটু তন্দ্রা আসতে লাগল, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে আবু জর! তখন তুমি কি করবে, যখন তোমাকে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেয়া হবে? তিনি জবাব দিলেন, আমি আরো প্রশস্ততা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৪৪-৪৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১৩৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫৭

এবং রহমতের দিকে চলে যাব, অর্থাৎ মক্কা শরীফ চলে যাব এবং সেখানকার কবুতর হয়ে থেকে যাব। এরপর তিনি এরশাদ করেন, তখন তুমি কি করবে, যখন তোমাকে মক্কা শরীফ থেকেও বের করে দেয়া হবে? আমি বললাম, সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে চলে যাব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি তখন কি করবে, যখন তোমাকে সিরিয়া থেকেও বের করে দেয়া হবে? আমি আরজ করলাম, শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, এমন অবস্থায় আমি তরবারি কাঁধে নিয়ে মোকাবেলা করবো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম পথ তোমাকে নির্দেশ করবো? আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! অবশ্যই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি শুনতে থাকবে এবং মানতে থাকবে, যদিও আবিসিনিয়ার গোলামীই হোক না কেন।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, কোরআনে করীমে একখানি আয়াত রয়েছে, যাতে সব কিছু একত্রে পাওয়া যায়, আর তা হলোঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ– الى اخره

আর সর্বাধিক প্রশস্ততার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাহলো

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এস্তেগফার করতে থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে সকল দুশ্চিন্তা থেকে নাজাত দেবেন এবং তার সকল দুঃখ দূর করে দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে তাকে রিয্ক পৌঁছাবেন। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দুনিয়া আখেরাত দু'জাহানের সকল কষ্ট, অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা থেকে আল্লাহ পাক তাকে নাজাত দান করবেন।

হযরত রবী (রাঃ) বলেছেন, মানুষের জন্যে যে কাজ কঠিন হবে, অধিক পরিমাণে এস্তেগফারকারীর জন্যে তা সহজ হবে।

আর হযরত কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে সকল সন্দেহজনক কাজ থেকে এবং মৃত্যুর কষ্ট থেকে নাজাত দেবেন।[১]

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

"আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবেন, আল্লাহ পাক বস্তু মাত্রের জন্যে পরিমাণ নিদৃষ্ট করে রেখেছেন"।

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখে, আল্লাহ পাক তার যাবতীয় কাজের জন্যে যথেষ্ট, তার সকল মুশকিল তিনি আসান করে দেন।

মসনদে আহমদে রয়েছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সওয়ারীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ পাক তোমাকে স্মরণ করবেন। তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমের হেফাজত কর, তাহলে তুমি আল্লাহ পাককে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন কিছু চাওয়ার হয়, তবে শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই চাও। যখন কখনো সাহায্য প্রার্থী হতে হয়, তবে শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই সাহায্য চাও। যদি সারা পৃথিবীর মানুষ তোমাকে উপকৃত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ পাকের মঞ্জুরী না হলে তারা তোমার সামান্যতম উপকারও করতে পারবেনা। এমনিভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ যদি তোমার ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়, তবু যদি তোমার তকদীরে ঐ ক্ষতি লিপিবদ্ধ না থাকে তবে তারা তোমার সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবেনা। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কালি শুকিয়ে গেছে।

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا

"আল্লাহ পাক বস্তু মাত্রের জন্যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তকদীরের আওতাধীন রয়েছে; যেমন তালাকের একটি সময় নির্ধরিত রয়েছে, তা হলো তোহর বা স্ত্রীর পবিত্রতার সময়, এমনিভাবে ইদ্দতের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, অর্থাৎ তিন ঋতু, তদ্রুপ স্বামীর মৃত্যুর হলে ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন।

অথবা এর অর্থ হলো, সুখ-দুঃখ, আল্লাহ পাক সুখ দুঃখের জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে একটি অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং অন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে অধৈর্য হলে কোন লাভ হবেনা, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সময় শেষ হলেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে।

আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার মসরুক (রঃ)।

وَالّٰٓـئِیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ
وَّالّٰٓـئِیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

'আর তোমাদের (তালাক প্রাপ্তা) স্ত্রীদের মধ্য থেকে যারা তাদের ঋতু সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর যাদের ঋতু এখনো হয়নি তাদেরও (অর্থাৎ যাদের ঋতুই হয়নি, তাদেরও তিন মাস)। আর যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তবে তাকে তালাক দেয়া হোক অথবা স্বামীর মৃত্যু হোক, উভয় অবস্থায় তাদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত'।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) তার তফসীরে লিখেছেন, হযরত খাল্লাদ এবনে আমর এবনে জমুহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে স্ত্রীলোকদের ইদ্দত কি হবে? যাদের ঋতু হয় না। তখন নাযিল হয়ঃ

وَالّٰٓئِىْ لَمْ يَحِضْنَ

অর্থাৎ যাদের ঋতু হয়না, অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে অথবা অধিক বয়স হওয়ার কারণে, তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।

উল্লেখ্য, তালাক যদি মাসের শুরুতে দেয়া হয় তবে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, ইদ্দতের হিসাব হবে চান্দ্র মাস থেকে, কিন্তু যদি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তালাক দেয়া হয় তবে মাসের হিসেবে নয়; বরং দিনের হিসেবে ইদ্দত শুমার করতে হবে, আর তালাক দেয়ার পর ৯০ দিন হলে ইদ্দত পূর্ণ হবে। এ মত হলো ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, প্রথম মাসের শুমার করা হবে দিনের হিসেবে অর্থাৎ ত্রিশ দিন শুমার করা হবে আর পরবর্তী দু' মাস হবে চান্দ্র মাসের হিসেবে, ত্রিশ দিন হোক কিংবা উনত্রিশ দিন।

এতদ্ব্যতীত একথাও প্রণিধানযোগ্য, ইদ্দতের যে মেয়াদ উল্লেখ করা হয়েছে, তা তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীদের জন্যে, বিধবারদের জন্যে নয়। বিধবা যদি অন্তসত্ত্বা না হয় তবে তার ইদ্দত হবে চার মাস দশ দিন।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ পাক তার কাজ সহজ করে দেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, তথা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে এবং এ অনুভূতি সর্বদা তার মনে জাগ্রত থাকে যে, অবশেষে একদিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমাকে হাযির করা হবে এবং আমার যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদেহী করতে হবে, তাহলে আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কাজ সহজ করে দেন এবং কল্যাণকর কাজের তৌফিক দান করেন।

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُۤ إِلَيْكُمْ

(এটি আল্লাহ পাকের নির্দেশ, তিনি তোমাদের নিকট তা নাযিল করেছেন।)

অতএব, আল্লাহ পাকের নির্দেশ তার যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে অবশ্যই পালন করতে হবে, আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন না করার অর্থ নিজেকে ধ্বংস করা, এজন্যে প্রয়োজন আল্লাহ পাকের ভয়, অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকলে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা থাকলে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন সহজ হয়, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাককে ভয় করার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ أَجْرًا

"আর যে আল্লাহ পাককে ভয় করে, তিনি তার গুণাহ সমূহ দূরীভূত করেন, আর তাকে দান করেন বিরাট পুরস্কার"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় পোষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা তাকওয়া পরহেযগারীর গুণ অর্জন করবে। তাদের মুশকিল আসান করা হবে, তাদের গুণাহ মাফ করা হবে এবং তাদেরকে কল্যাণকর কাজের তওফিক দান করা হবে।

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ أُخْرٰى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿٧﴾

তরজমা

(৬) তোমরা যেখানে বাস কর, তোমাদের স্ত্রীদেরকেও সেখানেই বাস করতে দাও। তাদেরকে জীবন যাত্রা সংকীর্ণ করার উদ্দেশ্যে কষ্ট দিওনা। তারা যদি গর্ভবতী

হয়, তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করায় তবে তাদেরকে এর বিনিময় দান কর। সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। আর যদি পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তবে অন্য কোন স্ত্রীলোক সন্তানকে স্তন্য দান করবে। বিত্তবান লোকেরা নিজেদের সামর্থ মোতাবেক ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত, সে আল্লাহ পাক তাকে যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ পাক যাকে যতটুকু শক্তি প্রদান করেছেন, তার চেয়ে অধিক গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক কষ্টের পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেবেন।(৭)

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এমনকি যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তালাকের মাধ্যমে বিনষ্টও হয়ে যায়, তবু এ দায়িত্ব শেষ হয়না, বরং স্ত্রীর ইদ্দতকালীন অবস্থান এবং খোর-পোষের দায়িত্ব স্বামীকেই পালন করতে হবে। ইজ্জত-সম্মানের সঙ্গে তার অবস্থান করার সঠিক ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। শরীয়তের পরিভাষায় এ ব্যবস্থাকে "নফকা" এবং "ছোকনা" বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর খোর-পোষ ও গৃহের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্যে ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

"তোমরা যেখানে বাস কর, তোমাদের স্ত্রীদেরকেও সেখানেই বসবাস করতে দাও"।

অর্থাৎ ইদ্দতকালীন সময়ে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা স্বামীর একান্ত করণীয় কাজ, আর তা হতে হবে তোমাদের সাধ্য মোতাবেক।

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"তাদেরকে জীবন যাত্রা সংকীর্ণ করার উদ্দেশ্যে কষ্ট দিওনা"।

কষ্ট দেয়ার একটি পন্থা হলো তাকে এমন স্থানে থাকতে বাধ্য করা, যা তার জন্যে সমীচিন নয়।

وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"আর তারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে যে পর্যন্ত না সন্তান প্রসব করেছে, সে পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন কর"।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হোক বা না হোক, তার ইদ্দতকালীন ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর কর্তব্য। এর প্রমাণ হলো আলোচ্য আয়াত, কেননা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাদের সাধ্য মোতাবেক তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের ব্যাপারে ব্যয় কর। হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেছিলেন, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

"তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বহিস্কার করোনা, আর তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়"।

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ

সন্তান প্রসবের পর অথবা ইদ্দত শুমার করার পর স্বামীর অনুরোধে যদি স্ত্রী সন্তানকে স্তন্য পান করায়, তবে অন্য কোন স্তন্যদায়িনীকে এ কাজের যে পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো, তা সন্তানের মাকেও আদায় করা স্বামীর একান্ত কর্তব্য। অবশ্য এ সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তথা পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণ করা একান্ত করণীয়, যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ

সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে সংযতভাবে পরামর্শ করবে এবং এ পর্যায়ে একে অন্যের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হবেনা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের তরজমা করেছেন এভাবেঃ তোমরা পরস্পর পরামর্শ করে লও।

মোকাতেল (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের তরজমা করেছেনঃ সন্তানকে স্তন্য দানের পারিশ্রমিক সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে পরামর্শ কর এবং উভয়ের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

ইমাম বয়যাভী (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের ব্যাখ্যা করেছেনঃ সন্তানকে স্তন্য পানের ব্যাপারে এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ সম্পর্কে উত্তম আচরণের পরামর্শ দাও। এমন যেন না হয়, সন্তান-জননী পারিশ্রমিকের পরিমাণ বাড়াতে থাক, আর সন্তানের পিতা তা আদায়ে অক্ষম হয়, আবার এমনও যেন না হয়, সন্তানের পিতা এত কম পারিশ্রমিক দেয়, যা দ্বারা সন্তান-জননীর জীবন যাপন করা সম্ভব না হয়।

হাকীমুল উম্মত মওলানা থানভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কর্তব্য হলো এই যে, নিজেও যেন কষ্টে না পড়ে এবং অন্যকেও যেন কষ্ট না দেয়।

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى

আর যদি পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তবে অন্য কোন স্ত্রীলোক সন্তানকে স্তন্য দান করবে।

অর্থাৎ সন্তানের ব্যাপারে উভয় পক্ষ যদি কোন সমঝোতায় না আসে; বরং পরস্পর জেদ চরিতার্থের ভাব থাকে, তবে স্ত্রী যেন একথা স্মরণ রাখে যে, অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারাও এ কাজ করানো যেতে পারে। সন্তানের স্তন্য পান তার উপরই নির্ভরশীল নয়। আর স্বামীরও মনে রাখা উচিত যে, সন্তানকে স্তন্য দানের ব্যাপারে তার বিশেষ কোন লাভ নেই, কেননা এক্ষেত্রে অন্য স্ত্রীলোক নিয়োগ করলে তাকে অবশ্যই পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে, অতএব সন্তান-জননীকে বাদ দেয়ার কোন যুক্তি নেই। যদি সন্তান-জননী কোন যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসতে প্রস্তুত না হয়, তবে অন্য স্তন্যদায়িনীর ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

উল্লেখ্য, যদি মায়ের পক্ষে সন্তানকে স্তন্য দান করা কঠিন হয়, আর সে স্তন্য দানে অস্বীকৃতি জানায়, তবে এক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা যাবেনা।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ

"বিত্তবান লোকেরা নিজেদের সামর্থ মোতাবেক ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত, সে আল্লাহ পাক তাকে যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে"।

মূলতঃ সন্তানের লালন-পালনের ব্যয়ভার বহন করা নিঃসন্দেহে পিতার পবিত্র দায়িত্ব, তবে এক্ষেত্রে যা সর্বাধিক বিবেচ্য তাহলো পিতার আর্থিক সঙ্গতি, পিতা যদি অবস্থাসম্পন্ন হয়, তবে সেভাবেই সন্তানের ব্যয়ভার বহন করবে।

পক্ষান্তরে, যদি পিতার আয় রোজগার হয় সীমিত, তবে সে সঙ্গতি অনুযায়ীই সন্তানের লালন-পালনের ব্যয় ভার বহন করবে। সন্তানের মাতা যদি স্তন্য দানের জন্যে সে পরিমাণই দাবী করে যা অন্য স্তন্যদায়ীনিও করে, তবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একমত মাকে বাদ দিয়ে অন্যের দ্বারা স্তন্য দান করানো বৈধ নয়।

এ পর্যায়ে মোয়াত্তা ইমাম মালেকে (রঃ) উল্লেখিত ঘটনার বিবরণ দেয়া যেতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাঁর ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন আসেম এবনে ওমর। কিছু দিন পর হযরত ওমর (রাঃ) ঐ মহিলাকে তালাক দেন। একবার হযরত ওমর (রাঃ) কোবার দিকে অশ্বে আরোহন করে গমন করছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর সন্তান আসেম মসজিদের সামনে খেলা-ধূলা করছে। তখন তিনি তাঁর অশ্বে তাকে আরোহণ করিয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন। আসেমের নানী বাধা দিলেন। অবশেষে উভয়ে খলীফা হযরত আবুবকর

(রাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, শিশুটিকে তার মায়ের নিকট দিয়ে দাও। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

এবনে আবি শায়বার বর্ণনা হলো, হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, সন্তানের উপর মায়ের হাত বুলিয়ে দেয়া এবং সন্তানকে তার কোলে নেয়া এবং মায়ের সুগন্ধ শিশুর জন্যে তোমার চেয়ে উত্তম। তবে এ শিশু যখন যৌবন লাভ করবে, তখন তার অধিকার থাকবে, মাতা-পিতা কার নিকট সে অবস্থান করবে।

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত কালীন ব্যয় কত হবে? শরীয়ত তা নির্ধারণ করেনি; বরং এটি ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালেক, (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়েই অবস্থাপন্ন হয়, সে হিসেবেই খোর-পোষের ব্যয়ভার নির্ধারিত হবে, আর যদি তারা উভয়েই দারিদ্র-পীড়িত হয় তবে যত কমে জীবন যাপন সম্ভব, তাই নির্ধারিত হবে। যদি স্ত্রী দরিদ্র হয় আর স্বামী হয় সঙ্গতি-সম্পন্ন, তবে ইদ্দতকালীন ব্যয় অধিক পরিমাণে নির্ধারিত হবে, পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী হয় অবস্থাপন্ন এবং স্বামী দরিদ্র হয়, তবে স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ীই তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর খোর-পোষের ব্যয় নির্ধারিত হবে, কেননা পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا

"আল্লাহ পাক যাকে যতখানি শক্তি দান করেছেন, তার চেয়ে অধিক গুরুভার তিনি তার উপর চাপিয়ে দেন না"।

এজন্যে ইদ্দতকালীন ব্যয় নির্ধারণে স্বামীর অবস্থা বিবেচনায় রাখা একান্ত জরুরী।

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

"অচিরেই আল্লাহ পাক কষ্টের পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন"।

অতএব, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কারো জন্যেই উচিত নয়। আল্লাহ পাক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। এ আশা পোষণ করা একান্ত জরুরী, এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য, স্বামী বা স্ত্রী কাউকেই কোন প্রকার সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়া উচিত নয়। তালাককে শরীয়তের পরিভাষায় 'আবগাজুল মুবাহাত' বা সবচেয়ে অপ্রিয় বৈধ কাজ বলা হয়, শরীয়ত এর অনুমতি দিয়েছে কিন্তু এর মাধ্যমে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার অনুমতি দেয়নি, এমনিভাবে স্ত্রীর খোর-পোষের ব্যাপারে স্বামীকে তাঁর সাধ্যাতীত পরিমাণ ব্যয় করার জন্যে বাধ্য করার অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধান মানুষের কল্যাণার্থেই প্রবর্তন করা হয়েছে। অকল্যাণকর কোন কিছুই শরীয়তের বিধানে নেই। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এবং বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামী শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, তাই শরীয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমগ্র মানব জাতির শান্তি এবং কল্যাণ।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ
رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا (٨)
فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا (٩) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ
اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ
لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا (١١) اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢) ع

তরজমা

(৮) আর কত জনপদ তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রসূলগণের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল দম্ভভরে, পরিণামে আমি কঠিনভাবে তাদের হিসাব গ্রহণ করি, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।

(৯) এরপর তারা তাদের কর্মফল ভোগ করে। আর তাদের কর্মের পরিণাম হয় সর্বনাশা।

(১০) আল্লাহ পাক তাদের জন্যে কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা যারা ঈমান রাখ আল্লাহকে ভয় করে চল, নিশ্চয় আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি উপদেশ।

(১১) (আল্লাহ পাক) এমন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, তাদেরকে (গোমরাহীর) অন্ধকার থেকে (হেদায়েতের) আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্যে। আর যে কেউ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, আল্লাহ পাক তাকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত। তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। আল্লাহ পাক তাকে অতি উত্তম জীবিকা দান করবেন।

(১২) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তম আসমান এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবীও। তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম অবতীর্ণ হয়ে থাকে, যাতে করে তোমরা উত্তমভাবে জানতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুকে তাঁর এল্‌ম দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মানুষের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যায়ে সুবিচার কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুবিচারের ভিত্তি হলো আল্লাহ পাকের ভয়, অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকলেই সুবিচার কায়েম করা সম্ভব হয়, এজন্যেই বারে বারে আল্লাহ পাককে ভয় করার, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার তাগিদ করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় শরীয়তের বিধান পালনের তাগিদ করা হয়েছে।

বিশেষতঃ তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের উপকারীতার কথা বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছে, পরহেজগারী অবলম্বন করলে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বিপদাপদ দূর করে দেন।

দ্বিতীয়তঃ কল্পনাতীত স্থান থেকে আল্লাহ পাক পরহেযগার ব্যক্তির রিয্‌কের ব্যবস্থা করে দেন। এমন ব্যক্তির সকল কাজ সহজ করে দেয়া হয়। তার গুনাহ সমূহ মাফ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করার পরিণতি স্বরূপ ধ্বংস হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের উল্লেখ করেছেন।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে বহু জাতি আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করেছে, তাঁর বিধান পালনে গাফলত করেছে, তাঁকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর নাফরমানী করেছে অথচ আল্লাহ পাকের নাফরমানী করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا

"আর কত জনপদ তাদের প্রতিপালক এবং তাঁর রসূলগণের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল, পরিণামে আমি তাদের হিসাব নেই কঠোরভাবে এবং তাদের উপর আযাব নাযিল করি"।

যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর বিধি-নিষেধ লংঘন করে, তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অবকাশ দেয়া হয় যেন তারা আত্ম সংশোধন করতে পারে, কিন্তু ঐ অবকাশের কারণে তাদের গাফলত, অহংকার, পাপাচার, অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন হঠাৎ ঐ নাফরমান জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আযাব আপতিত হয় যেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকান্ড, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا এর ব্যাখ্যা করেছেন, তারা আল্লাহ পাকের বিধান থেকে বিমুখ হয়েছে।

মোকাতেল (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, তারা আল্লাহ পাকের বিধানের বিরোধিতা করেছে, তাই আমি তাদের কঠিন হিসাব নিয়েছি।

আর কালবী (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, তাদের অন্যায় অনাচারর কারণে আমি তাদেরকে দুনিয়াতে আযাব দিয়েছি এবং আখেরাতে তাদের কঠিন হিসাব করার ব্যবস্থা রেখেছি। তাদের এ অন্যায় অনাচারের ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ তাদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত সর্বনাশা।[১]

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা! তোমরা যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করে চল, এটিই ঈমানের দাবী, এটিই জীবন-সাধনার সাফল্য লাভের চাবিকাঠি, আর এতেই রয়েছে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا

নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে উপদেশ তথা পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, জিকর দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তিনি সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকর এবং কোরআনে করীমের তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৩৮

অথবা এজন্যে যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ সাহাবায়ে কেরামের নিকট পবিত্র কোরআন পৌঁছানোর কাজে মশগুল থাকতেন।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

আয়াতের رَسُوْلًا শব্দটির পূর্বে اَرْسَلَ শব্দটি উহ্য রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে, মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্যে, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদের নিকট কোরআনে করীমের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করছেন এবং তোমাদেরকে কুফরী এবং নাফরমানী ও গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর জগতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

আর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, অর্থাৎ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে ঈমানের আলো গ্রহণ করে এবং ঈমানের আলোতে থেকে নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হচ্ছে, তারা চিরদিন সে জান্নাতে থাকবে।

قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

"আল্লাহ পাক তাকে অতি উত্তম জীবিকা দান করেছেন"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের 'রিযকে হাসান' বলে এর দ্বারা জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা জান্নাতবাসীগণ চিরদিন ভোগ করবে। যা কখনো শেষ হবেনা।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আল্লাহ পাক তিনিই, যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন, আর সমান সংখ্যক যমীনও তৈরী করে রেখেছেন। তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম নাযিল হতে থাকে। যাতে করে তোমরা ভালভাবে এ সত্য জেনে নাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আর একথাও জেনে নাও যে, আল্লাহ পাকের এলম সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। সবই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নেই।

আল্লাহ পাক সাতটি আসমানের ন্যায় সাতটি যমীনও তৈরী করে রেখেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় আকাশে মেঘ দেখা গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, এটি কি? তাঁরা আরজ করলেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ হলেন, এটি হলো মেঘ, যমীনে যেমন পানি বহনকারী উষ্ট্র থাকে (এটি তেমনি)। যাকে আল্লাহ পাক এমন লোকদের নিকট প্রেরণ করছেন যারা কৃতজ্ঞ নয় আর আল্লাহ পাকের নিকট তারা দোয়াও করেনা, এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান, তোমাদের উপর এটি কি রয়েছে? তাঁরা আরজ করেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি এরশাদ করেন, এটি একটি উঁচু ছাদ, যা (ভেঙ্গে পড়া থেকে) সংরক্ষিত হয়েছে।

তোমরা কি জান, তোমাদের এবং এই ছাদের মধ্যে দূরত্ব কতখানি রয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, তোমাদের এবং এই ছাদের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান, এর উপর কি রয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, এর উপর আরেকটি আসমান রয়েছে আর দু' আসমানের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে। এরপর তিনি সাত আসমান পর্যন্ত গণনা করে এরশাদ করেন, প্রত্যেক দু' আসমানের মধ্যে এতখানি দূরত্ব রয়েছে, যতখানি দূরত্ব যমীন ও আসমানের মধ্যে রয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান এর উপর কি রয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, এর উপর আরশ রয়েছে। আর সপ্তম আসমান থেকে আরশ পর্যন্ত দূরত্ব এতখানি, যতখানি দূরত্ব রয়েছে দু' আসমানের মধ্যে। এরপর তিনি এরশাদ করেন, তোমরা কি জান, তোমাদের নীচে কি রয়েছে? তাঁরা আরজ করলেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তোমাদের নীচে যমীন

রয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান এর নীচে কি রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, এর নীচে আরো একটি যমীন রয়েছে। আর উভয় যমীনের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাতটি যমীন গণনা করলেন এবং প্রত্যেক দু' যমীনের মধ্যে পাচশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে একথাও এরশাদ করলেন। এরপর এরশাদ করলেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর মুঠোয় রয়েছে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রাণ, যদি তোমরা কোন রশি সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখ, তবে তা আল্লাহ পাকের কুদরতে সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

(তিরমিজী)

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا

"আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম নাযিল হতে থাকে"।

অর্থাৎ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখন যা প্রয়োজন, সে অনুযায়ী আসমান যমীন সমূহে ফরমান জারী হতে থাকে, এতে রয়েছে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন, মানুষ যেন আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং তাঁর অসীম জ্ঞান-মহিমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারে, তার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১৪৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৬৭-৬৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাহরীম

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ

اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ② وَاِذْ اَسَرَّ

النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ

اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ

قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ③

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) হে নবী! আল্লাহ পাক আপনার জন্যে যা হালাল করে রেখেছেন, আপনি কেন তা হারাম করছেন? তবে কি আপনি নিজের স্ত্রীদের মন রক্ষার্থে তা করছেন? আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(২) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের শপথ ভেঙ্গে ফেলা নির্ধারিত করে রেখেছেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের মালিক এবং তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(৩) আর স্মরণ কর সে সময়কে, যখন নবী তাঁর কোন স্ত্রীকে একটি কথা গোপনে বলেন, এরপর সে তা অন্যকে বলে দেয়, আর আল্লাহ পাক নবীকে তা জানিয়ে দেন, তখন নবী এ সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করলেন, আর কিছু অব্যক্ত রাখলেন, যখন নবী তার সেই স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, তখন সে বললো, কে আপনাকে তা অবহিত করলো? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি সব বিষয় সম্পর্কে অবগত।

সূরা তাহরীম প্রসঙ্গেঃ

এ সূরা মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ, ২ রুকু এবং বার আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ৩৪৯টি বাক্য ও ১,০৬০টি অক্ষর রয়েছে।

এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।

এ সূরার আমল

সূরা তাহরীম পাঠ করে রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম করলে সে সুস্থ হয়। যদি কারো অনিদ্রার কষ্ট হয় তবে এ সূরা পাঠ করলে নিদ্রা আসে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করলে তার ঋণ আদায় হয়ে যায়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা তাহরীম পাঠ করছে, সে হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সূরাতেও বিশেষতঃ নারী জাতি সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি কীভাবে অর্জিত হয় তার পথ-নির্দেশ রয়েছে এ সূরায়। এ পর্যায়ে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, ন্যায় বিচার, পরস্পরের হক্ব আদায়ের প্রেরণা একান্ত অনুসরণীয় মূলনীতি।

মূল বক্তব্য

এ সূরার শুরুতেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বিখ্যাত ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তিনি নিজের জন্যে বিশেষ কারণবশতঃ মধু পান করা নিষিদ্ধ করেছিলেন, এ সূরায় তার উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক জীবনের কোন কোন রহস্য প্রকাশ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে, এ বিষয়েও এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ কখনো এমন হয় যে, স্ত্রীলোকগণ তাদের বিশেষ মেজাজের কারণে কষ্টের কারণ হয়ে যায়। এমন সময় ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। এক্ষেত্রে সবরের ফলশ্রুতি স্বরূপ সবরকারী আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়।

সূরার পরিসমাপ্তিতে একথা এরশাদ হয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্য করা যায় যে, নেককার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও বদকার স্ত্রী তার জীবনের সাথী হয়ে যায়, আর কখনো বদকার স্বামীর জীবনে এসে যায় নেককার স্ত্রী। এসব ক্ষেত্রে ঈমান ও তাকওয়ার উপর সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র কোরআন। বিশ্ব মানবের সম্মুখে পবিত্র কোরআন এ সত্য তুলে ধরেছে যে, এমনি ঘটনা নতুন কিছু নয়; হযরত লূত (আঃ)-কে এমনি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে, আর হযরত আছিয়া কুখ্যাত, জালেম ফেরাউনের স্ত্রী হিসেবে নির্যাতিত অবস্থায় যে সবর এবং ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে এক মহান শিক্ষা, যুগ যুগ ধরে যা অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“হে নবী! আল্লাহ পাক আপনার জন্যে যা হালাল করে রেখেছেন, আপনি কেন তা হারাম করেছেন, তবে কি আপনি নিজের স্ত্রীদের মন রক্ষার্থে তা করেছেন, আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান”।

শানে নুযুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আতা (রঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। ওবায়েদ এবনে ওমায়ের বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মুল মোমেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের (রাঃ) গৃহে মধুর সরবত পান করতেন। আমি এবং উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের কারো নিকট তশরীফ আনবেন তখন তিনি বলবেন, আমি আপনার নিকট মগাফিরের (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত আঠা) দুর্গন্ধ পাচ্ছি। যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের একজনের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মগাফিরের গন্ধ অনুভব করছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমিতো যয়নব বিনতে জাহাশের নিকট মধুর সরবত পান করেছিলাম, এরপর তা আর পান করবো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৭০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা- ১৪৮

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ

"হে নবী! আপনি কেন এমন জিনিস হারাম করছেন? যা আল্লাহ্ পাক আপনার জন্যে হালাল করেছেন"।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অধিকতর ভালবাসা এবং সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় উম্মাহাতুল মোমেনীনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অস্বাভাবিক ছিলনা, আর এ প্রতিযোগিতার পরিণতিতে পরস্পরের মধ্যে একটু রেষারেষি হওয়াও অসম্ভব নয়, তাই এমনি ঘটনার অবতারণা হয়েছে।

যেহেতু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছরের নামাজের পর প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের নিকট তশরীফ নিয়ে যেতেন, আর এ সুযোগে হযরত যয়নব (রাঃ) মধুর শরবত পান করাতেন, তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সেখান থেকে বের হতে একটু বিলম্ব হতো। এজন্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ) এ পরামর্শ করেন, যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিরক্ত হয়ে মধু পান পরিত্যাগ করেন। একথা শ্রবণ করে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর মনে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, কথাটি গোপন রাখবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রাঃ) সম্পর্কেও একটি কথা গোপন রাখার জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ)-এর মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘণিষ্ঠ, তাই হযরত হাফসা (রাঃ) তা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক সমস্ত ঘটনা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন।

এসব কারণে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হন, আর এ কারণেই তিনি এক মাসের "ঈলা" করেন, অর্থাৎ এক মাসের জন্যে স্ত্রী সংস্রব ত্যাগের উদ্দেশ্যে তাঁদের থেকে দূরে থাকেন। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

কোন একটি হালাল বস্তুর হালাল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাকে নিজের জন্যে হারাম করা তথা তা ব্যবহার না করার এবং তা চির পরিত্যাগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে আলোচ্য আয়াতে হালালকে "হারাম করা" বলা হয়েছে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এ ঘটনা হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গৃহে মধুর শরবত পানেরই হোক অথবা হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রাঃ) সম্পর্কেই হোক না কেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক

সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান, অর্থাৎ আপনার দ্বারা এক্ষেত্রে যে ত্রুটি হয়েছে, আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি নিজের উপর তা হারাম করে নিয়েছেন, এজন্যে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, কেননা আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের শপথ ভেঙ্গে ফেলা নির্ধারিত করে রেখেছেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের মালিক এবং তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়"।

আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, এর একটি প্রমাণ এই যে, ঘটনাক্রমে যদি কেউ কোন বৈধ বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেয় বা অন্যায় শপথ করে বসে, যেমন "আমি অমুক বস্তুটি আর খাবোনা", অথবা বলে, "ঐ বস্তুটি আমার জন্যে হারাম" আর তা প্রকৃতপক্ষে হালাল, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক কাফ্ফারা দান করে এমন শপথ ভেঙ্গে ফেলার বিধান দিয়েছেন। এটি বন্দাগণের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা তিনিই তোমাদের মালিক।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, "মধু আর পান করবোনা"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি এরশাদ করেছিলেন, "মারিয়া আমার জন্যে হারাম"।

এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আল্লাহ পাক আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি শপথের মাধ্যমে তাকে হারাম কেন করলেন? এ আয়াত নাযিল হবার পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই শপথের কাফ্ফারা হিসেবে একটি গোলাম আজাদ করেন এবং শপথ ভঙ্গ করেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ শপথ ভঙ্গ করার জন্যে কাফ্ফারা আদায় করেছেন।

কিন্তু হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কাফ্ফারা আদায় করেননি, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। এ ঘটনা সম্পর্কীয় বিবরণ দানের পর সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যদি এতে কোন প্রকার গুনাহ্ হয়েও থাকে, তবে আল্লাহ্ পাক তা মাফ করে দিয়েছেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) "দুররে মানসুরে", আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) "তফসীরে মাজহারী"তে লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কাফ্ফারা ফরজ ছিল, তাই তিনি তা আদায় করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হলোঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মা'সুম বা নিঃস্পাপ ছিলেন, তাঁর কোন গুনাহ ছিলনা, এতদসত্ত্বেও নামাযে ভুল হলে তাঁর প্রতিও সেজদায়ে সহু ওয়াজিব ছিল। তাই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এ পর্যায়ের সব কিছু মাফ করা সত্বেও কাফ্ফারা ওয়াজিব ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মত পোষণ করেছেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে, "এ খাদ্য আমার উপর আমি হারাম করে নিলাম"। তবে ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, এটি শপথ হয়ে যাবে, যদিও শপথের শব্দ এতে নেই।

হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এ মত পোষণ করতেন।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَاط قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ

"আর স্মরণ কর সে সময়কে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে একটি কথা গোপনে বলেন, এরপর সে স্ত্রী তা অন্যকে বলে এবং আল্লাহ্ পাক তা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করলেন, আর কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তাঁর সেই স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, তখন সে বললো, কে আপনাকে তা অবহিত করলো? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি সব বিষয় সম্পর্কে অবগত"।

মানুষ কখনো কোন বিষয়কে গোপন রাখতে সচেষ্ট হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গোপন থাকেনা, আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে তিনি যথা সময়ে তা প্রকাশ করে দেন। আলোচ্য আয়াতে এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি আর মধু পান করবোনা, তবে বিষয়টি তুমি প্রকাশ করোনা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি মারিয়ার নিকট আর যাতায়াত করবোনা"। একথাটি তুমি গোপন রাখবে। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে তা বলে দিয়েছেন। যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করলো? তিনি বললেন, স্বয়ং আল্লাহ পাক, যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি সব কিছু জানেন, তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে একথা বলা হয়েছে, তিনি কিছু কথা ব্যক্ত করেছেন, কিছু কথা অব্যক্ত রেখেছেন, যে কথা অব্যক্ত রেখেছেন তা কি? এ প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে বলা অত্যন্ত কঠিন তবে কোন কোন তফসীরকারের মতে, তা হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই হবেন খলীফা। এটিই ছিল অব্যক্ত কথা।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বর্ণনা হলো, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসাকে (রাঃ) খেলাফত সম্পর্কে বলেছিলেন তবে এও বলেছিলেন, বিষয়টি গোপন রাখ।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেছেন, আমার পর খলীফা হবে তোমার পিতা এবং আয়েশার (রাঃ) পিতা।

ওয়াহেদী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার কথা কোরআনে করীমেই রয়েছে, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসাকে (রাঃ) বলেছিলেন, আমার পর তোমার পিতা এবং আয়েশার পিতা লোকদের আমীর হবে। কথাটি গোপন রেখো।

মায়মুন এবনে মেহরান বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গোপনে বলেছিলেন, আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আবুবকর (রাঃ)। কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) একথাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

যেহেতু হযরত হাফসা (রাঃ) একটি গোপন কথা প্রকাশ করে দেন, এর শাস্তি স্বরূপ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) একথা শ্রবণ করে বলেছিলেন, যদি খাত্তাবের বংশে কোন কল্যাণ থাকত, তবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাকে তালাক দিতেন না। তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) এসে আল্লাহ পাকের

হুকুম পৌঁছে দিলেনঃ "(হযরত) হাফসা (রাঃ)-কে স্ত্রী হিসেবে রাখুন, তালাক থেকে রুজু করুন, কেননা সে অনেক রোযা রাখে এবং সারা রাত নামায আদায় করে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) মোকাতেল এবনে হাব্বানের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসাকে (রাঃ) তালাক দেননি, দেয়ার ইচ্ছা করেছেন, এ সময় জিব্রাঈল (আঃ) এসে তালাক না দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) একথাও বলেছেন যে, হযরত হাফসা (রাঃ) অত্যন্ত এবাদত গুজার, অনেক রোযা রাখেন, অনেক নামায আদায় করেন, তিনি জান্নাতে আপনার স্ত্রীদের অন্তুর্ভুক্ত হবেন।

إِن تَتُوبَا
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ
ظَهِيرٌ ④ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا
مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ
ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑥

তরজমা

(৪) যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ পাকের নিকট তওবা কর, তবে (তা উত্তম) কেননা তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ পাকই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও নেককার মোমেনগণ তাঁর সহায় রয়েছে। উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতাগণও রয়েছে তাঁর সাহায্যকারী।

(৫) যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক তোমাদের স্থলে তোমাদের চেয়ে অতি উত্তম পত্নীগণকে দান করবেন, যারা হবে

আত্মসমর্পণকারিনী, বিশ্বাসী, পূর্ণ অনুগত, তওবাকারিনী, এবাদতকারিনী, রোজা পালনকারিনী, অকুমারী এবং কুমারী।

(৬) হে মোমেনগণ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনবর্গকে অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর সমূহ, যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ পাকের আদেশ সমূহ। আর তাদেরকে যে নির্দেশই প্রদান করা হয়, তা তারা পালন করে থাকে।

তফসীরুল কোরআন

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ

"যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ পাকের নিকট তওবা কর"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করেই এ নির্দেশ।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বোখারী শরীফে সংকলিত, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ)-এর আচরণে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা উভয়ে যদি তওবা কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম। আর যত শীঘ্র তওবা করবে ততই হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গল।

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا

কেননা তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে গেছে, সঠিক পথ থেকে সরে গেছে, তোমরা এমন কথা পছন্দ করেছ, যা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপছন্দনীয় ছিল। তিনি মধু পান অপছন্দ করতেন না, মারিয়া কিবতীয়াকেও নিজের জন্যে হারাম করা পছন্দ করতেন না এবং যে রহস্য তোমরা উদ্‌ঘাটন করেছে, তা প্রকাশ পাওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না, কিন্তু তোমাদের কারণেই এসব কাজ হয়েছে অথচ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা পছন্দ করেন, তা পছন্দ করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। আর যা তিনি অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ করাও প্রত্যেকের একান্ত করণীয়। যেহেতু অন্তর অন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে তাই নিঃসন্দেহে গুনাহ হয়েছে, আর গুনাহর পর তওবা অবশ্য কর্তব্য।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ অনেক দিন থেকে আমার এ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি

হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি, এ আয়াতে যে দু'জন উম্মুল মোমেনীনের কথা বলা হয়েছে, তারা কোন্ দু'জন? একবার হজ্জের সফরে আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক সুযোগ আমি বলেছিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন্ দু'জন স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, একজন আনসারী সাহাবীর সঙ্গে আমার এ সমঝোতা ছিল, একদিন আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হবো এবং যা সেখানে শ্রবণ করি তা তাঁকে শুনিয়ে দেব, আর একদিন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হবেন এবং যা শুনবেন তা তিনি আমাকে শোনাবেন।

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, কোরায়শ গোত্রের লোকদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের অনুগত থাকতো কিন্তু মদীনা শরীফ এসে দেখি, এখানকার স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের কথার জবাব দেয়। আমাদের স্ত্রীরাও মদীনাবাসী স্ত্রীদের থেকে এসব শিখতে থাকল। ঘটনাক্রমে আমি একদিন আমার স্ত্রীকে চড়া স্বরে কিছু বললাম, সে-ও অনুরূপ চড়া স্বরে আমাকে জবাব দিল, যা আমার নিকট অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হলো।

তখন সে আমাকে বললো, আমার জবাব আপনার নিকট অপছন্দনীয় হয়েছে? অথচ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একথা শুনে রীতিমত ভীত হলাম এবং বললাম, যে এমন আচরণ করবে তার জীবন ব্যর্থ হবে, সে হবে বিপদগ্রস্ত। এরপর আমি আমার কন্যা হাফসার (রাঃ) নিকট গমন করলাম এবং এসব বিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। হাফসা (রাঃ) বললোঃ হ্যাঁ। আমি বললাম, এতে রয়েছে তোমার ধ্বংস, তোমাদের ভয় হয়না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণে স্বয়ং আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে যখন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করতে থাকেন এবং মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁদের দৈনন্দিন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করার কথা বলেন। এতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে অবগত হয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) নিজ নিজ কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ)-কে সতর্ক করেন।

যাহোক, পূর্বের ঘটনায় হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বললেন, খবরদার! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক ভাতা চাইবে না, কোন বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার পৃষ্ঠে কথা বলবে না, আর কখনও তাঁর সাথে কথা বন্ধ রাখবে না, আর তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তুমি আমার নিকট চেয়ে নেবে। আর তোমার এ সম্পর্কে কোন ঈর্ষা হওয়া উচিত নয় যে, তোমার প্রতিবেশী তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে, আর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অধিকতর প্রিয়, অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তখন এমন সময় ছিল, আমরা আলাপ করতাম সিরিয়ার গাছ্ছানী সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। একদিন আমার সেই আনসারী বন্ধু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং এশার নামাযের সময় আমার নিকট আসেন এবং সজোরে দরজায় করাঘাত করতে থাকেন আর জিজ্ঞাসা করেন, ওমর (রাঃ) কি ঘরে আছেন? আমি অতি সত্ত্বর ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম। আনসারী ব্যক্তি বললেন, আজ এক বিরাট দূর্ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, কি হয়েছে, সিরিয়ার রাজা চলে এসেছে? সে বললো, না তার চেয়েও বড় দূর্ঘটনা ঘটেছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসা (রাঃ) ব্যর্থ হয়েছে, পূর্ব থেকে আমার এ আশংকা ছিল। এরপর আমি ফজরের নামাজ আদায় করলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে। নামাযের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সকলের থেকে একাকী রয়ে গেলেন। এরপর আমি হাফসার (রাঃ) নিকট গমণ করলাম। সে কাঁদছিল। আমি বললাম, এখন কেন কাঁদছ? আমি কি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে সতর্ক করিনি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? হাফসা (রাঃ) বললো, আমি তা জানিনা, কি হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলের থেকে পৃথক হয়ে একা থাকছেন। আমি তখন হাফসার (রাঃ) নিকট থেকে বের হয়ে মিম্বরের নিকট পৌঁছলাম। সেখানে কিছু লোক কাঁদছিলেন। আমি তাঁদের নিকট পৌঁছলাম কিন্তু মনের মধ্যে যে ব্যথা ও অস্থিরতা ছিল তার কারণে বেশিক্ষণ আমি বসতে পারিনি। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে গৃহে অবস্থান করছিলেন সেখানে হাযির হলাম। গোলামকে বললাম, ওমর দরবারে হাযির হতে চায়, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি চাও। গোলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিছু বললো এবং ফিরে এসে বললো, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন। বাধ্য হয়ে আমি পুনরায় মসজিদের মিম্বরের নিকট ফিরে আসলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে

পারলাম না। গোলামের নিকট গিয়ে বললাম, আমার জন্যে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা কর। গোলাম ফিরে এসে বললো, আমি আপনার কথা বলেছি কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব ছিলেন। আমি নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তাদের নিকট বসে গেলাম, যারা মিম্বরের চারপার্শ্বে ছিল। কিন্তু মনের গহনে যে ব্যথা ছিল, তার কারণে বসতে পারলাম না। উঠলাম এবং গোলামের নিকট বললাম, ওমরের (রাঃ) জন্যে অনুমতি প্রার্থনা কর। গোলাম ভেতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পর প্রত্যাবর্তন করে বললো, আমি আপনার কথা উল্লেখ করেছি কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব ছিলেন। আমি প্রত্যাবর্তন করবো এমন অবস্থায় গোলাম আমাকে ডাক দিয়ে বললো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দান করেছেন। একথা শুনে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর বিশ্রামরত রয়েছেন। চাটাইয়ে কোন বিছানা ছিল না, তাই তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের চিহ্ন ছিল, আর চামড়ার তৈরী একটি বালিশ ছিল, যা খেজুর পাতার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আমি হাযির হয়ে তাঁকে সালাম পেশ করলাম এবং দন্ডায়মান অবস্থায়ই আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার দিকে চাইলেন এবং এরশাদ করলেন, না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা কোরায়শ গোত্রের লোকেরা সর্বদা স্ত্রীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছি, কিন্তু মদীনা শরীফে আসার পর দেখছি অনেক লোকের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করে আছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার একথা শ্রবণ করে মুচকি হাসলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! লক্ষ্য করুন, আমি হাফসার নিকট গিয়েছিলাম, আমি তাকে বলেছি যে, তোর এ বিষয়ের উপর ঈর্ষা হওয়া উচিত নয় যে, তোর প্রতিবেশী তোর চেয়ে বেশী চমকদার এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তোর চেয়ে বেশী প্রিয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা শুনে দ্বিতীয়বার মুচকি হাসলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখে আমি বসলাম এবং ঘরের ভেতরের জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। আল্লাহর শপথ! সেখানে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন, যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেন। রোমক সাম্রাজ্য ও পারশ্য সাম্রাজ্যের লোকদেরকে আল্লাহ পাক সচ্ছলতা দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি দুনিয়া দান করেছেন, অথচ তারা আল্লাহর

এবাদত করেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এতক্ষণ বালিশের উপর হেলান দিয়েছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি বসে গেলেন। এরপর এরশাদ করলেন, হে এবনে খাত্তাব! তুমি কি এখনও এমন ধারণা নিয়ে আছ, তাদেরকে তো আল্লাহ পাক উত্তম জিনিসপত্র দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছেন, আখেরাতে তাদের জন্যে কিছুই নেই। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন।

মূলতঃ এ কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণ থেকে পৃথক হয়ে নিঃসঙ্গ হয়েছিলেন, কেননা হাফসা (রাঃ) আয়েশার (রাঃ) নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অব্যক্ত কথা বলে দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আগামী একমাস স্ত্রী-সংস্রব থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

উনত্রিশতম রাত শেষ হবার পর সর্ব প্রথম তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে তশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো এক মাস যাবত কারো নিকট তশরীফ আনবেন না বলে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়, প্রকৃতপক্ষে সে মাসটি উনত্রিশ দিনেরই হয়েছিল। এরপরই কোরআনে করীমের সেই আয়াত নাযিল হয় যাতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উম্মাহাতুল মোমেনীনগণকে এ নির্দেশ দেয়া হয়, তোমরা দু'টি পথের একটিকে বেছে নাওঃ

আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের কল্যাণ কামনা কর, কি কর-না, তথা তোমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হিসেবে থাকবে, অথবা থাকবেনা। যদি থাক, তবে সবর শোকর করেই থাকতে হবে। কখনো ক্ষুধার্তও থাকতে হবে, আর অন্যান্য কষ্টও হতে পারে। যদি এসব কষ্ট সহ্য করা সম্ভব না হয় এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য সম্পদ তোমাদের কাম্য হয়, তবে তোমরা বিদায় নিতে পার। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম আমার গৃহে আগমন করেন এবং আমাকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে থাকা বা না থাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকাকে পছন্দ করলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণার যত কষ্টই হোক না কেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে দূরে সরে যাব না, জানিয়ে দিলাম। এরপর অন্য স্ত্রীদেরকেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, তাঁরা সকলে সে জবাবই দিলেন, যা আমি দিয়েছি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার পরামর্শ ব্যতীত এ প্রশ্নের জবাব দিতে তাড়াহুড়া করোনা।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ

তখন আমি আরজ করলাম, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নেই, আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের কল্যাণ কামনা করি।

এ পর্যায়ে মুসলিম শরীফে শরীফে সংকলিত হাদীসের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্যে হাযির হলেন, দেখলেন, বাইরে অনেক লোক অপেক্ষমান রয়েছে, কারো জন্যেই অনুমতি দেয়া হয়নি। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে অনুমতি দেয়া হলো, এরপর হযরত ওমর (রাঃ) হাযির হলেন, তাঁকেও অনুমতি দেয়া হলো। হযরত ওমর (রাঃ) ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত এবং নীরব বসে আছেন। হযরত ওমর (রাঃ) মনে মনে ভাবলেন, আমি এমন কথা বলবো, যাতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাসি পায়। তাই তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি খারেজার কন্যা (আমার স্ত্রী) আমার নিকট অধিক ভাতা দাবী করে, তবে আমি তার ঘাড় মটকে দেব। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন, তুমি দেখছো যে এই স্ত্রীলোকেরা আমার চারি পার্শ্বে সমবেত হয়েছে এবং আমার নিকট অধিক পরিমাণে ভাতা দাবী করছে। একথা শ্রবণ করতেই হযরত আবু বকর (রাঃ) উঠে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসার (রাঃ) দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর তাঁরা উভয়ে তাঁদের নিজ নিজ কন্যাকে সতর্ক করলেনঃ যা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নেই, তা তাঁর নিকট চাইবেনা। পরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাধারে ২৯ দিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীগণের কাছ থেকে পৃথক থাকেন। এরপর ঐ আয়াত নাযিল হয়, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

হাফেজ এবনে হাজর আসকালানী (রঃ) বলেছেন, সম্ভবতঃ এসব ঘটনার প্রেক্ষিতেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মাস যাবত তাঁর স্ত্রীগণ থেকে পৃথক ছিলেন। মধু পানের ঘটনা, হযরত মারিয়ার (রাঃ) ঘটনা, হযরত হাফসা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) দ্বারা গোপন কথা প্রকাশ পাওয়া, স্ত্রীগণের

তরফ থেকে ভাতা বৃদ্ধির আবেদন-পূর্বাপর এসব ঘটনা ঘটতে থাকে, অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব ক্ষমা করতে থাকেন, কিন্তু একের পর এক যখন এসব হতেই থাকে, তখন তিনি তাঁদের থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখলেন, তবু তালাক দিলেন না। এরপর তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য, তাঁর মহান আদর্শ, যা চির স্মরণীয়, চির অনুকরণীয়।

وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ

"আর যদি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ যে আল্লাহ পাক তাঁর বন্ধু এবং জীব্রাঈল ও নেককার মোমেনগণ তাঁর সহায় রয়েছে, উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতাগণও রয়েছে তাঁর সহকারী"।

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তওবা করতে বলা হয়েছে। আর এ আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে, যদি তোমরা তওবা না কর এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগিতা কর, আর এমন কাজ কর যা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপছন্দনীয়, যেমন ভাতা বৃদ্ধির দাবী, গোপন কথা প্রকাশ করা প্রভৃতি, তবে মনে রেখ তোমরা কখনও কামিয়াব হবেনা। এমন অবস্থায় তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কেননা স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বন্ধু, তাঁর সাহায্যকারী, আর নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাগণের সর্দার জীব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী। এমনিভাবে নেককার মোমেনগণও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী এবং তাঁর সাহায্যকারী ও তাঁর সাথী।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে صالح المؤمنين বলে খাঁটি মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সাহায্যের জন্য আল্লাহ পাক যথেষ্ট। তিনি একাই সাহায্যকারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে জীব্রাঈল (আঃ), নেককার মোমেনগণ এবং ফেরেশতাদের উল্লেখ তাঁদের সম্মান বৃদ্ধির জন্যে করা হয়েছে।

আয়াতের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা যে কথা প্রমাণিত হয় তা হল, জীব্রাঈল (আঃ) যিনি বিশেষ ফেরেশতাগণের সর্দার, তিনি নেককার মোমেনদের চেয়ে উত্তম, কেননা আল্লাহ পাক নেককার মোমেনদের পূর্বে জীব্রাঈল (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। আর নেককার মোমেনগণ সাধারণ ফেরেশতাগণ থেকে উত্তম।

বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ পাক যাঁর বন্ধু এবং সাহায্যকারী, তাঁর ক্ষতি কারো দ্বারাই হতে পারেনা, কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারেনা। আর জীব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্বের অর্থ হলো, তিনিই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী পৌঁছে দেন। অতএব, জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। আর নেককার মোমেনগণের সাহায্যের ভিত্তি হলো, তাঁরাই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী। আর সাধারণ ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, তাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির বাস্তবায়ন হয়।

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ

تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا

"যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক তোমাদের স্থলে তোমাদের চেয়ে অতি উত্তম পত্নীগণকে দান করবেন, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, পূর্ণ অনুগত, তওবাকারিনী, এবাদতকারিনী, রোজা পালনকারিনী অকুমারী ও কুমারী"।

বোখারী শরীফে হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হই এবং আরজ করি, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আপনার কি অসুবিধা রয়েছে, যদি আপনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে আপনার কোন ক্ষতি হবেনা, কেননা আল্লাহ পাক আপনার সাথে রয়েছেন, আর ফেরেশতা জীব্রাঈল, মিকাঈল, আবুবকর (রাঃ) এবং অন্যান্য মোমেনগণ আপনার সাথে রয়েছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) আরও বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের দরবারে অগণিত শোকর, আমি যখনই কোন কথা বলেছি তখন আমি আশা করেছি, হয়তো আল্লাহ্ পাক আমার কথাকে সত্য প্রমাণিত করবেন। একটু পরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন, তবে আল্লাহ্ পাক বর্তমান স্ত্রীদের চেয়ে অধিকতর গুণবতী, মহিয়সী স্ত্রী তাঁকে দান করতে পারেন। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মাহাতুল মোমিনীনদের তালাক দেননি, তাই এমন ঘটনা ঘটেনি।

مُسْلِمٰتٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আত্মসমর্পণকারিনী।

مُؤْمِنٰتٍ

বিশ্বাসী তথা আল্লাহ্র নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিনী।

قٰنِتٰتٍ

আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের পূর্ণ অনুগত বা এবাদতকারিনী, যারা সর্বদা নামায ও দোয়ায় মশগুল থাকে।

تٰئِبٰتٍ

তওবাকারিনী, অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে যারা তওবা করে, যারা আল্লাহ্ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, অথবা যারা আল্লাহ্র হুকুমের দিকে ফিরে আসে।

عٰبِدٰتٍ

আল্লাহ্র এবাদতকারিনী, অথবা যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিনয় প্রকাশ করে।

سٰئِحٰتٍ

রোযা পালনকারিনী।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, রোযা দু' প্রকার হয় (১) পানাহার, কামাচার প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত থাকা। (২) দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত রাখা।

যারা এভাবে সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, তাদেরকেই سٰئِحٰتٍ বলা হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ্র রাহে হিজরতকারিনী।

অথবা এর দ্বারা সেই স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাঁরা সফরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হতেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই অগ্নি থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর সমূহ, যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ পাকের আদেশ সমূহ, আর তাদেরকে যে নির্দেশই প্রদান করা হয় তা তারা পালন করে থাকে"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। কোথাও এমন ঘটনা ঘটলে যা করণীয় তার পথ-নির্দেশ রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে। কখনো স্ত্রীদের দ্বারাও মানুষ কষ্ট পায়। কিন্তু তাই বলে হঠাৎ কোন কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ অর্জনের মাধ্যমেই এমন জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে যে অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ পেশ করেছেন, তা অনুসরণের মাধ্যমে জীবন-সাধনায় আসে সাফল্য। এক্ষেত্রে মানুষের কিছু করণীয় রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

এ আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছেঃ

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

দোযখের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা কর

এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ একথা সুস্পষ্ট, যারা মনে করে নিজে ভাল হলেই সব ভাল, তা সত্য নয়; বরং নিজে ভাল হওয়ার পাশাপাশি নিজের সন্তান-সন্ততি তথা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলকে ভালভাবে গড়ে তোলা একান্ত কর্তব্য। যদি স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলা না হয়, তবে তাদের দোযখের ইন্ধন হওয়ার আশংকা থেকে যায়। এ পর্যায়ে পিতা-মাতার দায়িত্ব অতি মহান।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে কল্যাণের পথ বাতলে দাও, আদব শিক্ষা দাও।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের ফরমান মেনে চল, তাঁর অবাধ্য হয়োনা। নিজের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর জিকরের জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ কর, যাতে করে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও এ শিক্ষা দাও।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত হও এবং পরিবার-পরিজনকেও আল্লাহ পাকের অনুগত হওয়ার আদেশ দাও, তাদেরকে নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখ। সৎ কাজে তাদেরকে সাহায্য কর। আর তারা মন্দ কাজ করতে ইচ্ছুক হলে তাদেরকে বিরত রাখ।

যাহ্যাক ও মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হলো, নিজের আপন-জনদেরকে এমনকি গোলাম-বাঁদী চাকরদেরকেও ভাল কাজে উৎসাহিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা।

শিশুদেরকে নামাযের আদেশ দাও

মসনদে আহমদে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শিশুরা যখন সাত বছর বয়সের হয়, তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ দাও। যখন দশ বছরের হয়ে যায়, তখন যদি তারা নামাজে গাফলত করে, তবে প্রহার করে হলেও নামাজে দাঁড় করাও।[১] (আবু দাউদ, তিরমিজী)

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০

'যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করেনা আল্লাহ পাকের আদেশ সমূহ আর তাদেরকে যে নির্দেশই প্রদান করা হয়, তা তারা পালন করে থাকে"।

অর্থাৎ দোযখের শাস্তি বড় কঠিন কঠোর। আর এ শাস্তি প্রদানের জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ অত্যন্ত নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে তারা কখনও ক্রটি করেনা, গাফলত করেনা, তাই দোযখের শাস্তির ব্যাপারে তারা হবে অত্যন্ত কঠোর কঠিন। দোযখীদের চরম কষ্ট দেখে, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে কখনও তারা শাস্তি লাঘব করবে না, কখনও তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের বরখেলাফ কিছুই করেনা। তারা এত শক্তিশালী যে একজন ফেরেশতা এক সঙ্গে ৭০ হাজার কাফেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, দোযখ সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে দোযখের ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের শাস্তির ব্যাপারে তারা নিযুক্ত হবে, তাদের কপালের চুল ও পা একত্র করে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে যে আদেশ হয়, তা তারা পালন করতে থাকে, কখনও কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হয়না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ
عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ
نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۸﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ﴿۹﴾

তরজমা

(৭) হে কাফেররা! আজ তোমরা কোন ওজর পেশ করবেনা, তোমরা পৃথিবীতে যা করতে, তারই শাস্তি ভোগ করছো।

(৮) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে খাঁটি তওবা কর, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহ্ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ পাক নবী এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে এবং ডান দিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৯) হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন, তাদের বাসস্থান হবে দোযখ, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস-স্থল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, দোযখের ফেরেশতাগণ কাফেরদেরকে কঠোর শাস্তি দেবে, তাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাক দয়া রাখেননি, তাই দোযখীদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর, কঠিন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

হে কাফেররা! আজকের দিনে কোন ওজর পেশ করবেনা, কেননা কোন কৈফিয়ত, ওজর আজ গ্রহণযোগ্য হবেনা।

দোযখের কঠিন শাস্তি দেখে কাফেররা বলবে,

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

(আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরেক ছিলাম না।)

তারা আরো বলবে,

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

(আমাদেরকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক আমল করবো।)

তখন তাদেরকে বলা হবে, এসব ওজর-আপত্তির সময় এটি নয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার হযরত একরামা (রঃ) বলেছেনঃ দোযখীদের প্রথম দলটি যখন দোযখের দিকে রওয়ানা হবে, তখন তারা দেখবে প্রথম ফটকেই ৪ লক্ষ ফেরেশতা প্রস্তুত রয়েছে, তারা হবে কৃষ্ণ বর্ণের, ভয়াবহ চেহারা বিশিষ্ট, আর উনিশজন এমন ফেরেশতাকে তারা দেখতে পাবে, যাদের বক্ষের প্রশস্ততা ৭০ বছরের পথ।

কাফেরদেরকে আরো বলা হবে, তোমাদেরকে আজ তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তিই দেয়া হচ্ছে, অতএব তোমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে নিজেদের কর্মফল ভোগ করতে থাক।

তফসীরকারগণ বলেছেন, একথা তখন বলা হবে যখন তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

মূলতঃ দুনিয়া হলো কর্মস্থল, আর আখেরাত হলো কর্মফল ভোগ করার স্থল, অতএব, সেখানে কোন প্রকার কৈফিয়ত বা ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে খাঁটি তওবা কর, আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মানব জীবনের এমন হেদায়েত ছিল, যার উপর আমল করলে মানুষ ঘরোয়া ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করার এবং কৃত গুণাহ থেকে তওবা করার আদেশ হয়েছে। মুসলমানের কর্তব্য হলো নিজের প্রত্যেকটি ক্রটির জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিক ভাবে তওবা এস্তেগফার করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার চেষ্টা করা। এতেই রয়েছে চির শান্তি এবং চির সাফল্য।

এতদ্ব্যতীত, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাই এ আয়াতে মোমেনদেরকে পূর্বেই সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা কৃত গুনাহর জন্যে দুনিয়াতেই তওবা করে ফেল, সময় থাকতে তওবা করলে কাফেরদের ন্যায় শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

প্রকৃত তওবা

হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) তাঁর একটি ভাষণে বলেছেনঃ আমি হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত তওবা হলো গুণাহর কাজের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং গুণাহ পরিত্যাগ করা, এমনকি গুণাহর ইচ্ছা পর্যন্ত না করা এবং অনুতপ্ত অবস্থায় কৃত গুনাহর জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। আর যে কাজের জন্যে তওবা করা হয়, সে কাজ পুনরায় না করা। এটিই হলো খাঁটি তওবা। কিন্তু যদি তওবা করার পরও কৃত পাপকার্যের প্রতি অন্তরে আসক্তি থাকে, তবে এ সত্য প্রমাণিত হবে যে, খাঁটি তওবা হয়নি; বরং তওবা ছিল ক্রটিপূর্ণ। গুনাহর শেকড় অন্তরে রয়ে গেছে।

আলোচ্য আয়াতে খাঁটি তওবা করার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ প্রকৃত তওবা হলো কৃত গুণাহর জন্যে লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এমন গুনাহ না করার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

কালবী (রঃ) বলেছেন, রসনা দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুণাহর কাজ থেকে বিরত রাখা হলো খাঁটি তওবা।

কারযী (রঃ) বলেছেন, চারটি বস্তুর সমষ্টি হলো খাঁটি তওবা। (১) রসনা দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করা (২) দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপাচার থেকে বিরত রাখা (৩) অন্তরে অন্যায় না করার শপথ গ্রহণ করা এবং (৪) মন্দ বন্ধুদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা।

ইমাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেনঃ তওবা ছয়টি বিষয়ের সমষ্টিঃ (১) পূর্বে কৃত গুনাহ সমূহের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, (২) কোন ফরজ এবাদত তরক করা হলে তা আদায় করা (৩) কারো কোন হক্ব বিনষ্ট করা হলে তা ফিরিয়ে দেয়া (৪) কোন দাবীদার থাকলে তাকে রাজী করা (৫) দ্বিতীয়বার গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। (৬) আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত হয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে পবিত্র করা।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যদি গুনাহ গোপনে করা হয় তবে তওবাও গোপনেই করবে। পক্ষান্তরে, যদি গুনাহ জনসমক্ষে করে থাকে, তবে তওবাও সেভাবেই করবে।

এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া যে, তিনি বন্দাগণের তওবা কবুল করেন, আর যে বন্দা তওবা করে, তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

عَسٰى رَبُّكُمْ

আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক খাঁটি তওবার পর তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন, তোমাদের গুনাহ সমূহ দূরীভূত করবেন।

এ আয়াতে গুনাহ মাফ করার আশা দেয়া হয়েছে, তবে এতে এ বিষয়েরও ইঙ্গিত রয়েছে, তওবা গুনাহ মাফের কারণ নয়; মাফ করা না করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, এজন্যে বন্দার কর্তব্য হলো আশা এবং ভয়ের মধ্যে থাকা।

এজন্যই বলা হয়েছেঃ

الايمان بين الخوف والرجاء

"ঈমান হলো ভয় এবং আশার মধ্যখানে"।

আবু নায়ীম হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের একজন নবীর

নিকট ওহী প্রেরণ করেছেনঃ তোমার উম্মতের নেককার লোকদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের আমলের উপর ভরসা না করে, কেননা কেয়ামতের দিন যে বন্দাকে আমি হিসাবের জন্যে দাঁড় করাবো এবং তাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করবো, তার হিসাব খুব কঠিন হবে এবং তাকে আমি আযাব দেব, আর তোমার উম্মতের গুনাহগার লোকদেরকে বল, তারা যেন নিরাশ না হয়। আমি অত্যন্ত বড় ক্ষমাশীল, আমি অনেক বড় গুনাহও মাফ করবো, আর আমি কোন কিছুর পরোয়া করিনা।

وَيُدْخِلَكُمْ

অর্থাৎ তওবার বরকতে আল্লাহ্ পাক গুনাহ্ মাফ করবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করার তওফিক দান করবেন। আর তা হলো এমন বেহেশত যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ পাকের দান অপরিসীম

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষের তিনটি রেজিষ্টার থাকবে। একটিতে নেক আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয়টিতে থাকবে গুনাহর বিবরণ, আর তৃতীয়টিতে থাকবে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের বিবরণ, যা ঐ বন্দাকে দুনিয়াতে প্রদান করা হয়েছে। রেজিষ্টারে যে নেয়ামত সমূহের উল্লেখ থাকবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামতকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ এই ব্যক্তির নেক আমল সমূহের মধ্যে তোমার সমান যে আমল হয়, তা তুমি নিয়ে নাও। সে নেয়ামত ঐ ব্যক্তির সমগ্র জীবনের সমস্ত আমল নিয়ে নেবে এবং আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইজ্জতের শপথ! এখনও আমি আমার পূর্ণ বিনিময় গ্রহণ করিনি, অথচ এ ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে গেছে এবং তার সমস্ত গুনাহ্ এখনো বাকী আছে। এরপর যখন আল্লাহ্ পাক বন্দার প্রতি দয়া করতে ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি এরশাদ করবেনঃ আমি তোমার নেকী সমূহকে বাড়িয়ে কয়েক গুণ করে দিয়েছি এবং তোমার গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দিয়েছি এবং আমার নেয়ামত তোমাকে দান করেছি।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কারো আমল অবশ্যই তাকে দোযখ থেকে রক্ষা করবেনা।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনাকেও নয়?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকেও নয়, তবে আল্লাহ পাকের রহমত আমাকে ঢেকে রাখবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত নাজাতের কোন পথ নেই। অবশ্য একথা সত্য, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করবে, তারাই তাঁর রহমত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "যাকে যে মকামের জন্যে তৈরী করা হয়েছে, তার জন্যে সে মকামের উপযোগী কাজ সহজ করে দেয়া হয়"।

যারা জান্নাতী আমল করে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়, স্বাভাবিক ভাবে তারাই পরকালে আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা এমন কাজ করে যা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়, তারা তাদের কর্মফল ভোগ করবে, তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ

সেদিন আল্লাহ পাক নবী এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে অপমানিত করবেন না, বরং তাঁর পয়গম্বর এবং তাঁর সাথী মোমেনদেরকে অতি উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান দান করবেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর তরফ থেকে নূর প্রদান করবেন, যা তাদের সম্মুখে এবং ডান দিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। আর অন্য সকলেই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। মুনাফেকদেরকে প্রথমে নূর দেয়া হবে, কিন্তু প্রয়োজন-মুহূর্তে সে নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন তারা অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকবে। তখন মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করবেঃ

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

(হে পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর। মুনাফেকদের ন্যায় আমাদের নূরও যেন ছিনিয়ে নেয়া না হয়। হে পরওয়ারদেগার! আমাদের যাবতীয় গুণাহ মাফ করে দিও। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।)

বনু কেনানা গোত্রের একজন সাহাবী বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করেছি, নামায শেষে আমি তাঁকে এ দোয়া করতে শুনেছিঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে আল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করোনা"।

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য

অন্য একখানি হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমাকে সেজদা করার অনুমতি দেয়া হবে, আর এভাবে সর্ব প্রথম আমাকে সেজদা থেকে মাথা তুলবার অনুমতি দেয়া হবে। আমি আমার সম্মুখে এবং ডানে বামে দৃষ্টিপাত করে আমার উম্মতকে চিনে ফেলব। একজন সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কিভাবে চিনবেন? সেখানে তো অনেক উম্মত একত্রিত থাকবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ একটি নিদর্শন হবে এই, তাদের দেহের যে সব অঙ্গ অজুর সময় ধৌত করা হতো তা অত্যন্ত আলোকময় হবে, অন্য কোন উম্মতের এ বৈশিষ্ট্য থাকবেনা।

দ্বিতীয়তঃ আমার উম্মতের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,

তৃতীয়তঃ তাদের কপালে সেজদার চিহ্ন থাকবে, যা দ্বারা আমি তাদেরকে চিনে ফেলব।

আর চতুর্থ আলামত হবে এই, তাদের নূর তাদের সম্মুখে থাকবে।[১]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন, তাদের বাসস্থান হবে দোযখ, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন। এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন রহমতুল্লিল আলামীন রূপে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যেই তিনি রহমত, আর এ কারণেই মানুষের প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরদ, সহানুভূতি ছিল অত্যধিক, প্রাণের শত্রুকেও যিনি আলিঙ্গন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না, তিনিই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। শত্রুর সঙ্গেও তিনি কঠোর ব্যবহার করতেন না, তাঁর স্বভাব সুলভ দয়া মায়ার কারণেই তিনি তা করতেন না, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-১০১-০২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৪-০৫

কর্তব্যের খাতিরে কাফের ও মুনাফেকদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন"।

মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে, অসত্যকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ইসলাম জেহাদের বিধান পেশ করেছে, অন্ধকার দূরীভূত করে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জেহাদ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। যদি কোন মুসলিম জনপদের উপর অমুসলিম শক্তি আক্রমণ করে, তবে তা প্রতিহত করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে, তাই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম জেহাদের বিধান প্রবর্তন করেছে, কেননা ইসলাম কর্মের ধর্ম, পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তব জীবন বিধান হলো ইসলাম, এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই, সবই বাস্তব, সত্য, তাই দুশমনের মোকাবেলা করার, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ করার এবং কাফের মুনাফেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। এটি মুসলিম মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, এ কর্তব্য পালনে গাফলত মুসলিম জাতির শানের খেলাফ। এ যুগেও মুসলিম জাতি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছে তার একমাত্র সমাধান জেহাদ।

وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

"আর কাফেরদের বাসস্থান হবে দোযখ, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল"।

ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্য করা যায়, কাফেররা দুনিয়াতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তাদের শক্তি সামর্থ অনেক বেশী, দুর্বলচিত্ত কোন কোন মুসলমানের মনে তাদের অগাধ সম্পদ এবং শক্তি প্রভাব বিস্তার করে বসে, তাই কোরআনে করীম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ দুনিয়াতে কাফেররা যত সম্পদ ও শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, অবশেষে তাদেরকে দোযখেই যেতে হবে, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাস-স্থল।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ
امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ
مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ
فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ
ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

তরজমা

(১০) আল্লাহ পাক কাফেরদের (উপদেশের) জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তারা উভয়ে ছিল আমার দু'জন নেককার বন্দার অধীনে। কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, পরিণামে সেই দু'জন নেককার বন্দা আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় তাদের কিছুমাত্র উপকার করতে পারলো না, তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অন্যান্য প্রবেশকারীদের সঙ্গে দোযখে প্রবেশ কর।

(১১) আল্লাহ পাক মোমেনদের (সান্ত্বনার) জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে সময়কে স্মরণ কর, যখন সে এভাবে দোয়া করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্যে তোমার নিকট বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা কর এবং জালেম দূরাত্মাদের কবল থেকেও আমাকে রক্ষা কর।

(১২) আর আল্লাহ পাক এমরানের কন্যা মরয়মের অবস্থাও বর্ণনা করছেন যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তাঁর প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাব সমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, আর সে ছিল আল্লাহ পাকের অনুগতদের অন্যতম।

তফসীরুল কোরআন

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

পূর্ববর্তী আয়াতে সমূহে গুনাহ থেকে তওবা করার এবং অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের আদেশ ছিল। আর একথা ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাঁর নবীকে এবং তাঁর সাথী মোমেনদেরকে অপমানিত করবেন না।

আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহর নবীগণের সাথে সম্পর্ক যদি ঈমানের হয় তবে তা কেয়ামতের কঠিন দিনে উপকারী হবে। কিন্তু ঈমানের সম্পর্ক অনুপস্থিত থাকলে আত্মীয়তার সম্পর্ক যত ঘণিষ্ঠই হোক না কেন, আখেরাতে তা কোন কাজে আসবে না। নিজের ঈমান ও আমল ঠিক না করে নবী রসূলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রেখে আখেরাতে নাজাত পাওয়া যাবেনা। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি এবং নবী রসূলের আদর্শ বিরোধী ছিল, এজন্যে নবীর পত্নী হওয়া সত্ত্বেও দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়েলা। আর হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়াহেলাহ। দু'জন বিশিষ্ট নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা মোমেন ছিলনা।

فَخَانَتٰهُمَا

অর্থাৎ তারা উভয়ে কাফের ও মুনাফেক ছিল। এ স্থলে এটিই খেয়ানতের অর্থ। হযরত নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, সে বলতো, নূহ (আঃ) পাগল। কোন ব্যক্তি হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলে সে তার কাফের সম্প্রদায়কে তা জানিয়ে দিত। এমনিভাবে লূত (আঃ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসলে তার স্ত্রী লোকদেরকে জানিয়ে দিত। এটিই ছিল তাদের বিশ্বাসঘাতকতা।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'খেয়ানত' কথাটির অর্থ হলো, তারা উভয়ে তাদের অন্তরে মুনাফেকী গোপন করে রেখেছিল। অথচ প্রকাশ্যে মোমেন ছিল।

فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত লূত (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিন্দুমাত্র উপকার করতে পারেননি।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে, কোন কাফের আখেরাতে মোমেনের দ্বারা উপকৃত হবেনা, কেননা আল্লাহ পাক কুফর ও শেরকের গুনাহকে মাফ করবেন না।

পক্ষান্তরে, কোন ঈমানদার যদি মহা পাপীরও পত্নী হয়, তবে সেই মহা পাপী কাফের ঈমানদারের ক্ষতি করতে পারেনা। পরবর্তী আয়াতে একথারই দৃষ্টান্তে পেশ করা হয়েছে।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

"আল্লাহ পাক মোমেনদের (সান্ত্বনার) জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে সময়কে স্মরণ কর, যখন সে এভাবে দোয়া করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্যে তোমার নিকট বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে আমাকে রক্ষা কর আর দূরাত্মাদের কবল থেকেও আমাকে রক্ষা কর'।

হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, সারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অবাধ্য জালেম ছিল ফেরাউন, অথচ তার স্ত্রী আছিয়া ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মোমেন রমণী। তিনি জীবন বাজি রেখে ঈমানের উপর কায়েম ছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেন, ফেরাউন হযরত আছিয়ার উপর অহরহ নির্যাতন করতো। তাঁকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের ডানা দ্বারা তাঁর প্রতি ছায়া করে রাখতেন। এ মহিয়সী নারী আছিয়ার কারণে ফেরাউনের ঘরে হযরত মূসা (আঃ) নিরাপদে লালিত পালিত হন।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন বিজয়ী হন এবং ফেরাউনের যাদুকররা তাঁর নিকট পরাজিত হয়, তখন তিনি গোপনে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেন। এ পর্যায়ে আরও একাধিক ঘটনা তফসীরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। একদিকে হযরত আছিয়ার প্রতি ফেরাউনের অমানুষিক জুলুম অত্যাচার চলে, অন্যদিকে আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর ঈমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি দোয়া করেছেনঃ

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যখন সে বললো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে এবং এই জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর"।

সে সময় ছিল অত্যন্ত কঠিন। ফেরাউন হযরত আছিয়ার প্রতি অত্যধিক অত্যাচার-নির্যাতন করতো। হযরত আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত অসহায়। সে অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট এই দোয়া করেছিলেন। ফেরাউন তার রক্ষীদের আদেশ দিয়েছিল, বড় মাপের একটি পাথর আন। হযরত আছিয়াকে শায়িত করা হলো। পাথরটি তাঁর উপর নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হলো। হযরত আছিয়া আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। আল্লাহ্ পাক সকল আবরণ সরিয়ে দিলেন। জান্নাতে তাঁর জন্য যে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তা দেখিয়ে দিলেন। স্বচক্ষে তিনি তাঁর জন্যে নির্মিত জান্নাতের বাড়ী দেখলেন। আর তখনই তাঁর রুহ্ বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু তখন তাঁর দেহে রুহ্ ছিলনা। আছিয়া বিনতে মোযাহেম (রাঃ) এভাবে শাহাদত বরণ করলেন।

তাৎপর্যবহ দোয়া

হযরত আছিয়া (রাঃ) যে দোয়া করেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমাকে একটি গৃহ দান কর। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক। তাই তিনি আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্যে একটি গৃহ দানের আবেদন করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে নাজাত লাভের দোয়া করেছিলেন। তৃতীয়তঃ এত বড় জালেমের কাছ থেকে তার অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও তিনি ক্ষণিকের জন্য ঈমান থেকে বিচ্যুত হননি, কখনও ভীত-সন্ত্রস্ত হননি এবং আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাননি। আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান ও একীনের যে অভাবনীয় দৃষ্টান্ত হযরত আছিয়া (রাঃ) পেশ করেছেন, তা কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্যে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

"আর আল্লাহ্ পাক এমরানের কন্যা মরয়মের অবস্থাও বর্ণনা করছেন যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাব সমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, আর সে ছিল আল্লাহ্ পাকের অনুগতদের অন্যতম"।

এ আয়াতে হযরত মরয়ম বিনতে এমরান (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সতীত্বের প্রতিমূর্তি। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হযরত মরয়ম (আঃ)-এর বুকে রুহ্ ফুঁক দেন। এভাবে আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে পয়দা করেন।

আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়। তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে পিতা-মাতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ব্যতীত, আর দুনিয়ার সকল মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কামেল পুরুষতো অনেকে রয়েছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে চারজন হলো কামেল। (১) আছিয়া বিনতে মোযাহেম, ফেরাউনের স্ত্রী। (২) মরয়ম বিনতে এমরান, (৩) খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদ এবং (৪) ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম স্ত্রীলোক ছিল মরয়ম বিনতে এমরান এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম স্ত্রীলোক হলো খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদ।

কোরআনে করীমের সূরা আল এমরানে হযরত মরয়ম (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৯শে জুলাই মোতাবেক ২৩শে রবিউল আউয়াল রাত ১২-০০টায় তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৮তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা, তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, এ মহান গ্রন্থকে কবুলিয়ত দান কর, অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার তৌফিক দান কর, এর দ্বারা পবিত্র কোরআনের আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও। হে আল্লাহ! তোমার পেয়ারা হাবিব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, আমাদের কাজ সহজ করে দাও। তোমার এ গুনাহগার বন্দাকে মাফ করে দিও। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৮, পৃষ্ঠা-১০৪-১০৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৯৬-৯৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০৬-০৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১৬৪-৬৫